তোত্তো-চান

কিশোর ভারত গ্রন্থমালা

তোত্তো-চান

জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট মেয়েটা



তেৎসুকো কুরোয়ানাগি

অনুবাদ

মৌসুমী ভৌমিক

ছবি

চিহিরো ইবাসাকি

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-3323-2

2000 (শক 1922)

Totto-Chan *(Bangla)*
মূল্য : 55.00
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

সোসাকু কোবায়াশীর
স্মৃতিতে

বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে

'তোত্তো-চান' বইটির ইংরেজি অনুবাদ আমি প্রথম পড়ি বছর আটেক আগে। এবং বলা বাহুল্য, মুগ্ধ হই। সেই থেকে বইটি বাংলায় অনুবাদ করতে চাইছি আমি।

মূল জাপানী ভাষা থেকে 'তোত্তো-চান'-এর একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে। সংগ্রহ করতে চেয়ে সেটি আমি পাইনি; বাংলা একাডেমীর অফিস থেকেই বলা হয় যে বইটি out of print। অথচ, একবার বইটির বাংলা অনুবাদের অনুমতি দেওয়া হয়ে গিয়েছিলো বলে দ্বিতীয়বার তা পেতে অনেক সময় লেগে যায়।

আমি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, বিশেষ করে অরুণ চক্রবর্তীর প্রতি কৃতজ্ঞ আমাকে 'তোত্তো-চান' অনুবাদের দায়িত্ব দেবার জন্য। এই বইটির সঙ্গে আমার পরিচয় করানোর পেছনে দুজন শিক্ষাবিদের ভূমিকা রয়েছে—দিল্লির অরবিন্দ গুপ্তা এবং কলকাতার মেরি অ্যান দাশগুপ্ত। গত আট বছর ধরে ওঁরা আমার পাশে না থাকলে আমি এই অনুবাদ সম্পন্ন করতে পারতাম না।

শেষে বলি, এমন অসাধারণ একটি বই অনুবাদ করতে পেরে আমি ধন্য হয়ে গেছি। আমি জাপানী ভাষা জানি না। হয়তো মূল বইটির সঙ্গে আমার অনুবাদের বিস্তর দূরত্ব রয়ে গেলো। তবু ডরথি ব্রিটনের ইংরেজি অনুবাদটি যেহেতু তেৎসুকো কুরোয়ানাগির খুব ভালো লেগেছিলো, আমি সেই ইংরেজি অনুবাদের যতটা কাছাকাছি থাকা যায়, তারই চেষ্টা করেছি।

মৌসুমী ভৌমিক

লণ্ডন, জুলাই, ২০০০

সূচিপত্র



রেল স্টেশন

ওইমাচির ট্রেনটা জিয়ুগায়োকা স্টেশনে পৌঁছলে ওরা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লো। মা তোত্তো-চানের হাত ধরে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। গেটে সব যাত্রীকে টিকিট জমা দিয়ে দিতে হয়, কিন্তু জীবনের প্রথম ট্রেনের টিকিটটা হাতছাড়া করার মোটেও ইচ্ছে ছিল না তোত্তো-চানের।

'আমি এটা রাখতে পারি না?' টিকিট চেকারের কাছে জানতে চাইলো ও।

'না, এটা রাখা যাবে না,' বলে চেকারবাবু ওর টিকিটটা নিয়ে নিলেন।

পাশেই রাখা ছিলো টিকিট ভর্তি একটা বাক্স। সেটার দিকে দেখিয়ে তোত্তো-চান বললো, 'সব তোমার?'

'আমার নয়, সব এই রেল স্টেশনের,' বাকি যাত্রীদের হাত থেকে টিকিটগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিতে নিতে চেকারবাবু বললেন।

'ও!' তোত্তো-চান খানিকক্ষণ বাক্সটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার পর বললো, 'বড় হয়ে আমি ট্রেনের টিকিট বিক্রি করবো।'

এতক্ষণে চেকারবাবু একটু চোখ তুলে তাকালেন। 'আমার ছোট ছেলেও তো স্টেশনে কাজ করতে চায়! ভালই হবে, তোমরা তাহলে একসঙ্গে কাজ করতে পারবে!'

তোত্তো-চান একটু সরে দাঁড়িয়ে ভাল করে চেকারবাবুকে দেখে নিলো। গোলগাল, চোখে চশমা, বেশ ভাল মানুষ, ভাল মানুষ চেহারা। 'তা—,' কোমরে হাত দিয়ে ও কী যেন ভাবতে লাগলো। 'তা, তোমার ছেলের সঙ্গে আমি কাজ করতেই পারি, কিন্তু সেসব নিয়ে পরে ভাবা যাবেখন। এখন আমার খুব তাড়া, আমি এখন নতুন স্কুলে যাচ্ছি কি না!'

মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। 'বড় হয়ে আমি টিকিট বিক্রি করবো, দূর থেকে চিৎকার করে মা'কে খবরটা জানিয়ে দিলো তোত্তো-চান। তারপর একছুটে মায়ের কাছে পৌঁছে গেলো। ওর কথায় মা একটুও অবাক হলেন না। কেবল বললেন, 'তুমি না গুপ্তচর হবে বলেছিলে?'

মায়ের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে তোত্তো-চানের মনে পড়ে গেল যে গত পরশুদিন পর্যন্ত ও ঠিক করে রেখেছিলো বড় হয়ে গুপ্তচর হবে। কিন্তু এক বাক্স টিকিটও কি কম মজার ব্যাপার? হঠাৎ ওর মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি এলো। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে জোরে বললো 'ধরো, এমনিতে আমি টিকিট বিক্রি করি, কিন্তু আসলে আমি একজন গুপ্তচর।'

এই কথার কোনো উত্তর দিলেন না মা। ফুল লাগানো ফেল্টের টুপির তলায় ওঁর মিষ্টি মুখখানা বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। মা ভাবছিলেন, নতুন স্কুলে না নেয় যদি তোত্তো-চানকে? এদিকে মেয়ে তো দিব্বি আপন মনে বক বক করতে করতে সামনে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। ও বেচারা মায়ের দুর্ভাবনার কথা কী জানে? তাই মায়ের চোখে চোখ পড়া মাত্রই আবার তোত্তো-চান বলে উঠলো, 'না মা, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। আমি রাস্তার বাজনাওয়ালাদের দলে বাজনা বাজাতে চাই, সেই যে যারা নতুন নতুন দোকানের জন্য রাস্তায় রাস্তায় বিজ্ঞাপন করে বেড়ায়। ওদের সঙ্গে বাজাব আমি।"

মা অসহায়ভাবে বললেন, 'বেশ, ঠিক আছে। কিন্তু এবার আর একটাও কথা নয়। এখন আমাদের যেতে হবে, নয়তো দেরি হয়ে যাবে। নতুন স্কুলের হেডমাস্টারমশাই অপেক্ষা করে আছেন না? তাই আর কথা না বলে তুমি বরং একটু পথের দিকে তাকিয়ে, ভাল করে হাঁটো, কেমন?'

একটু দূরেই একটা স্কুলের নিচু গেট ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো।

জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট মেয়েটা

যদিও তোত্তো-চান মাত্র কিছুদিন হলো স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তবু এরই মধ্যে আগের স্কুল ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মায়ের তাই খুব চিন্তা। ক্লাস ওয়ান থেকেই ছাঁটাই, ভাবো একবার!

এইতো গত সপ্তাহের কথা। তোত্তো-চানের ক্লাসের দিদিমণি মাকে ডেকে

পাঠিয়েছিলেন স্কুলে। মহিলা সোজা কথার মানুষ। 'আপনার মেয়ে আমার গোটা ক্লাসকে বিরক্ত করে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি ওকে অন্য স্কুলে দিন।' মিষ্টি চেহারার দিদিমণিকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিদিমণি বললেন, 'আমি সত্যিই ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি।'

মা আচমকা এমন একটা কথা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তোত্তো-চান করেটা কী যে গোটা ক্লাস তাতে বিরক্ত হয়?

দিদিমণির চোখের পাতা কাঁপতে থাকে। একটু বুঝি ভয় পেয়ে গেছেন। মাথার ছোট করে ছাঁটা চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে মহিলা ব্যাপারটা বোঝাতে শুরু করেন। 'হয় কী, ও দিনের মধ্যে হাজার বার ডেস্কের ডালাটা তোলে, আবার নামিয়ে রাখে। আমি ওদের বলে রেখেছি যে মিছিমিছি কেউ ডেস্কের ডালা খুলবে না, বন্ধ করবে না, যদি না কিছু রাখার বা বের করার প্রয়োজন হয়। আপনার মেয়ে হয় কিছু না কিছু ঢোকাচ্ছে, নয়তো বের করছে। খাতা, পেনসিল, পেনসিলের বাক্স, পড়ার বই—ঢোকাচ্ছে, বের করছে। ধরুন, আমি বর্ণ-পরিচয় শেখাচ্ছি আর ওরা অক্ষর লিখতে শিখছে। আপনার মেয়ে প্রথমে ডেস্কের ডালা খুলবে, খাতা বের করবে, তারপর দুম করে ডালাটা বন্ধ করবে। তারপর ডালা খুলে, মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে একটা পেনসিল বের করবে, ফের ডালা বন্ধ করে হয়তো একটা অক্ষর লিখলো। তারপর, লেখাটা যদি কোনো কারণে ভুল বা খারাপ হয়ে যায়, তাহলে আবার ডেস্ক খোলে। রাবার বের করে, ডালা বন্ধ করে, অক্ষরটা মোছে, ডালা খোলে, রাবার ঢুকিয়ে রাখে, ডালা বন্ধ করে—এ সব কিছুই চলতে থাকবে খুব দ্রুত গতিতে। এবার প্রথম অক্ষরটা লেখার পর সব কটা জিনিস ও একে একে ডেস্কের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখবে—ডালা খোলো, পেনসিল ঢোকাও, ডালা বন্ধ, আবার খোলো, এইবার খাতা, তারপর বন্ধ। এরপর দ্বিতীয় অক্ষর। আবার খোলা, বন্ধ, খোলা, বন্ধ। প্রথমে খাতা বেরোবে, তারপর পেনসিল, তারপর রাবার। আমার মাথাটা যেন ঝিমঝিম করে। কিছু বলতেও পারি না; কারণ ও তো আসলে প্রতিবারই কোনো না কোনো কাজে ডেস্ক খুলছে আর বন্ধ করছে!'

দিদিমণির চোখের পাতা আরোই কাঁপতে থাকে, যেন কথা বলতে বলতে উনি পুরো ঘটনাটা আবার চোখের সামনে ঘটতে দেখেন।

মা হঠাৎ বুঝতে পারলেন তোত্তো-চান কেন এতবার ডেস্কের ডালা খোলে আর বন্ধ করে। প্রথম দিন স্কুল থেকে ফিরে তোত্তো-চান খুব খুশি হয়ে বলেছিলো, 'স্কুলটা কী ভাল! বাড়ির ডেস্কের ড্রয়ারগুলো তো টেনে খুলতে হয়, কিন্তু জানো, স্কুলের ডেস্কটার একটা ঢাকনা আছে, একটা বাক্সের মতন। তার ভেতরে তুমি কত কী রাখতে পারো! সুন্দর না ডেস্কটা?' মা বেশ দেখতে পাচ্ছিলেন তোত্তো-চান খুশিমনে ডেস্কের ডালা খুলছে আর বন্ধ করছে, বন্ধ করছে, খুলছে। এর মধ্যে তো তেমন কোনো দুষ্টুমি খুঁজে পেলেন না মা! তাছাড়া, কদিন বাদে প্রথম চমকটা কেটে গেলেই

তো এটা আর করবে না ও। তবু মা দিদিমণিকে বললেন, 'আমি ওর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবো।'

দিদিমণির গলা এবার একটু চড়ে গেল। 'এটুকু হলে তো আমি কিছুই মনে করতাম না।'

মা ভীত চোখে দিদিমণির দিকে তাকালেন। 'যখন ও ডেস্ক নিয়ে খেলে না, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, যতক্ষণ ক্লাস চলে, ততক্ষণ।'

'দাঁড়িয়ে থাকে? কোথায়?' মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'জানলার ধারে।' দিদিমণি বিরক্ত গলায় বললেন।

'জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে? কেন?' মা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

'যাতে ও রাস্তার বাজনাওয়ালাদের ডাক দিতে পারে।' দিদিমণির গলা এবার তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছে।

গল্পের সার : ঘণ্টাখানেক ডেস্কের ডালা নিয়ে দুমদাম করার পর তোত্তো-চান উঠে দাঁড়িয়ে জানলার ধারে চলে যায়। গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেই না দিদিমণি ভাবতে শুরু করেছেন যে থাকুক ওখানে, যতক্ষণ চুপচাপ থাকে ততক্ষণই ভাল, অমনি তোত্তো-চান ঝলমলে পোশাক পরা পথ-চলতি বাজনাওয়ালাদের একটা হাঁক দিয়ে বসে। ওদের ক্লাসরুমটা নিচতলায়, একেবারে রাস্তার ওপরে। এই ব্যবস্থাটা তোত্তো-চানের খুব ভাল মনে হলেও, এর জন্যেই দিদিমণির ঝামেলা হচ্ছিলো বেশি। স্কুল আর রাস্তার মাঝখানে একটা মাত্র ঝোপের বেড়া, তাই ক্লাসের সব ছেলেমেয়েই চাইলে পথ-চলতি মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। তোত্তো-চানের ডাক শুনে বাজনাওয়ালার দল ওদের জানলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিদিমণির ভাষ্য অনুযায়ী, এরপর তোত্তো-চান ক্লাসের সামনে ঘোষণা করে, 'ওরা এসে গেছে!' অমনি গোটা ক্লাস এসে জানলায় ভিড় করে বাজনদারদের হাঁকডাক করতে শুরু করে দেয়।

'বাজাও না!' তোত্তো-চান বলে। যদিও সাধারণত কোনো স্কুলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওরা শব্দ করে না, তবু তোত্তো-চানের আবদার শুনে বাজনাওয়ালারা বাঁশি, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়ে দিব্যি ঝমঝমে একটা সুর তুলে ফেলে। তখন দিদিমণির শান্ত হয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনোই উপায় থাকে না।

বাজনা শেষ হলে পরে বাজনদাররা চলে যায়, ছেলেমেয়েরাও সবাই যে যার জায়গায় ফিরে যায়, তোত্তো-চান ছাড়া। দিদিমণি যখন ওকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছো যে?' তখন তোত্তো-চান খুব গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, 'আর একটা দল তো আসতে পারে! তাছাড়া, যারা চলে গেল তারাই যদি ফিরে আসে আর আমরা ওদের দেখতে না পাই, তাহলে সেটা খুবই বাজে ব্যাপার হবে।'

দিদিমণি এবার মায়ের দিকে ফিরে খুব আবেগের সঙ্গে বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন তো এইসব কারণে কী সাঙ্ঘাতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে?' মায়েরও

মহিলার জন্য বেশ খারাপ লাগছিলো, এমন সময় দিদিমণি গলাটা আরো সরু করে বলতে শুরু করলেন, 'তাছাড়া...'

'আর কী করে তোত্তো-চান?' মা এবার হতাশ গলায় বললেন।

'আর কী? আমি যদি ওর কীর্তির হিসেব দিতে পারতাম তাহলে ওকে এই স্কুল থেকে নিয়ে যেতে বলতাম না।' নিজেকে একটু সামলে নিয়ে দিদিমণি এবার সোজাসুজি মায়ের চোখের দিকে তাকালেন। 'গতকাল তোত্তো-চান তো রোজকার মতন জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি ভাবছি বুঝি বাজনদারদের জন্য অপেক্ষা করছে, এই ভেবে আমি আমার মতন পড়িয়ে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ শুনি ও কাকে যেন বলছে, 'এই তোমরা কী করছো?' 'যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই ভাবলাম ব্যাপার কী? এমন সময় ও আবার ডেকে উঠলো, 'কী করছো তোমরা?' 'পথের কারোর সঙ্গে যে কথা বলছিলো না, তা আমি বুঝতে পারছিলাম, কারণ ও ওপরের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন ডাকছিলো। আমার একটু কৌতূহল হচ্ছিলো, তাই কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো উত্তর শুনতে পেলাম না। উত্তর না পেলে কী হবে, আপনার মেয়ে তো এক নাগাড়ে ডেকেই চলেছে, 'কী করছো, কী করছো?' 'আমার পড়ানো ততক্ষণে মাথায় উঠেছে। তাই আমি জনালায় গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম কার সঙ্গে কথা বলছে ও। জানলা দিয়ে মুখ বের করে দেখি কী, এক জোড়া সোয়ালো পাখি কার্নিসের নিচটাতে বাসা বানাচ্ছে, আর তাদেরই ডেকে চলেছে ও। ভাবুন! ও সোয়ালো পাখিদের ডাকছিলো! দেখুন। আমি শিশুদের নিয়ে কাজ করি। ওদের মন আমি বেশ বুঝি। আমি জানি যে একটি শিশু সোয়ালো পাখিদের সঙ্গে কথা বলতে পারে, এটা অসম্ভব এমন কথা আমি বলছি না। তাই বলে ক্লাস চলার মধ্যিখানে সোয়ালোরা কী করছে, কী করছে জিজ্ঞেস করাটা কি একটু বাড়াবাড়ি না?'

মা দুঃখ প্রকাশ করতে যাবার আগেই দিদিমণি আবার শুরু করে দিলেন : 'ছবি আঁকার ক্লাসের ঘটনাটাই ধরুন না। আমি ওদের বলেছি জাপানের পতাকা আঁকতে। সবাই ঠিক মতো আঁকলো, কেবল আপনার মেয়ে শুরু করলো নৌবাহিনীর পতাকা আঁকতে। নৌবাহিনীর পতাকা মানে বুঝতে পারছেন তো? সেই যে যেখানে সূর্যের রশ্মি আঁকা থাকে! ভাবলাম, ঠিক আছে, আঁকছে, আঁকুক। কিন্তু হঠাৎ ও পতাকার একটা ঝালর আঁকতে শুরু করলো। পতাকার ঝালর! মানে, খেলার দলটলের যেমনটা পতাকা হয় আর কি। কোথাও হয়তো ওরকম দেখে থাকবে। কিন্তু ও যে ঠিক কী করছে, তা বোঝার আগেই দেখলাম ওর হলুদ রং ছবির কাগজ ছাপিয়ে ডেস্কের ওপরে উপচে পড়েছে। আসলে, পতাকায় তো কাগজের প্রায় সমস্তটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। এবার ঝালর আঁকবে কোথায়? তাই হলুদ মোমরং-এর পেনসিলটা নিয়ে ও জোরে জোরে রেখা টানতে লাগলো পতাকার পাশে পাশে।

শেষে কাগজটা তোলার পর দেখা গেল যে ডেস্ক একেবারে হলুদ রঙে মাখামাখি হয়ে গেছে। শত চেষ্টা করেও সেই রং আমরা মুছতে পারিনি। ভাগ্যে কেবল পতাকার তিন দিকে ঝালর ছিল, চারদিকে নয়।'

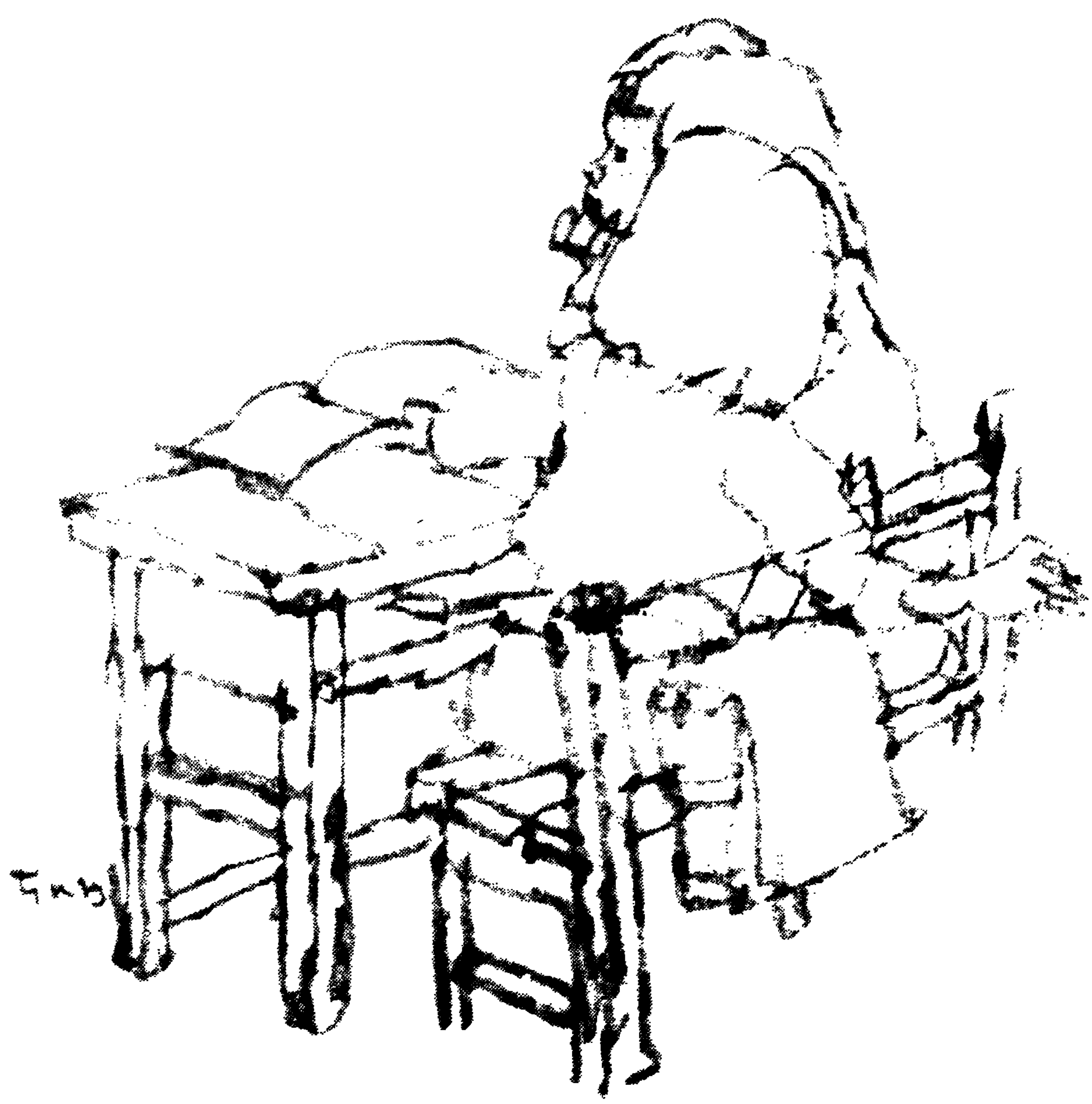
মা ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিন দিকে মানে?'

দিদিমণি যদিও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তবু মাকে কথাটা বুঝিয়ে বলতে তাঁর আপত্তি ছিল না। বাঁদিকে তো পতাকার খুঁটিটা ছিলো, তাই কেবল তিন দিকেই ঝালর আঁকার জায়গা ছিল, খুঁটির দিকে তো আর ঝালর থাকতে পারে না।'

মা যেন একটুখানি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'ও হ্যাঁ তিন দিকেই তো বটে!' উত্তরে দিদিমণি খুব ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা করে উচ্চারণ করে বললেন, 'কিন্তু খুঁটিরও প্রায় পুরোটাই ডেস্কের ওপরে আঁকা হয়েছিলো, ঝালরের দাগের মতই সেই দাগও মোছা যায়নি।'

এরপর দিদিমণি উঠে দাঁড়িয়ে খুব ঠাণ্ডা গলায় ওঁর রায় শোনালেন। 'দেখুন একলা আমারই নয়, পাশের ক্লাসের দিদিমণিরও কিন্তু অসুবিধে হয়।'

না, মাকে তো একটা কিছু করতেই হবে। অন্য বাচ্চাদের অসুবিধে করা, সেটা



তো ঠিক হচ্ছে না। আর একটা স্কুল খুঁজে পেতে হবে, যেখানে এই ছোট্ট মেয়েটাকে সবাই ভুল বুঝবে না, আর যেখানে তোত্তো-চানও সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকাটা শিখবে। এই যে স্কুলটায় ওরা চলেছে, অনেক খোঁজার পর এটার সন্ধান পেয়েছেন মা। মা অবশ্য তোত্তো-চানকে বলেন নি যে ওকে ওরা আগের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ও বেচারা তাড়ানোর কী বুঝবে? কেমন করে ও বুঝবে কোথায় ও ভুল করেছিলো? বড় হলে বরং বলা যাবে কথাটা। তাই মা কেবল বলেছিলেন, 'অন্য একটা স্কুলে যাবি? নতুন স্কুলে? খুব নাকি ভাল স্কুলটা!'

তোত্তো-চান একটু ভেবে উত্তর দিয়েছিল, 'ঠিক আছে। কিন্তু...'

এবার কী? মা তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বুঝে গেছে নাকি ও তাড়িয়ে দেবার ব্যাপারটা?

খানিক চুপ করে থাকার পর তোত্তো-চান হাসিমুখে বলেছিলো, 'নতুন স্কুলেও রাস্তার বাজনদাররা আসবে তো মা?'

নতুন স্কুল

নতুন স্কুলের গেটখানা দেখা-মাত্র তোত্তো-চান থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। আগের স্কুলের গেটে, ভারি সিমেন্টের থামের উপরে স্কুলের নামটা বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিলো। তোত্তো-চান দেখলো যে এই স্কুলের গেটটা অনেক নিচু, আর তার ওপর অনেক ডালপালা, লতাপাতা এসে পড়েছে।

'এই গেটটা তো দেখছি গাছের মতো বড় হচ্ছে!' তোত্তো-চান বললো। 'তারপর বাড়তে বাড়তে একদিন টেলিফোনের খুঁটির চেয়েও লম্বা হয়ে যাবে!' ঠিকই বুঝেছিলো তোত্তো-চান। ঐ স্কুলের গেটটা আসলে ছিলো দুটো সত্যিকারের গাছ দিয়ে তৈরি। হাওয়ায় স্কুলের নাম লেখা বোর্ডটা একটু সরে গিয়েছিলো। তাই কাছাকাছি পৌঁছানোর পর তোত্তো-চানকে বেশ ঘাড় কাত করে নামটা পড়তে হলো। 'তো-মো-ই গা-কু-য়েন।'

'তোমোই' মানে কী? কথাটা মাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, এমন সময় কী যেন একটা দেখে ও বিস্ময়ে মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়লো। আর বসে বসে ভাল করে ঝোপের ভিতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। ও কি স্বপ্ন দেখছে? 'মা, ওটা কি একটা সত্যিকারের রেলগাড়ি? ওই যে স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে?'

এই স্কুলে পুরনো, অচল রেলের কামরার ভিতরে পড়াশুনো হতো। কথাটা তোত্তো-চান ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলো না। রেলগাড়িতে ইস্কুল?

সকালের সূর্যের আলোতে রেলগাড়ির জানলাগুলো চকচক করছিলো। কিন্তু ছোট্ট যে মেয়েটা ওই গাড়ির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো, তার মুখটা যেন ঐ জানলার চেয়েও বেশি চকচক করছিলো।

এই স্কুলটা আমার খুব পছন্দ

মুহূর্তের মধ্যে তোত্তো-চান 'হু-উ-উ-ই' বলে লাফিয়ে উঠে, ছুটতে শুরু করলো 'রেলগাড়ি স্কুল'-এর দিকে। পিছন ফিরে মাকে একবার বললো, 'তাড়াতাড়ি! চলো আমরা গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ি!' ঠিক কী করবেন বুঝতে না পেরে মাও ছুটতে লাগলেন ওর পেছনে। মা একসময় বাস্কেটবল খেলতেন, তাই তোত্তো-চানের চেয়ে জোরেই ছুটতে পারতেন। তোত্তো-চান একটা কামরার দরজায় পৌঁছনোর ঠিক আগে মা ওর জামাটা ধরে ফেললেন। 'এখন ঢোকা যাবে না, বাবা,' মা ওকে টেনে ধরে বললেন। 'ওগুলো তো ক্লাসরুম। আগে ওরা তোমাকে ভর্তি করে নিক, তারপর। যদি তুমি সত্যিই এই রেলগাড়িতে চাপতে চাও তাহলে তোমাকে হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে খুব সুন্দর করে কথা বলতে হবে। এখন আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করবো। যদি সব ঠিকমতো হয় তাহলে তুমি এই স্কুলে পড়বে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।' প্রস্তাবটা ঠিক মন মতন না হলেও তোত্তো-চান মেনে নিলো। একটু থেমে ও বললো, 'মা জানো, আমার না এই স্কুলটা দারুন পছন্দ হয়েছে!'

তোমার পছন্দ অপছন্দতে তো কিছু এসে যায় না বাবা, মা মনে মনে বললেন। আসলে তো ওদের তোমাকে ভালো লাগতে হবে। মা মনে মনে এইসব বললেন, তবে মুখে নয়। কেবল মেয়ের জামাটা ছেড়ে দিয়ে, হাত ধরে, হেডমাস্টারমশাইয়ের অফিসের দিকে চললেন।

রেলের কামরাগুলোতে সকালের পড়াশুনো শুরু হয়ে গিয়েছিলো বলে সব চুপচাপ, শান্ত হয়ে ছিলো। স্কুল চত্বরটা তেমন বড় নয়। চারদিক পাঁচিলের বদলে গাছ দিয়ে ঘেরা আর কোথাও কোথাও মাঠের উপরে ফুলের জন্য আলাদা করে জায়গা করা, তাতে লাল হলুদ ফুল ফুটে রয়েছে। হেডমাস্টারমশাইয়ের অফিসটা রেলগাড়ির মধ্যে নয়, স্কুলের গেট দিয়ে ঢুকেই উল্টোদিকে যে একটা একতলা বাড়ি, তার ডানদিকের একটা ঘরে অফিস। সাত ধাপ গোল সিঁড়ি বেয়ে উঠে তবে সেখানে যেতে হয়।

মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ তোত্তো-চান থমকে দাঁড়ালো। আর একটু হলে ওর সঙ্গে মায়ের ধাক্কা লেগে যাচ্ছিলো আর কি! 'কী হলো?' মা জিজ্ঞেস করলেন? ও কি স্কুল সম্পর্কে মত পাল্টালো না কি? মায়ের চেয়ে একটু ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে খুব গম্ভীর গলায় তোত্তো-চান ফিসফিস করে বললো, 'আমরা যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি সে নিশ্চয় এখানকার স্টেশনমাস্টার?' এমন সব প্রশ্নের উত্তরে মা-ও মজা করতে পারেন, একটুও ধৈর্য হারান না কখনো। তাই তোত্তো-চানের মুখের কাছে মুখ এনে, ফিসফিস করে উত্তর দিলেন, 'কেন বল্ তো?' তোত্তো-চান আবার ফিসফিসিয়ে বললো, 'তুমি তো বললে যে হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, কিন্তু যার এতগুলো রেলগাড়ি আছে, সে তো একজন স্টেশনমাস্টার!'

সত্যিই, রেলগাড়ি-স্কুলের ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের! মা'র নিজেরও তা মনে হচ্ছিলো। কিন্তু এত কিছু তো এখন বুঝিয়ে বলার সময় নেই। তাই মা শুধু বললেন, 'তুমি বরং ভেতরে ঢুকে হেডমাস্টারমশাইকে কথাটা জিজ্ঞেস কোরো কেমন? কিন্তু ধরো, বাবা তো বেহালা বাজান, বাবার অনেকগুলো বেহালা আছে, তাই বলে কি আমাদের বাড়িটা একটা বেহালার দোকান?'

'না, তো অবশ্য নয়,' বলে তোত্তো-চান মায়ের হাতের ভিতরে ওর হাতটা গুঁজে দিলো।

হেডমাস্টারমশাই

তোত্তো-চান আর মা ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাথার ওপরকার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, দাঁতও পড়ে গেছে কয়েকটা, তবু চেহারায় একটা দারুন দীপ্তি। মাঝারি গড়ন, চওড়া কাঁধ, শক্ত সবল এক জোড়া হাত। যে কালো কোট প্যান্ট উনি পরে ছিলেন, পুরনো হলেও তাতে কোনো মলিনতা নেই, সব মিলে বেশ একটা পরিচ্ছন্নভাব।

তোত্তো-চান তাড়াতাড়ি করে সামনের দিকে ঝুঁকে, অভিবাদনের পালা চুকিয়ে দিয়েই জানতে চাইলো : 'তুমি কে বলো তো? স্কুলের মাস্টারমশাই, না কি স্টেশনমাস্টার?'

মেয়ের কথাতে মা লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো কৈফিয়ৎ দেবার আগেই ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমি আসলে এই স্কুলের হেডমাস্টারমশাই।'

তোত্তো-চান ভারি খুশি হয়ে উঠলো। 'ওহ্! তাহলে তো খুব ভালো হলো! আমি তাহলে তোমার কাছে একটা জিনিস চাইছি : আমি এই স্কুলে পড়বো।'

হেডমাস্টারমশাই তোত্তো-চানকে একটা চেয়ারে বসতে বলে মায়ের দিকে ফিরে তাকালেন। উনি বললেন, 'আপনি বরং এবার বাড়ি চলে যান, আমি তোত্তো-চানের সঙ্গে একটু গল্প করি।'

তোত্তো-চানের একটু ভয় করছিলো ঠিকই, আবার ও এও বুঝতে পারছিলো যে এই মানুষটার সঙ্গে দিব্বি গল্প করা যাবে। মায়েরও একটু মন খারাপ হচ্ছিলো। তবু শক্ত হয়ে বললেন, 'ও তাহলে আপনার কাছেই রইলো।' তারপর দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

হেডমাস্টারমশাই এবার তোত্তো-চানের মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে এনে বললেন, 'বেশ। এবার তাহলে তুমি তোমার কথা বলো। যা তোমার আমাকে জানাতে ইচ্ছে করছে, সব। তোমার যা খুশি তাই।'

'যা খুশি তাই?' তোত্তো-চান ভেবেছিলো ওকে হয়তো অনেক সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তাই হেডমাস্টারমশাই যখন ওকে বললেন যে ও যা খুশি তাই বলতে

পারে, তখন একটুও দেরি না করে ও হুড়মুড়িয়ে কথা শুরু করে দিলো। একটু আগডুম বাগডুম, একটু এলোমেলো—তবু কথা বলতে ওর কোনো অসুবিধে হচ্ছিলো না। যে ট্রেনটায় চড়ে ওরা স্কুলে এলো, সেটা কেমন করে খুব জোরে ছুটছিলো; কেমন ও টিকিট চেকারের কাছে একটা টিকিট চেয়েছিলো কিন্তু কিছুতেই উনি দিলেন না; আগের স্কুলের দিদিমণি কেমন সুন্দর দেখতে ছিলেন; সোয়ালা পাখিদের বাসাটা কেমন ছিলো; ওর কুকুর রকি, যার গায়ের রং খয়েরি, সে কেমন অনেক খেলা দেখাতে পারে; কেমন করে ও মুখের ভেতরে কাঁচি ঢুকিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ করতে পারে আর কিণ্ডারগার্টেনের দিদিমণি ওকে ওই রকম করতে দেখলে বারণ করতেন কারণ তাতে জিভ কেটে যেতে পারে, তবু কেমন ও মুখের ভেতরে কাঁচি ঢুকিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতোই; ওর নাক দিয়ে সর্দি গড়ালে মা ওকে কেমন বকেন আর তাই ওকে তখন নাক ঝাড়তেই হয়; বাবা কেমন ভালো সাঁতার কাটতে পারেন আর ভালো ডাইভও দিতে পারেন। আরো কত কী যে বলে গেল ও! হেডমাস্টারমশাই এক একবার একটু হাসেন, মাথা নাড়েন আর ওকে বলেন, 'তারপর?' অমনি তোত্তো-চান খুশি হয়ে আরো অনেক কথা বলে চলে। তারপর এক সময় ওর কথা ফুরিয়ে গেলো। তখন ও চুপ করে বসে খুব জোর ভাবতে লাগলো, এবার কী বলবে?

'আর কিছু বলবে না তুমি আমাকে?' হেডমাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন। ইস্, আর যে কিছুই বলার নেই ওর, এটা তো ভারি লজ্জার ব্যাপার! এমন দারুন একটা সুযোগ ছিলো কথা বলার! আর কি কিছু বলতে পারে না তোত্তো-চান? ও খুব করে ভাবতে লাগলো। অমনি মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। আজ যে জামাটা পরে এসেছে ও, তার কথাটা তো বলতে পারে! মা-ই ওর বেশির ভাগ জামা সেলাই করেন, কিন্তু এটা দোকান থেকে কেনা। রোজ ও ছেঁড়া জামা নিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে। কখনো কখনো বেশিই ছিঁড়ে যায় জামা। মা কখনোই বুঝতে পারেন না, এটা হয় কেমন করে? মাঝে মাঝে ওর ছোট্ট ইজেরটাও ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যায়। আসল ব্যাপারটা ও হেডমাস্টারমশাইকে বুঝিয়ে বললো। যখন তোত্তো-চান কোনো কাঁটাতারের বেড়ার তলা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কোথাও যাবার চেষ্টা করে—অন্য কারো বাড়িতে বা পাশের কোনো ফাঁকা জমিতে—তখনই। ওর জামাটামা সব ছিঁড়ে যায়। তাই আজ সকালে যখন ও এখানে আসবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো তখন দেখা গেলো যে মায়ের সেলাই করা সবকটা জামাই ছিঁড়ে গেছে আর তখন ওকে এই কেনা জামাটাই পরতে হলো। লাল আর ছাই রঙের খোপ খোপ করা জার্সি কাপড় দিয়ে তৈরি জামাটা এমনিতে ভালোই, কিন্তু ফুল-তোলা লাল কলারটা মায়ের পছন্দ হয়নি। 'মা বলেছে এই ফুলগুলোতে রুচি নেই একটুও,' বলে তোত্তো-চান কলারটা তুলে হেডমাস্টারমশাইকে দেখালো।

এরপর যতই ভাবে, কিছুতেই আর বলার মতো কিছু মাথায় আসে না। মনটা

একটু খারাপ হয়ে গেলো। এমন সময় হেডমাস্টারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে তোত্তো-চানের মাথার ওপর ওঁর মস্ত, উষ্ণ হাতটা রেখে বললেন, 'বেশ! এখন তুমি এই স্কুলের ছাত্রী হয়ে গেলে!'

ঠিক এই কথাগুলোই বললেন হেডমাস্টারমশাই। আর সেই মুহূর্তে তোত্তো-চানের মনে হলো এই মানুষটার মতন চমৎকার একজন মানুষের সঙ্গে আগে কখনো ওর দেখা হয়নি। আসলে, এর আগে কেউ তো কখনো ওর কথা এত মন দিয়ে শোনেই নি। এতক্ষণ ধরে, একবারও হাই না তুলে, বিরক্তি বা ক্লান্তি প্রকাশ না করে একটানা ওর কথা শুনে গেছেন হেডমাস্টারমশাই, দেখে মনে হচ্ছিলো কথাগুলোতে উনিও যেন ওর মতন মজা পাচ্ছেন।

তোত্তো-চান তখনো সময় দেখতে শেখেনি, তবুও ও বুঝতে পারছিলো যে বেশ অনেকটা সময় কেটে গেছে। যদি ওর সময়ের কোনো জ্ঞান থাকতো তাহলে ও সত্যিই অবাক হয়ে যেতো আর এই হেডমাস্টারমশাইকে আরো ভালো মনে হতো। কারণ মায়ের সঙ্গে তোত্তো-চান স্কুলে এসেছিলো সেই সকাল আটটায় আর যখন ওর কথা শেষ হলো আর হেডমাস্টারমশাই ওকে বললেন যে ও এই স্কুলের ছাত্রী হয়ে গেছে, তখন পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে উনি বললেন, 'এই তো দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে।' মানে, তোত্তো-চান নিশ্চয় চার, চারটে ঘণ্টা ধরে টানা বকবক করেছিলো।

এর আগে, বা পরে, কোনো দিনই কিন্তু বড়রা কেউ তোত্তো-চানের কথা এতক্ষণ ধরে শোনেননি। তাছাড়া মা এবং ওর আগের স্কুলের দিদিমণি বোধহয় ভাবতেই পারতেন না যে সাত বছরের একটা শিশুর চার ঘণ্টা ধরে বলার মতন এত কথাও থাকতে পারে।

ওকে যে আগের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো এবং অনেকেই যে ওকে নিয়ে কী করবেন বুঝতে পারতেন না, এসব কিছুই তোত্তো-চান জানতো না। ওর স্বভাবটা এমনিতেই খুব হাসিখুসি, তায় বেশির ভাগ সময়ই ও নিজের জগতে, আপন খেয়ালে থাকতো—বাইরে কী ঘটছে, কে কী বলছে, এসব ও ঠিক ধরতে পারতো না। ওর একটা নিজস্ব ধরনের সারল্য ছিলো। তবে তোত্তো-চান এটা ঠিকই বুঝতে পারতো যে ও ঠিক সবার মতন নয়। ও জানতো যে অনেকেই ওকে একটু অদ্ভুত মনে করে। সেদিন হেডমাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে, ওঁর মনের উত্তাপ পেয়ে, তোত্তো-চানের খুব আরাম লেগেছিলো তাই। খুব আনন্দ হয়েছিলো ওর। মনে হয়েছিলো, এবার আর কেউ ওকে কিছু করতে পারবে না। ইচ্ছে হয়েছিলো সারাটা জীবন এই মানুষটার কাছে থেকে যায়। পরিচয়ের প্রথম দিন হেডমাস্টারমশাই সোসাকু কোবায়াশিকে এতটাই ভালো লেগেছিলো তোত্তো-চানের। ভালো কথা হলো, হেডমাস্টারমশায়েরও ঠিক এতটাই ভালো লেগেছিলো ওকে সেদিন।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া

হেডমাস্টারমশাই তোত্তো-চানকে নিয়ে গেলেন দুপুরের খাওয়াদাওয়াটা দেখতে। 'আমরা ট্রেনের ভিতরে খাই না,' উনি ওকে বুঝিয়ে বললেন। 'খাওয়া হয় হলঘরে।' খানিক আগে যে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে তোত্তো-চান অফিসে গিয়েছিলো, তারই মাথায় হলঘরটা। হলে ঢুকে তোত্তো-চান দেখে যে ছেলেমেয়েরা সব ক্যাচরম্যাচর করতে করতে চেয়ার টেবিল ঘুরিয়ে গোল করে সাজাচ্ছে। ঘরের একটা কোণে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে দেখতে তোত্তো-চান হেডমাস্টারমশাইয়ের কোটের হাতা ধরে টান দিলো। 'বাকি ছেলেমেয়েরা কোথায়?'

'এ-ই তো সব,' উনি বললেন।

'এইটুকু? ব্যাস্?' তোত্তো-চান বিশ্বাস করতে পারছিলো না। আগের স্কুলে তো এক একটা ক্লাসেই এতজন করে ছিলো।

'মানে এই স্কুলে মোটে পঞ্চাশজন ছেলেমেয়ে পড়ে?'

'ঠিক তাই,' হেডমাস্টারমশাই বললেন। তোত্তো-চান ভাবলো, এই স্কুলের সব কিছুই দেখছি অন্য রকম!

সবাই বসবার পর হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'কই দেখি, সবাই সাগর থেকে পাহাড় থেকে কিছু কিছু জিনিস এনেছো কি?'

'হ্যাঁ!' সব টিফিনবাক্স খুলতে খুলতে চিৎকার করে উঠলো।

'দেখি কি এনেছো?' বলে হেডমাস্টারমশাই ঘুরে ঘুরে সবার টিফিনবাক্সের ভেতরে কী কী আছে, তা দেখতে লাগলেন। সবাই তো হেসে কুটিকুটি হচ্ছিলো।

'কী সব কাণ্ড!' তোত্তো-চান মনে মনে ভাবলো। 'সাগর থেকে পাহাড় থেকের মানেই বা কী, কে জানে?' এই স্কুলে সবই অন্যরকম, সব কিছুতেই মজা। স্কুলের দুপুরের খাওয়াদাওয়া যে এত মজার হতে পারে ও ভাবতেই পারেনি। কাল ও-ও যে এখানে বসে ওর বাক্স খুলে হেডমাস্টারমশাইকে 'সাগর থেকে পাহাড় থেকে কিছু কিছু জিনিস আছে কি না তা দেখাবে, এ কথা ভাবতেই ওর এত আনন্দ হচ্ছিলো যে ওর নেচে উঠতে ইচ্ছে করছিলো।

ঘুরে ঘুরে সবার টিফিনবাক্সের ভিতরে কী আছে দেখছিলেন হেডমাস্টারমশাই, আর ওঁর কাঁধের ওপরে দুপুরের রোদ এসে গা এলিয়ে দিয়েছিলো।

নতুন স্কুল শুরু হলো

'এখন তুমি এই স্কুলের ছাত্রী হয়ে গেলে'—হেডমাস্টারমশাই এই কথা বলবার পর থেকে তোত্তো-চানের আর যেন তর সইছিলো না। কখন রাত শেষ হবে, কখন নতুন দিন আসবে, ও অধীর হয়ে তার অপেক্ষা করছিলো। এমনিতে ওকে সকালবেলায় ঘুম থেকে তুলতে মায়ের বেশ কষ্ট করতে হতো। কিন্তু আজ ও সবার আগে সাত

তাড়াতাড়ি উঠে তৈরি-টৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিলো, পিঠে স্কুলের ব্যাগটা ঝুলিয়ে রওনা দেবার জন্য।

বাড়ির মধ্যে রকিরই সবচেয়ে বেশি সময়ের জ্ঞান। ওদের জার্মান শেপার্ড কুকুর, রকি সে এতক্ষণ খানিক সন্দেহের চোখে তোত্তো-চানকে লক্ষ্য করছিলো। এবার হাত পা টানটান করে আড়মুড়ি ভেঙে, তোত্তো-চানের পাশে পাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো, যেন কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায়।

মায়ের আজ অনেক কাজ। টিফিন বাক্সে 'পাহাড় থেকে আর সাগর থেকে' কিছু কিছু জিনিস ভরে দিতে হবে। তারপর তোত্তো-চানের ট্রেনের পাসটা একটা প্লাস্টিকের মোড়কে ভরে, মোটা একটা সুতো দিয়ে মালা করে ওর গলা থেকে ঝুলিয়ে দিলেন, যাতে ও হারিয়ে না ফেলে।

'লক্ষ্মী হয়ে থেকো,' বাবা বললেন। বাবার চুলগুলো উসকো খুসকো হয়ে ছিলো।

'নিশ্চয়।' তোত্তো-চান জুতো পরতে পরতে বললো তারপর দরজা খুলে, পেছন ফিরে, সবাইকে নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে ও হাত নাড়লো : 'যাচ্ছি! টা টা!'

তোত্তো-চানকে বেরিয়ে যেতে দেখে মায়ের চোখে জল ভরে এলো। এই টগবগে, ছোট্ট মেয়েটা, যার ভেতরে এত ফুর্তি, যে এমন লক্ষ্মী হয়ে রওনা দিলো, বেচারা তাকেই একটা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে! এটা তো ভাবাই যায় না। এবার যেন সব ভালো মতন চলে, হে ঈশ্বর, এবার যেন কোনো গোলমাল না হয়।

পরমুহূর্তেই তোত্তো-চানকে গলা থেকে টিকিটটা খুলে রকির গলায় ঝোলাতে দেখে মা প্রমাদ গুনলেন। না বাবা কিছু বলবো না, এই ভেবে মা অপেক্ষা করতে থাকলেন মেয়ে এবার কী করে, তা দেখার জন্য। মালাটা রকির গলায় ঝুলিয়ে তোত্তো-চান ওর সামনে উবু হয়ে বসে বললো, 'দেখলে তো? এটা মোটেও তোমার মাপে ঠিক হচ্ছে না।' টিকিটের মালাটা রকির গলা থেকে ঝুলে মাটিতে লুটোচ্ছিলো। এটা তোমার টিকিট নয়, এটা আমার, বুঝতে পারছো তো? ওরা তো তোমাকে ট্রেনে উঠতেই দেবে না। তবে, তোমাকে ওরা স্কুলে যেতে দেবে কিনা, সে কথাটা আমি হেডমাস্টারমশাই আর স্টেশনের ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে?'

প্রথমটায় রকি কান খাড়া করে তোত্তো-চানের কথা শুনছিলো। তারপর টিকিটটা দু-একবার চেটে নিয়ে ও একটা মস্ত হাই তুললো। 'রেলগাড়ি-ক্লাসগুলো তো চলে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তাই ওতে চড়তে তোমার টিকিট লাগবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আজ তুমি বাড়িতে থেকে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, কেমন?'

রকি রোজই তোত্তো-চানের সঙ্গে সঙ্গে ওর আগের স্কুলের গেট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতো, আজও ও তেমনি অপেক্ষা করছিলো। তোত্তো-চান রকির গলা থেকে টিকিটটা খুলে সাবধানে নিজের গলায় ঝুলিয়ে নিলো। আবার মা আর বাবাকে হাত

নেড়ে বললো, 'যাচ্ছি আমি।' তারপর, একবারও পিছনে না ফিরে ও ছুটতে শুরু করলো আর ওর পিঠের ব্যাগটা দুলতে থাকলো। রকিও ওর পাশে পাশে লাফিয়ে লাফিয়ে চললো।

স্টেশন আর ওর পুরনো স্কুল একই পথে পড়তো, তাই রাস্তায় অনেক চেনা কুকুর, বেড়াল আর পুরনো স্কুলের অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে ওর দেখা হলো। ওদের দেখাবে কি গলায় ঝোলানো টিকিটটা? আজ থাক। যদি দেরি হয়ে যায় নতুন স্কুলে যেতে? এই ভেবে ও এগিয়ে চললো।

পথটা যেখানে ভাগ হয়ে গেছে সেখানে পৌঁছে তোত্তো-চান এতদিন বাঁদিকে ঘুরতো। আজ ওকে ডানদিকে ঘুরতে দেখে রকি একটু চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। তোত্তো-চান ততক্ষণে স্টেশনের গেটে পৌঁছে গেছে, কিন্তু আবার ও রকির কাছে ফিরে এলো। বেচারা রকি যেন বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলো। 'আমি আর পুরনো স্কুলে যাচ্ছি না, বুঝেছো? এখন থেকে আমি নতুন স্কুলে যাবো।' রকির গালে গাল লাগিয়ে তোত্তো-চান ওকে আদর করলো। যদিও ওর কান থেকে সেই বিকট গন্ধটা আসছিলো। তবু তোত্তো-চানের গন্ধটা বেশ ভালই লাগতো।

'টা টা রকি।' বলতে বলতে ও গেটে দাঁড়ানো চেকারকে টিকিটটা দেখালো, তারপর স্টেশনের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। নিচে দাঁড়িয়ে রকি কুঁই কুঁই করতে থাকলো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোত্তো-চানকে দেখা গেলো, ততক্ষণ।

রেলগাড়ি-ক্লাস

হেডমাস্টারমশাই ওকে বলে দিয়েছিলেন কোন কামরাটাতে ওর ক্লাস হবে। সেই কামরার দরজায় পৌঁছে ও দেখলো যে কেউই তখনও আসেনি। বেশ পুরনো আমলের গাড়ি, বাইরে থেকে দুহাত দিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে, দরজাটা ঠেলে সরিয়ে, তবে উঠতে হয়। ক্লাসের ভেতরে উঁকি দেবার সময় তোত্তো-চানের বুকটা দুমদুম করতে লাগলো। উহ্! কী মজা! এখানে পড়া মানে তো সারাক্ষণ কোথাও না কোথাও থাকা!

জানলার ওপরে মালপত্র রাখবার তাক। সব একটা গাড়ির ভিতরে যেমন থাকে, তেমনই। তফাৎ হলো সামনে টাঙানো ব্ল্যাকবোর্ডটা। আর, পাশাপাশি বসানো বেঞ্চগুলোকে তুলে নিয়ে ডেস্ক আর চেয়ার পাতা হয়েছে। এছাড়া, রেলের কামরায় দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের জন্য ওপরের রড থেকে যে রিংগুলো ঝোলানো থাকে, সেগুলোও খুলে নেওয়া হয়েছিলো। তোত্তো-চান গিয়ে কার একজনের ডেস্কে যেন বসে পড়লো। কাঠের চেয়ারগুলো ওর আগের স্কুলের মতনই, কিন্তু বসতে মনে হলো যেন অনেক বেশি আরাম। এই চেয়ারে তো ও সারাদিন বসে থাকতে পারে! তোত্তো-চানের এত আনন্দ হচ্ছিলো, আর স্কুলটা এতই ভাল লাগছিলো যে মনে মনে ঠিক করে ফেললো ও একদিনও স্কুল কামাই করবে না।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো তোত্তো-চান। ও জানতো যে এই কামরাগুলো চলতে পারে না, তবু ওর মনে হলো ট্রেনটা যেন চলছে। হয়তো বাইরে হাওয়ায় গাছ আর ফুলগুলো দুলছিলো বলে ওর এমন মনে হয়েছিলো। 'ওহ্, কী ভালো!' বলে ও জানলার কাঁচে গালটা ঠেকিয়ে দিয়ে গুনগুন করে একটা গান গাইতে লাগলো। এরকমই করে তোত্তো-চান। যখন খুব আনন্দ হয় তখন আপন মনে কিছু একটা গান বানিয়ে বানিয়ে গাইতে থাকে।

আমি খুব খুশি,
খুব খুশি আমি!
কেন আমি খুশি?
কারণ...

সেই মুহূর্তে একটি মেয়ে গাড়িতে উঠে এলো। ব্যাগ থেকে নোটবই আর পেনসিল বের করে, ডেস্কের ওপরে রেখে, পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা তাকে তুলে দিলো মেয়েটি। জুতোর থলেটাও ওপরে তুলে রাখলো। তোত্তো-চান গান থামিয়ে মেয়েটির দেখাদেখি নিজের ব্যাগটা তুলে রাখলো। এরপর একটি ছেলে উঠে এসে দরজা থেকে ওর ব্যাগটা তাকের দিকে ছুঁড়ে দিলো, ঠিক যেন বাস্কেটবল খেলছে। ব্যাগটা তাকে না পৌঁছে মাটিতে পড়ে গেলো। 'হলো না, খুব খারাপ,' বলে ও ব্যাগটা তুলে নিয়ে আবার একই জায়গা থেকে তাক করলো। এবার ব্যাগ গন্তব্যে ঠিক মতো পৌঁছুলো। 'বেশ ভাল!' বললো ছেলেটি। কিন্তু তারপরই আবার 'খুব খারাপ' বলে ব্যাগটা নামিয়ে এনে ওর নোটবই আর পেনসিলের বাক্স বের করে নিলো। অর্থাৎ এবার তাকটা ভালই ছিলো, কিন্তু জরুরি জিনিসগুলো বের করতে ভুলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।

শেষ পর্যন্ত ন'জন ছেলেমেয়ে জড়ো হলো ক্লাসে। ন'জন মিলে ক্লাস ওয়ান। তোমোই-গাকুয়েনের ক্লাস ওয়ান। সবাই মিলে এক সঙ্গে নানা দেশে যাবে, একই গাড়িতে চেপে।

লেখাপড়া

রেলগাড়ির কামরায় ক্লাস হওয়াটাই যথেষ্ট নতুন একটা ব্যাপার ছিলো। তার উপরে ক্লাসের ভিতরে বসার ব্যবস্থাটা ছিল অন্য রকমের। আগের স্কুলে তো প্রত্যেকের বসার জায়গা ঠিক করা ছিলো, প্রতিদিন সেখানেই বসতে হতো। এখানে যে যেখানে খুশি বসতে পারে। অনেক ভেবেচিন্তে তোত্তো-চান কান-ঝোলা খরগোশের ছবি আঁকা, ঢিলেঢালা জামা পরা মেয়েটার পাশে গিয়ে বসলো।

ক্লাসরুম, বসার ব্যবস্থা, এর চেয়েও যে ব্যাপারটা অন্য রকম ছিলো তোমোই-তে, তা এখানকার লেখাপড়ার নিয়ম। এমনিতে তো সব স্কুলে প্রথমে একটা পিরিয়ডে

একটা বিষয় পড়ানো হয়, পরের পিরিয়ডে অন্য বিষয়। যেমন, প্রথম ক্লাসটাতে হয়তো জাপানী পড়ানো হলো, দ্বিতীয়টায় অঙ্ক, তখন সবাই অঙ্ক করছে। এখানকার নিয়ম ছিলো, দিনের শুরুতে প্রত্যেক ক্লাসের শিক্ষক বা শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের সেদিনকার কাজের প্ল্যানটা বলে দিতেন—মানে সারাদিন ধরে কী কী কাজ করা হবে, কী কী বিষয় শেখা হবে, তার একটা ফর্দ। তারপর তিনি বলতেন, 'এবার তোমরা যে কাজটা দিয়ে দিন শুরু করতে চাও সেটা করে ফেলো।' ফলে, তুমি প্রথমে অঙ্ক করলে না কি ভাষা শিখলে, তাতে কিছুই এসে যেতো না। কেউ হয়তো রচনা লিখতে ভালবাসে, একদিকে বসে সে রচনা লিখে চলেছে, ওদিকে তোমার ঠিক পেছনে কেউ হয়তো বিজ্ঞান ভালবাসে, ছোট বার্ণারটায় একটা কাঁচের পাত্র চাপিয়ে সে তখন কিছু একটা গরম করে চলেছে, এবং যে কোনো মুহূর্তেই হয়তো একটা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

এইভাবে পড়ানোর উদ্দেশ্য ছিলো, ছেলেমেয়েরা যত উঁচু ক্লাসে উঠবে, শিক্ষক-শিক্ষিকারা ততই স্পষ্ট দেখতে পাবেন কে কোন বিষয়ে বেশি উৎসাহ পায় এবং কোনটাতে কে বেশি ভাল করে। এইভাবে ওঁরা ওঁদের ছাত্রছাত্রীদের মনগুলো চিনতে পারবেন, বৈশিষ্টগুলো ধরতে পারবেন।

আর ছেলেমেয়েরা ওদের প্রিয় বিষয় দিয়ে দিন শুরু করতে পারতো, তাই ওরা জানতো যে সারাটা দিন পড়ে আছে অপছন্দের কাজগুলো করবার জন্য। এর ফলে অপছন্দের কাজগুলোও এক সময় ঠিক করা হয়ে যেতো। পড়াশুনোটা ওরা মোটামুটি স্বাধীনভাবেই করতো, কোথাও কখনো ঠেকে গেলে শিক্ষকের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইতো। অনেক সময় শিক্ষকরাও ওদের কাছে এসে ধৈর্য ধরে, সময় নিয়ে কিছু কিছু জিনিস বুঝিয়ে দিতেন। তারপর, ছেলেমেয়েদের ঐ একই বিষয়ে আরো কিছু কাজ দেওয়া হতো যাতে অসুবিধেগুলো একেবারে চলে যায়। সত্যিকারের লেখাপড়া বলতে যা বোঝায়, তারই চর্চা হতো তোমোই-তে। একদিকে দিদিমণি পড়িয়েই চলেছেন আর ওদিকে ক্লাসে কারো কারো একটুও মন নেই পড়ায়—এমনটা হতে পারতো না কিছুতেই।

ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েরা অবশ্য স্বাধীনভাবে পড়াশুনো করবার মতন বড় হয়নি তখনো, তবু ওরাও যে যার ইচ্ছে মতন বিষয় বেছে নিয়ে পড়া শুরু করতে পারতো। কেউ হয়তো অক্ষর লিখছে, কেউ ছবি আঁকছে. কেউ ব্যায়াম করছে। তোত্তো-চানের পাশের মেয়েটি ইতিমধ্যেই সমস্ত অক্ষর শিখে ফেলেছে, সে তখন অক্ষরগুলি নিজের খাতায় লিখে রাখছিলো। এই সব তোত্তো-চানের কাছে এতই নতুন লাগছিলো যে ওর বেশ ভয়ভয় করছিলো। ঠিক বুঝতে পারছিলো না কী করবে।

এক সময় তোত্তো-চান দেখলো যে ওর পেছনে যে ছেলেটি বসে ছিলো, সে উঠে

দাঁড়িয়ে খাতা নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দিদিমণিকে বোধহয় কিছু একটা দেখাতে চাইছিলো। ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে রাখা একটা ডেস্কে বসে দিদিমণি আর একজনকে কী যেন বোঝাচ্ছিলেন। দুহাতের ভিতরে চিবুকটা গুঁজে তোত্তো-চান দিদিমণির দিকে এগিয়ে যাওয়া ছেলেটিকে দেখতে লাগলো। ছেলেটি পা টেনে টেনে হাঁটছিলো আর ওর শরীরটা লগবগ করতে করতে এগোচ্ছিলো। তোত্তো-চান প্রথমটাতে ভেবেছিলো ছেলেটি বুঝি এমনি এমনিই ওভাবে হাঁটছে, কিন্তু খানিক বাদেই বুঝতে পারলো যে ও আসলে অন্য কোনোভাবে হাঁটতে পারে না। ছেলেটি ওর জায়গায় ফিরে আসা পর্যন্ত তোত্তো-চান ওকে দেখতে লাগলো। দুজনের চোখাচোখি হতে ছেলেটি একটু হাসলো। তোত্তো-চানও অমনি একটু হাসলো। নিজের জায়গায় বসতে ছেলেটির অনেকটা সময় লাগলো, অন্যদের যতটা সময় লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি। তোত্তো-চান ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, 'তুমি ওভাবে হাঁটো কেন?'

ছেলেটি ধীরে ধীরে খুব সুন্দভাবে উত্তর দিলো, 'আমার তো পোলিও হয়েছিলো।' ওর কথায় একটা বুদ্ধির ঝলক ছিলো।

'পোলিও?' তোত্তো-চান এই শব্দটা আগে কখনো শোনেনি।

'হ্যাঁ, পোলিও। শুধু আমার পায়ে নয়, হাতেও।' এই বলে ও ওর হাত দুটো মেলে ধরলো। ওর বাঁ হাতের লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো বেঁকে গিয়েছিলো, আর দেখে মনে হচ্ছিলো সব বুঝি—একসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

'কেউ এটা ঠিক করতে পারে না?' তোত্তো-চান চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো। ছেলেটি কোনো উত্তর দিলো না। তোত্তো-চানের তখন খুব খারাপ লাগতে লাগলো, মনে হলো কথাটা না জিজ্ঞেস করলেই হতো। ছেলেটি অবশ্য হাসিমুখে ওকে বললো, 'আমার নাম ইয়াসুয়াকি ইয়ামোমোতো। তোমার?'

তোত্তো-চান ওর খুশিভাব দেখে নিজেও খুশি হয়ে উঠলো। বললো, 'আমি তোত্তো-চান।' এইভাবেই তোত্তো-চান আর ইয়াসুয়াকি ইয়ামোমোতো বন্ধু হয়ে গেলো। সূর্যের তাপে ট্রেনের কামরার ভেতরটা গরম হয়ে গিয়েছিলো। কে যেন একটা জানলা খুলে দিলো। বসন্তের ঝরঝরে বাতাস গাড়ির ভিতরে ঢুকে ওদের চুলের ভিতর দিয়ে খেলে গেলো।

তোমোই-তে তোত্তো-চানের প্রথম দিনটা এইভাবে শুরু হয়েছিলো।

সাগর থেকে, পাহাড় থেকে

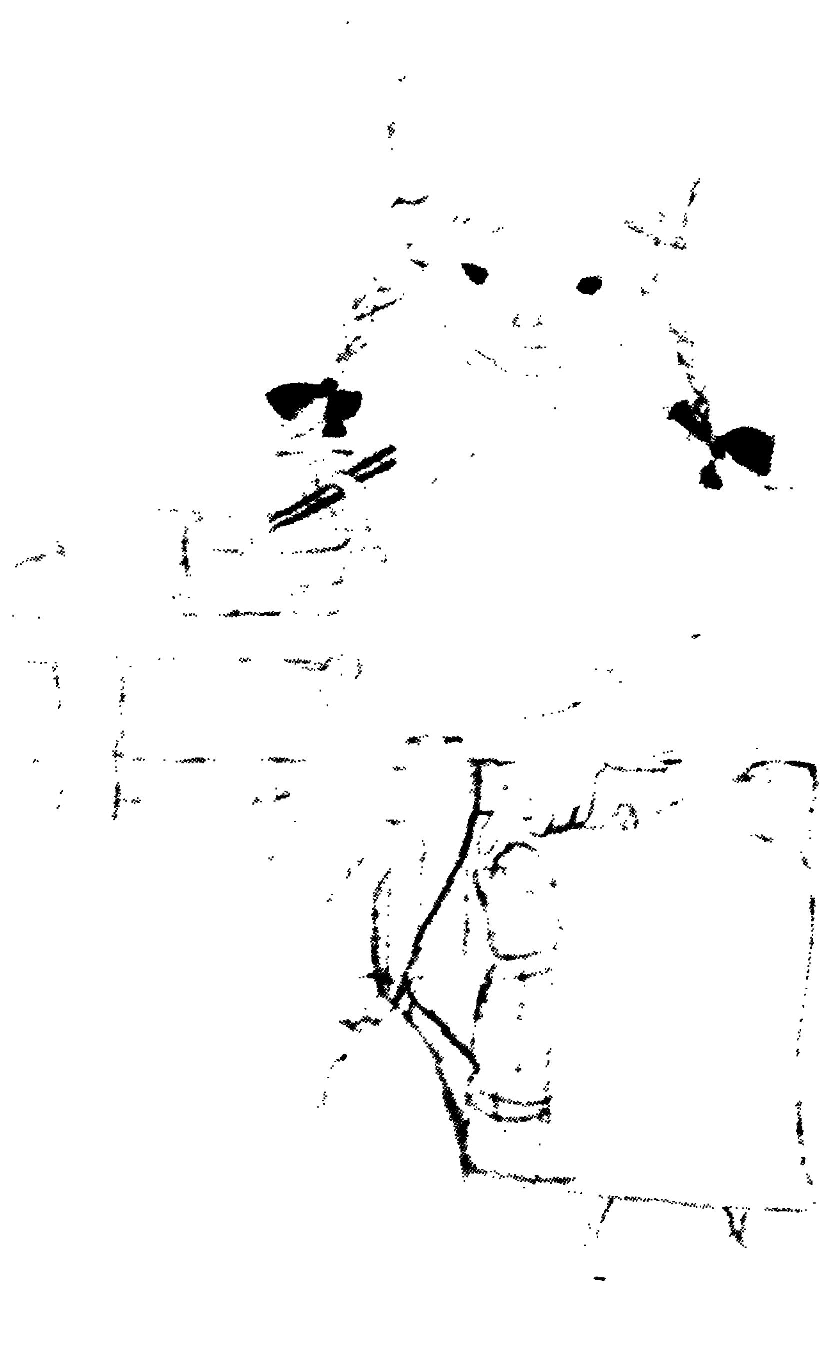
তারপর এলো 'সাগর থেকে, পাহাড় থেকে'-র সময়। মানে, দুপুর বেলার খাওয়াদাওয়া। কখন থেকে যে তোত্তো-চান এই সময়টার অপেক্ষায় বসে আছে!

হেডমাস্টারমশাইয়ের ভাষায় 'সাগর থেকে পাহাড় থেকে'-র মানে হলো প্রয়োজনীয়, পুষ্টিকর খাবার। টিফিনবাক্সে কেবল ভাত ভরে দিলে চলবে না, সঙ্গে

শাক-সবজি, মাছ বা মাংসও দিতে হবে। 'শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য দিন', 'আপনার ছেলেমেয়েকে সব ধরনের খাবার খেতে শেখান'—এইসব বাঁধা বুলির বদলে বাবা মাকে 'সাগর থেকে পাহাড় থেকে'-র কথাটা বুঝিয়ে বলা কত সহজ!

'সাগর থেকে'-র মানে কোনো সামুদ্রিক খাবার, যেমন মাছ, কাঁকড়া বা চিংড়ি। কিংবা সয়াসস আর মিষ্টি 'সাকে' (জাপানী মদ) দিয়ে রান্না করা 'সুকুদা-নি'। 'পাহাড় থেকে'-র মানে শাক-সবজি, মুর্গি, শুয়োরের মাংস, এইসব।

মায়ের কিন্তু এই 'সাগর থেকে, পাহাড় থেকে'-র কথাটা খুবই পছন্দ হয়েছিলো। আর কেউ কি এমন জরুরি একটা কথা এত সহজ করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন? মজার ব্যাপার হলো, এই নিয়ম মেনে চলতে গিয়ে টিফিন তৈরির কাজটাও যেন সহজ হয়ে গিয়েছিলো। হেডমাস্টারমশাই তো বলেই দিয়েছিলেন, কী দিই কী দিই করে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হবে না। 'পাহাড় থেকে' মানে একটা অমলেটও হতে পারে, বা



'কিনপিরা গোবো' (মশলা দেয়া বার্ডক শাক), 'সাগর থেকে' হতে পারে শুকনো 'বোনিতো'। আরো সহজ সামুদ্রিক আগাছা 'নোরি' আর প্লামের আচার।

যেদিন তোত্তো-চান এই স্কুলে ভর্তি হতে এসেছিলো, সেদিনও যেমন হেডমাস্টারমশাইকে সবার টিফিনবাক্স খুলে কী কী আছে দেখতে দেখেছিলো, আজও তেমনি টিফিন দেখার পালা শুরু হলো। 'সাগর থেকে, পাহাড় থেকে এনেছো তো?' সকলকে একে একে জিজ্ঞেস করতে থাকলেন হেডমাস্টারমশাই। পেছন পেছন সাদা এপ্রন পরে, দুই হাতে দুটো গমলা নিয়ে চলেছেন ওঁর স্ত্রী। কারো বাড়ি থেকে হয়তো 'সাগর থেকে' দিতে ভুলে গেছে। তাই দেখে হেডমাস্টারমশাই হেঁকে উঠলেন 'সাগর' বলে! অমনি এক হাতা 'চিকুয়া' বা মাছের রোল এসে পড়লো সেই টিফিনবাক্সে। অথবা, কেউ হয়তো 'পাহাড় থেকে' আনেনি। 'পাহাড়' শুনেই হেডমাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী সেই টিফিনবাক্সে একদলা সয়াসসে ভেজানো আলুসেদ্ধ তুলে দিলেন।

তখন কে-ই বা বলতে যাবে, মাছের রোল আমি খাইনা? অথবা, ইস্ অমুকের টিফিনটা কী ভালো! অমুকেরটা কী পচা! সেকথাও কি আর কেউ ভাবতে পারবে? তখন সবার মাথায় কেবল একটাই চিন্তা—টিফিনবাক্সে 'সাগর থেকে, পাহাড় থেকে' দেওয়া হয়েছে তো? ব্যাস্, তাহলেই হলো। এবার তাহলে খুশি মনে খাবারটা খেয়ে নিই।

'সাগর থেকে, পাহাড় থেকে'-র ব্যাপারটা বোঝার পর থেকে তোত্তো-চানের মনে একটাই ভয়, তাড়াহুড়োর মধ্যে মা সবকিছু ঠিকমতন টিফিনবাক্সে ভরে দিয়েছে তো? হেডমাস্টারমশাইয়ের ওর টিফিনটা পছন্দ হবে তো?

টিফিনবাক্সটা খুলেই আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে করলো তোত্তো-চানের। কী চমৎকার খাবার! হলুদ ডিমভাজা, সবুজ কড়াইশুঁটি, খয়েরি দেনবু আর গোলাপি কড মাছ। এত রং। ঠিক যেন একটা ফুলের বাগান!

'বাঃ, খুব সুন্দর তো!' হেডমাস্টারমশাই বললেন। তোত্তো-চানের ভারি আনন্দ হলো। 'আমার মা খুব ভাল রান্না করে,' ও বললো।

'তাই বুঝি?' হেডমাস্টারমশাই এবার ওর দেনবুটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলো তো, এটা পাহাড় থেকে এসেছে, না সাগর থেকে?' তোত্তো-চান ভাবলো, খয়েরি মানে কি মাটি? মাটি মানে কি পাহাড়? ও বললো, 'আমি জানি না।'

হেডমাস্টারমশাই এবার স্কুলের সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেনবু কোথাকার খাবার বলো তো? সাগর, না পাহাড়?'

একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে একদল চেঁচিয়ে উঠলো 'পাহাড়' বলে, অন্য দল বললো 'সাগর'।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'ঠিক আছে, আমিই বলে দিচ্ছি—দেনবু আসে সাগর থেকে।'

'কেন?' বেশ মোটাসোটা একটা ছেলে জানতে চাইলো।

গোল করে সাজানো চেয়ারের মধ্যিখানের ফাঁকা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে হেডমাস্টারমশাই কথাটা বুঝিয়ে বললেন। 'মাছ সেদ্ধ করে কাঁটা ছাড়িয়ে, হালকা করে সেঁকে, তারপর গুঁড়ো করে, মশলা মিশিয়ে,.শুকিয়ে, তবে দেনবু তৈরি হয়।'

'তাই!' ছেলেমেয়েরা বলে উঠলো। মনে হলো দেনবু তৈরির কথাটা জেনে ওরা বেশ খুশি হয়েছে। তোত্তো-চানের দেনবুটা একটু দেখতে পারে কি না জানতে চাইলো একজন।

'অবশ্যই!' হেডমাস্টারমশাই বললেন। অমনি ছেলেমেয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো তোত্তো-চানের দেনবুর উপরে। দেনবু কেমন খাবার তা নিশ্চয়ই অনেকেই জানতো, তবু এত কথার পর সকলেরই তোত্তো-চানের দেনবুটা দেখার ইচ্ছে হচ্ছিলো। কেউ আবার দেখতে চাইছিলো তোত্তো-চানের দেনবুটা ওদের দেনবুর মতন কি না? সবাই ওর টিফিনের ওপর ঝুঁকে পড়ায় তোত্তো-চান বেশ ঘাবড়ে গেলো—এত জনের নিঃশ্বাসের হাওয়ায় ওর দেনবু আবার উড়ে যাবে না তো?

সেদিন খেতে বসে প্রথম দিকে তোত্তো-চানের একটু ভয় ভয় করছিলো বটে, কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে গেলো। খাবার সময় কত কিই না শেখা হলো। দেনবুর কথা, সাগরের কথা, পাহাড়ের কথা। দেনবু যে মাছ দিয়ে তৈরি করা হয়, তা জেনে, আর মা যে ওর বাক্সে 'সাগর থেকে, পাহাড় থেকে, দিতে ভোলেননি সে কথা ভেবে ওর মন দারুণ খুশি হয়ে উঠলো। আর, খাবারটা মুখে দেবার পর তো আর কথাই নেই! আহ্! মায়ের তৈরি টিফিন, কী দারুণ খেতে!

ভালো করে চিবিয়ে খাও!

এমনিতে তো খেতে শুরু করার আগে 'ইতাদাকিমাসু' বলার কথা। অর্থাৎ, খেতে পেয়েছি বলে আমি ঈশ্বরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু তোমোই গাকুয়োনে এই ব্যাপারটাও অন্য রকম ছিলো। এখানে প্রথমে ছেলেমেয়েরা সকলে মিলে একটা গান গেয়ে নিতো। হেডমাস্টারমশাই গান বাজনার মানুষ ছিলেন; ওই 'খাবার আগে গাইবার গান'-টা উনি নিজেই লিখেছিলেন। আসলে, পুরনো, পরিচিত একটা গান, ইংরেজি 'রো রো রো ইওর বোট', তার সুরে উনি নিজের মতন করে কিছু কথা বসিয়ে নিয়েছিলেন। তোমোই-এর গানটা ছিলো এইরকম :

'ভালো করে চিবোও তুমি
চিবিয়ে চিবিয়ে খাও,
ভাত, মাছ, মাংস, ডিম
সবটা চিবিয়ে নাও!'

প্রথমে এই গানটা একবার গেয়ে নিয়ে, তারপর সবাই 'ইতাদাকিমাসু' বলে খেতে

শুরু করতো। 'রো রো রো ইওর বোট' গানটার সুরে এমন সুন্দরভাবে কথাগুলো বসে গিয়েছিলো যে অনেকদিন পর্যন্ত তোমোই-এর ছেলেমেয়েরা মনে করতো ওদের ওই 'খাবার আগের গানটা' বুঝি খুব পুরনো প্রচলিত কোনো গান।

হয়তো হেডমাস্টারমশাইয়ের কয়েকটা দাঁত পড়ে গিয়েছিলো বলে ও রকম একটা গান উনি বেঁধেছিলেন। কিন্তু আসল কথাটা হলো, উনি সব সময় ছেলেমেয়েদের বলতেন ধীরে ধীরে, গল্প করতে করতে, ভালবেসে খাবারটা খেতে। বোধহয় সে জন্যেই গানটা লিখেছিলেন। গানটা গলা ফাটিয়ে গাইবার পর 'ইতাদাকিমাসু' বলে, ওরা 'সাগর থেকে, পাহাড় থেকে' ভরা টিফিনবাক্স থেকে খেতে শুরু করতো। খানিকক্ষণের জন্য হলঘরটায় আর কোনো শব্দ শোনা যেতো না।

হাঁটতে যাওয়া

দুপুরে খাওয়ার পর বন্ধুদের সঙ্গে তোত্তো-চান বাইরে, মাঠে খানিকক্ষণ খেললো, তারপর ওরা ক্লাসে ফিরে গেলো। দিদিমণি ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। 'সকাল থেকে তো তোমরা অনেক কাজ করেছো, এখন দুপুরে কী করতে চাও বলো।'

তোত্তো-চান কিছু ভেবে ওঠার আগেই সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'আমরা হাঁটতে যাবো।'

'বেশ, চলো!' দিদিমণির এই কথা শুনেই বাচ্চারা সব হুড়মুড়িয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো। বাবা আর রকির সঙ্গে তোত্তো-চান অনেকবার হাঁটতে গেছে, তাই বলে স্কুল থেকে হাঁটতে যাবার কথা ও কখনও শোনেইনি, তাই ও অবাক হয়ে গেলো। কিন্তু হাঁটতে যেতে এত ভালো লাগে ওর যে কথাটা শোনার পর ও যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না।

পরে ও জেনেছিলো যে সকালবেলায় যদি কোনো ক্লাস ভালো করে পড়াশুনো করে, যদি দিদিমণির দেওয়া কাজ সবাই ঠিক মতন শেষ করতে পারে, তাহলে দুপুরে সাধারণত ওদের হাঁটতে নিয়ে যাওয়া হয়, তা সে ক্লাস ওয়ানই হোক বা ক্লাস সিক্স।

ক্লাস ওয়ানের নটি ছেলেমেয়ে আর তাদের দিদিমণি—সব দল বেঁধে চললো স্কুলের মাঠ পেরিয়ে, সরু নদীটার পাশ দিয়ে। নদীর দুধারে মস্ত চেরীগাছ, ক'দিন আগেই ফুলে ফুলে ঢেকে গিয়েছিলো। তারপর মাঠভরা হলুদ সর্ষে ফুল, যতদূর চোখ যায় দেখা যায়। সেই নদীটা এখন শুকিয়ে গেছে, মাঠেও এখন উঁচু বাড়ি আর দোকানের ভিড়। কিন্তু সে সময় জিয়ুগায়োকা জায়গাটা কত ফাঁকা ফাঁকা ছিলো।

'আমরা কুহনবুৎসু মন্দির পর্যন্ত যাই।' খরগোশ জামা পরা মেয়েটি তোত্তো-চানকে বললো। ওর নাম সাক্কো-চান। আগের বার আমরা ওখানে দিঘিতে একটা সাপ দেখেছিলাম, ও বললো। ওই মন্দিরটার পাশে না একটা কুয়ো আছে, ওখানে একবার আকাশ থেকে একটা উল্কা খসে পড়েছিলো।

ছেলেমেয়েরা কত কী নিয়ে বকবক করতে করতে হাঁটতে লাগলো। মাথার উপরে নীল আকাশ আর হাওয়ায় প্রজাপতির ওড়াওড়ি। মিনিট দশেক হাঁটার পর দিদিমণি একটু দাঁড়ালেন। হলুদ ফুলগুলো দেখিয়ে বললেন, 'ওগুলো হল সর্ষে ফুল। ফুল কেন ফোটে তোমরা জানো?' তারপর ওদের ফুলের কথা, রেণুর কথা, নলের মতন কেশরের কথা—এই সব অনেক বুঝিয়ে বললেন, আর ওরা সব মাঠের ধারে উবু হয়ে বসে ফুলগুলো পরীক্ষা করতে লাগলো। প্রজাপতি কেমন করে ফুল ফুটতে সাহায্য করে সে কথাও বললেন দিদিমণি। সত্যিই কত প্রজাপতি তখন ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছিলো।

দিদিমণি যখন আবার হাঁটতে শুরু করলেন তখন ছেলেমেয়েরা ফুল পরীক্ষা করা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একজন বললো, 'নল? কই এগুলো তো বন্দুকের মতন দেখতে নয়?' তোত্তো-চানেরও তাই মনে হচ্ছিলো, আবার এ-ও বুঝতে পারছিলো যে ফুলের রেণু, নলের মতন কেশর—এই সব হলো খুবই জরুরী ব্যাপার।

আর দশ মিনিট মতন হাঁটার পর ওরা একটা ঘন সবুজ গাছে ঘেরা পার্কের সামনে এসে দাঁড়ালো। কুহনবুৎসু মন্দিরটা ঘিরে রেখেছিলো ঐ উঁচু উঁচু গাছ। ভিতরে ঢুকে ওরা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

'সেই উল্কার কুয়োটা দেখবি?' তোত্তো-চানকে সাক্কো-চান জিজ্ঞেস করলো। তোত্তো-চান তো অমনি ওর পিছনে ছুট লাগালো। কুয়োর পাঁচিলটা ওদের বুক পর্যন্ত, ঠিক যেন পাথর দিয়ে তৈরি। ওপরে একটা কাঠের ঢাকনা। সেটা সরিয়ে ওরা ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলো শুধু ঘন অন্ধকার। তোত্তো-চানের মনে হলো নিচে একটা সিমেন্টের দলা রাখা আছে বুঝি। ঝকঝকে তারাটা, সেই উল্কাটা তাহলে গেলো কোথায়? ও তো ভেবেছিলো সেটাকে দেখা যাবে। অনেকক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ও সাক্কো-চানকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই তারাটাকে দেখেছিস?'

সাক্কো-চান মাথা নাড়লো। 'একদিনও দেখিনি।'

তোত্তো-চান ভাবছিলো, তারাটা জ্বলজ্বল করছে না কেন? অনেক ভাবার পর ও বললো, 'তারাটা বোধহয় এখন ঘুমিয়ে আছে।'

সাক্কো-চান ওর বড় বড় চোখদুটা আরো বড় করে বললো, 'তারারা ঘুমোয় বুঝি?'

'আমার মনে হয় ওরা নিশ্চয় দিনে ঘুমোয় আর রাতে জেগে উঠে জ্বলজ্বল করে জ্বলে,' তোত্তো-চান তাড়াতাড়ি একটা উত্তর দিয়ে দিল, কারণ আসলে ও তারাদের ঘুমের ব্যাপারটা ঠিক ভালো মতন জানতো না।

তারপর ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে মন্দিরের আশপাশটা ঘুরে দেখতে লাগলো। দরজার দুধারে দুই-ভুঁড়িওয়ালা দেবতার মূর্তি দেখে ওদের খুব হাসি পাচ্ছিলো। ভিতরে আধো অন্ধকারে বুদ্ধদেব বসে, ধ্যানস্থ, ভুঁড়িওয়ালা দেবতারা ওঁকে

পাহারা দিচ্ছেন। পাথরের ওপর একটা মস্ত পায়ের ছাপ—বাচ্চারা সবাই তার উপর একবার করে নিজেদের পা রাখলো। ওটা নাকি তেঙ্গু নামে একটা লম্বা নাকওয়ালা জিনের পায়ের ছাপ। ছোট্ট দিঘিটায় লোকজন নিকো চড়ে বেড়াচ্ছিলো, ওরা তাদের 'এই যে! এই যে!' বলে হাত নেড়ে ডাকাডাকি করলো খানিক। মন্দির চত্বরে একটা গোরস্থানও ছিলো। ওরা কালো চকচকে পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেখানে প্রাণভরে এক্কাদোক্কা খেললো। তোত্তো-চানের কাছে সব কিছুই নতুন, সবেতেই ওর দারুণ মজা।

'এবার আমাদের ফিরতে হবে!' সূর্য ডোবার মুখে দিদিমণি ওদের ডাক দিলেন। ছেলেমেয়েরা চেরী গাছ আর সর্ষে ক্ষেত পেরিয়ে স্কুলের দিকে চললো। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা বুঝতেই পারলো না, কখন খেলা আর পড়া থেকে ছুটির ফাঁকে ফাঁকে ওরা ইতিহাস, বিজ্ঞান—বিশেষ করে প্রাণীবিজ্ঞান সম্পর্কে কত কী জরুরী পাঠ নিয়ে ফেললো।

তোত্তো-চানের তো ইতিমধ্যে ক্লাসের সবার সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে—মনে হচ্ছিল যেন ওদের ও কতকাল ধরে চেনে! 'কাল আবার হাঁটতে যাবো, চল্!' ফেরার পথে ও চিৎকার করে সবাইকে বললো। সবাই বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কালকে আবার!' লাফিয়ে লাফিয়ে, ছুটে ছুটে ওরা স্কুলে ফিরে চললো। প্রজাপতিরা ব্যস্ত হয়ে ওড়াউড়ি করছিলো, হাওয়ায় পাখির গান ভেসে আসছিলো। তোত্তো-চানের মনটা তখন আনন্দে ভরে উঠেছিলো।

স্কুলের গান

রোজ স্কুলে কত যে নতুন নতুন মজা হতো! তোত্তো-চান তাই অপেক্ষা করে থাকতো, কখন সকাল হবে, কখন স্কুলে যাবে! আর ফিরে এসেও রকি, মা আর বাবাকে সব গল্প বলতে হতো—সারাটাদিন ধরে কত কী হলো, কত সব মজা, দারুণ দারুণ নতুন ঘটনা। শেষে মা বলতেন 'আজ আর না সোনা। এখন একটু কথা বন্ধ করে খাবারটা খেয়ে নাও।'

নতুন স্কুলের হালচালের সঙ্গে বেশ অভ্যস্ত হয়ে যাবার পরেও ওর গল্প ফুরতো না। ওর এই আনন্দটা দেখে মায়েরও খুব আনন্দ হতো।

একদিন স্কুলে যাবার পথে ট্রেনে হঠাৎ ওর মনে হলো, তোমোই-এর কোনো স্কুলের গান নেই? যেই না ভাবা, অমনি স্কুলে পৌঁছবার জন্য ও ছটফট করতে লাগলো। যদিও আরো দুটো স্টেশনের পরে জিয়ুগায়োকা আসবে তবু ও আগেভাগে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, যাতে ওর স্টেশনে পৌঁছনো মাত্র ও লাফিয়ে কামরা থেকে নেমে পড়তে পারে। জিয়ুগায়োকার আগের স্টেশনে এক মহিলা নামবেন, উনি স্বাভাবিকভাবেই মনে করছিলেন তোত্তো-চানও বুঝি সেখানেই নামবে।

কিন্তু তোত্তো-চান যখন নামলো না, কেবল 'এই-বুঝি-দৌড়-শুরু-হবে'র ভঙ্গীতে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো, তখন মহিলা বিড়বিড় করে বললেন, 'ব্যাপার কী কে জানে?'

ওর স্টেশনে পৌঁছনোমাত্র তোত্তো-চান মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো। অল্পবয়সী কণ্ডাকটরটি যতক্ষণে গাড়ি থেকে এক পা বাইরে ঝুলিয়ে 'জিয়ুগায়োকা, জিয়ুগায়োকা' বলে চেঁচাতে শুরু করলো, এবং যতক্ষণে গাড়িটা পুরোপুরি থামলো, ততক্ষণে তোত্তো-চান স্টেশনের গেটের কোন বাইরে পৌঁছে গেলো।

ওদের রেলগাড়ি ক্লাসরুমে ঢুকে তোত্তো-চান দেখলো যে তাইজি ইয়ামানৌচি এসে গেছে। তখন ও ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'তাই-চান, আমাদের স্কুলের কোনো গান নেই?'

তাই-চান খুব বিজ্ঞান পড়তে ভালবাসতো। একটু চুপ করে থাকার পর ও বললো, 'মনে তো হয় না।'

'নেই?' তোত্তো-চান যেন ভাবনায় পড়ে গেলো। 'আমার মনে হয় স্কুলের একটা গান থাকা উচিত। আমার আগের স্কুলের একটা চমৎকার গান ছিলো।' বলেই ও গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করলো :

সেনজুকো দিঘিতে অগভীর জল
(তবু) জ্ঞানের সাগর আছে মোদের অতল...

তোত্তো-চান আগের স্কুলটাতে বেশিদিন যায়নি, আর গানের কথাগুলোও বেশ শক্ত শক্ত ছিল, তবু ওর দিব্বি মনে ছিলো সবটা, অন্তত ওই অংশটা তো বটেই! মনে হলো তাই-চানের যেন গানটা বেশ মনে ধরেছে। ইতিমধ্যে স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েরাও এসে পড়েছিলো, আর সবাই তোত্তো-চানের কঠিন কঠিন শব্দগুলো শুনে মুগ্ধ হচ্ছিলো। 'চল আমরা হেডমাস্টারমশাইকে বলি স্কুলের একটা গান লিখতে!' তোত্তো-চান বললো।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চল চল,' বলে সবাই হেডমাস্টারমশাইয়ের অফিসের দিকে রওনা দিলো। তোত্তো-চানের পুরনো স্কুলের গানটা শুনে আর বাচ্চাদের আবদার মেনে নিয়ে হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'ঠিক আছে, কাল সকালের মধ্যে ঠিক স্কুলের একটা গান তৈরি হয়ে যাবে!'

'ঠিক তো?' সবাই মিলে বলে উঠলো। তারপর সার বেঁধে অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

পরদিন সকালে প্রতি ক্লাসে খবর পাঠানো হলো, ছেলেমেয়েরা যেন মাঠে এসে জড়ো হয়। তোত্তো-চান বেশ উত্তেজিত। বাকিদের সঙ্গে ও-ও অপেক্ষা করতে লাগলো। একটা ব্ল্যাকবোর্ড বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'তোমাদের তোমোই-এর জন্য একটা গান তৈরি হয়েছে।' বলে স্বরলিপির পাঁচটা সমান্তরাল রেখা টেনে উনি লিখলেন।



তারপর সঙ্গীত পরিচালকের মত ভঙ্গী করে বললেন, 'চলো সবাই মিলে গানটা গাওয়া যাক।' হেডমাস্টারমশাই তাল দিয়ে গানটা শুরু করলেন, আর স্কুলের সবাই গলা মেলালো: 'তো-মো-ই, তো-মো-ই, তো—মো—ই!'

'ব্যাস?' খানিক চুপ করে থেকে তোত্তো-চান জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ, ব্যাস।' হেডমাস্টারমশাই বেশ গর্বের সঙ্গে উত্তর দিলেন।

'আর একটু ভালো ভালো শব্দ থাকলে বেশি ভালো হতো,' তোত্তো-চান খুব হতাশ গলায় বললো। 'যেমন, 'সেজুকো দিঘিতে অগভীর জল...'

'তোমাদের ভালো লাগেনি?' হেডমাস্টারমশাইয়ের মুখটা একটু লাল হয়ে গিয়েছিলো। উনি তবু হেসে হেসেই কথা বলছিলেন। 'আমি তো ভাবলাম বেশ ভালোই হয়েছে।'

কিন্তু গানটা কারোই আসলে পছন্দ হয়নি। মাত্র একটা লাইন, তাও কোনো ভালো শব্দ নেই, এর চেয়ে বরং স্কুলের কোনো গান না থাকাই ভালো ছিলো। হেডমাস্টারমশাই একটু যেন দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু মোটেও রাগ করেননি। উনি ব্ল্যাকবোর্ডটা মুছে ফেললেন। তোত্তো-চানের মনে হলো ওরা হয়তো একটু বেশি কড়া ব্যবহার করে ফেলেছে। কিন্তু কী করা? ওতো ভেবেছিলো এর থেকে ভালো কিছু একটা হবে।

আসল কথাটা হলো, হেডমাস্টারমশাই যে এই স্কুলটাকে আর স্কুলের বাচ্চাদের কতখানি ভালবাসতেন, তা কি সামান্য একটা গান দিয়ে বোঝানো যেতে পারে? কিন্তু ছেলেমেয়েগুলি নেহাত ছোট ছিলো, অতশত বোঝার মতন বড় হয়নি তখনও।

স্কুলের গানের কথাটা ওরা অবশ্য কদিনের মধ্যেই ভুলে গিয়েছিলো। আর হেডমাস্টারমশাই তো বোধহয় কখনো এই ধরনের গানের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনেই করেননি। ফলে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে গানটা মুছে ফেলার পরই গানের ব্যাপারটা চুকে গেলো। তোমোই গাকুয়েনে কখনোই আর কোনো স্কুলের গান লেখা হয়নি।

সবটা আবার ঢুকিয়ে রেখো!

এত কাজ তোত্তো-চান জীবনে কখনো করেনি। ওরে বাব্বা, কী একটা দিন ছিলো সেটা! যেদিন ওর ছোট্ট পয়সার থলেটা বাথরুমের গর্ত দিয়ে নিচে ট্যাঙ্কে পড়ে গিয়েছিলো! ওতে কোনো পয়সা ছিলো না, কিন্তু থলেটা এত সুন্দর ছিল দেখতে!

তোত্তো-চান তো বাথরুমে পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যেতো। লাল-হলুদ-সবুজ খোপ খোপ, তিনকোণা ঢাকনাটার ওপরে একটা কুকুরের ছবি।

আসলে তোত্তো-চানের একটা অদ্ভুত অভ্যেস ছিলো। ও যখন খুব ছোট্ট তখন থেকেই। যখনই ও বাথরুমে যেতো, কাজ কারবার শেষ হবার পর ও গর্তটা দিয়ে একটু উঁকি দিয়ে নিচটা দেখে নিতো। এই করে সেই নার্সারিতে যাবার আগে কত কী-ই যে ওর বাথরুমের গর্ত দিয়ে পড়ে গিয়েছিলো। কত কত টুপি! একবার একটা বেতের টুপি, একবার সাদা লেস দিয়ে তৈরি একটা টুপি। তখনকার দিনে তো বাথরুমে ফ্লাসটাশ হতো না—একটা গর্ত। আর নিচে একটা পুকুরের মত ট্যাঙ্ক। সেইখানে তোত্তো-চানের টুপিগুলো পড়ে, ভেসে বেড়াতো। মা সব সময় ওকে এইভাবে ঝুঁকতে বারণ করতেন।

সেদিন ও স্কুল শুরু হবার আগে একবার বাথরুমে গিয়েছিলো, কিন্তু তখন মায়ের নিষেধটা মনে ছিলো না। হিসির পর ও গর্ত দিয়ে নিচে তাকাতে গেলো। নিশ্চয় ওভাবে তাকাতে গিয়ে ওর হাতের মুঠোটা আলগা হয়ে গিয়েছিলো! আর পয়সার থলেটা অমনি হাত ফসকে একেবারে নিচে পড়ে গেলো। ছলাৎ! তোত্তো-চান চিৎকার করে উঠলো।

কিন্তু মেয়ে তো কাঁদবে না, হালও ছেড়ে দেবে না। হারিয়ে গেছে মানে? স্কুলের দারোয়ানের ঘরের ভিতরে নানান যন্ত্রপাতি রাখা থাকতো; সেই ঘরে ঢুকে ও গাছে জল দেবার লম্বা একটা কাঠের হাতা নিয়ে এলো। হাতাটা ওর চেয়ে দ্বিগুণ বড়। কিন্তু তাতে কি? ওটা টানতে টানতে তোত্তো-চান স্কুলের পিছন দিকে নিয়ে গেলো। গিয়ে খুঁজতে লাগলো, ট্যাঙ্কের ঢাকনাটা কোথায়? ও মনে করেছিলো বাথরুমের পিছনেই হবে বুঝি ট্যাঙ্কটা, কিন্তু অনেক খোঁজার পর অবশেষে ও একটা গোল ম্যানহোলের ঢাকনা খুঁজে পেলো, বাথরুম থেকে এক গজ মত দূরে। ঢাকনাটা খুব কষ্ট করে সরিয়ে ও নিচে তাকিয়ে দেখলো, যা খুঁজছিলো তাই! মাথাটা নিচে নামিয়ে ও বলে উঠলো, 'এ কি! এ যে দেখছি কুহনবুৎসুর দিঘির মতন বড়!'

তারপর শুরু হলো ওর কর্মযজ্ঞ। ও হাতাটা দিয়ে ট্যাঙ্কের ময়লাপত্র একটু একটু করে তুলতে লাগলো। যে জায়গায় থলেটা পড়ে গিয়েছিলো বলে মনে হচ্ছিলো, সেখান থেকেই ও তোলাতুলির কাজটা শুরু করলো, কিন্তু ট্যাঙ্কটা ছিলো বেশ বড় আর গভীর—ওতে তিনটে বাথরুম থেকে ময়লা এসে পড়েছিলো। তার ওপর বেশি ঝুঁকলে ও নিজেই নিচে পড়ে যেতে পারে। ফলে, বেশি ঘাঁটাঘাটি না করে হাতায় যা উঠছিলো, তাই-ই ও তুলে তুলে ফেলতে থাকলো আর নোংরাগুলো গর্তের সামনে জমা করতে থাকলো। দেখা যাক থলেটা পাওয়া যায় কিনা।

প্রত্যেকবার হাতাটা তুলে ও ভালো করে দেখে নিচ্ছিলো থলেটা উঠেছে কি না।

ও ভেবেছিলো সহজেই বুঝি থলেটা উঠে আসবে, কিন্তু কোথায় থলে? গেলো কোথায়? ইতিমধ্যে স্কুল শুরুর ঘণ্টা পড়ে গেলো।

এবার ও কী করবে? এত দূর যখন করেছে, তখন শেষ পর্যন্ত তো দেখতেই হবে। ও নতুন উদ্যমে হাতাটা দিয়ে কাজ করতে থাকলো। সামনে নোংরার বেশ একটা স্তূপ জমা হয়ে গিয়েছিলো। ঠিক তখনই হেডমাস্টারমশাই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

'কি করছো তুমি?' উনি তোত্তো-চানকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার পয়সার থলেটা পড়ে গেছে,' তোত্তো-চান কাজ করতে করতে উত্তর দিলো।

'ও, তাই?' উনি অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হাত দুটো পিছনে রেখে হেঁটে চলে গেলেন। অনেকটা সময় চলে গেলো, কিন্তু থলে তো উঠলো না। ময়লার স্তূপটা বেশ উঁচু হয়ে উঠেছিলো আর চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো। হেডমাস্টারমশাই আবার ফিরে এলেন। 'পেয়েছো?' উনি জানতে চাইলেন।

নোংরার মধ্যিখানে দাঁড়ানো তোত্তো-চানের শরীরটা তখন ঘামে ভিজে গেছে। আর মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। 'না,' ও উত্তর দিলো।

হেডমাস্টারমশাই একটু কাছে এসে ওকে সুন্দর করে বললেন, 'তোমার খোঁজা হয়ে গেলে এই সব যা বের করেছো, ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে তো, তাই না?' এইটুকু বলে উনি ফের হেঁটে চলে গেলেন।

হাসিখুসি গলায় 'হ্যাঁ' বলে তোত্তো-চান কাজ করতে লাগলো। হঠাৎ ময়লার স্তূপটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো, 'নোংরাগুলো না হয় ঢুকিয়ে রাখলাম, কিন্তু যে জলটা তুলেছি সেটা ঢোকাবো কেমন করে? জলটাতো খুব দ্রুত মাটিতে মিলিয়ে যাচ্ছিলো, তাই তোত্তো-চান কাজ থামিয়ে ভাবতে বসলো কেমন করে জলটাকে ট্যাঙ্কে ফেরৎ পাঠাবে। হেডমাস্টারমশাইকে যে কথা দিয়েছে সবটা আবার ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে রাখবে? ও ঠিক করলো কিছুটা ভেজা মাটিও ভেতরে পাঠিয়ে দেবে বরং।

নোংরার বেশ একটা পাহাড় জমে উঠলো আর ট্যাঙ্কটাও প্রায় ফাঁকা হয়ে গেলো, তবু থলের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। হয়তো ট্যাঙ্কের কাণার সঙ্গে আটকে গিয়েছিলো বা একেবারে তলায় চলে গিয়েছিলো। তোত্তো-চান আর মন খারাপ করলো না। ও তো সাধ্যমতন চেষ্টা করেছে। অবশ্য, সেদিন ওর মন খারাপ না করার পিছনে নিশ্চয় হেডমাস্টারমশাইয়ের ব্যবহারও অনেকখানি কাজ করেছিলো। তিনি যে ওকে একটুও বকেননি, বরং ওর কাজের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিলেন, এতে নিশ্চয় তোত্তো-চানের মনেও নিজের সম্পর্কে বেশ একটা আস্থা তৈরি হয়েছিলো। তবে এত কিছু সচেতনভাবে বোঝার মতন বড় ও তখনো হয়নি।

বেশির ভাগ বড়রাই তোত্তো-চানকে এই রকম একটা কাজ করতে দেখলে আঁতকে উঠতেন। হয় তাঁরা বলতেন, 'করছো কি? পাগল হয়েছো?' কিংবা, এক্ষুনি

থামাও, কী ভয়ানক বিপজ্জনক কাজ করছো তুমি!' নিদেনপক্ষে ওকে সাহায্য করতে চাইতেন। কিন্তু তার বদলে হেডমাস্টারমশাই কেবল বলেছিলেন, 'তোমার কাজ হয়ে গেলে সবটা আবার ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দেবে তো, তাই না?' ভাবো একবার! মা পরে এই কথাটা শুনে মনে মনে ভাবছিলেন, কী চমৎকার মানুষ ওদের হেডমাস্টারমশাই!

এই ঘটনার পর তোত্তো-চান আর কোনো দিন বাথরুমের গর্ত দিয়ে নিচের দিকে তাকায়নি। সেদিন ওর মনে হয়েছিলো, হেডমাস্টারমশাইকে সব কিছু বলা যায়, মনের সব কথা। তখন ওঁকে আরও যেন ভালো লেগেছিল।

তোত্তো-চান যেমন কথা দিয়েছিলো তেমনি সব নোংরা ফের ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। বের করাটা খুবই কঠিন কাজ ছিলো, ঢুকিয়ে দিতে অনেক কম সময় লাগলো। একটু ভেজা মাটিও ও ট্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। তারপর মাটিটা সমান করে, ম্যানহোলের ঢাকনাটা ঠিকমতন বসিয়ে দিয়ে, দারোয়ানের ঘরে গিয়ে লম্বা হাতটা রেখে দিয়ে এলো।

সেই রাতে ঘুমোতে যাবার সময় তোত্তো-চানের অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া পয়সার সুন্দর থলেটার কথা মনে পড়ছিলো। ওটা হারিয়ে যাওয়াতে ওর মনটা একটু খারাপ হয়েছিলো, কিন্তু সারাটাদিনের পরিশ্রমের পর এতই ক্লান্ত ছিলো যে খানিক বাদেই ও গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো।

বাইরে, তোত্তো-চানের সেই কাজের জায়গাটাতে, ভেজা মাটির উপরে তখন চাঁদের আলো। সব কিছু ভারি সুন্দর চকচকে দেখাচ্ছিলো। আর মাটির তলায় কোথাও, অন্ধকারের ভিতরে, ওর পয়সার থলেটাও চুপটি করে পড়েছিলো।

তোত্তো-চানের নাম

তোত্তো-চানের ভালো নাম তেত্সুকো। ওর জন্মের আগে মা আর বাবার বন্ধুরা আর আত্মীয়রা সবাই বলেছিলেন, নিশ্চয় ছেলে হবে। মা বাবারও প্রথম সন্তান, ওরা তাই কথাটা বিশ্বাস করেছিলেন। আর, মনে মনে ঠিক করেছিলেন ছেলের নাম হবে তোরু। কিন্তু ছেলের বদলে মেয়ে হল যখন, ওঁদের মনটা তখন একটু খারাপ হয়ে গেলো। দুজনেরই চীনা অক্ষরে লেখা 'তোরু' শব্দটা ভারি পছন্দ ছিলো ('তোরু' মানে স্বচ্ছ এবং সুদূরপ্রসারী কিছু, যেমন কণ্ঠস্বর), তাই ওঁরা ঠিক করলেন ওই অক্ষরটা দিয়েই একটা মেয়ের নাম তৈরি করতে হবে। তখন তোরু হয়ে গেল 'তেত্সু', আর যেহেতু মেয়ে, তাই নামের শেষে একটা 'কো' জুড়ে দেয়া হলো।

সবাই ওকে তেত্সুকো-চান নামেই ডাকতো ('চান' হলো নামের শেষে ব্যবহৃত 'সান' শব্দের পরিচিত রূপ), কিন্তু তোত্তো-চানের কানে কিছুতেই শব্দটা তেত্সুকো-চান মনে হচ্ছিলো না। যখনই কেউ ওর নাম জিজ্ঞেস করতো ও বলতো 'তোত্তো-চান'। ওর ধারণা হয়েছিলো 'চান'টাও বুঝি ওর নামেরই অংশ।

বাবা ওকে মাঝে মাঝে তত্স্কি বলে ডাকতেন, যেন ও একটা ছেলে। বাবা বলতেন, 'তত্স্কি, আয় তো দুজনে মিলে গোলাপ গাছ থেকে পোকাগুলো তাড়াই।' বাবা আর রকি ছাড়া সবাই ওকে তোত্তো-চান বলে ডাকতো। স্কুলের বই খাতায় তেত্সুকো লিখলেও ও মনে করতো ওর আসল নাম তোত্তো-চান।

রেডিওতে হাসির নাটক

গতকাল তোত্তো-চানের খুব মন খারাপ হয়েছিলো। মা বলেছিলেন, 'তুমি আর রেডিওতে হাসির নাটক শুনতে পারবে না।'

তোত্তো-চানের ছেলেবেলায় রেডিওগুলো ভারি সুন্দর হতো দেখতে—কাঠ দিয়ে তৈরি, মাথাটা একটু গোলচে, বড় একটা বাক্সের মতন। সামনের যে জায়গাটা থেকে আওয়াজ বেরুতো সেটা থাকতো গোলাপি সিল্কের কাপড়ে মোড়া, তার ওপর সুন্দর নক্সা কাটা। আর কাঁটা ঘোরানোর জন্য দুটো বড়, গোল নব্ থাকতো।

স্কুলে যেতে শুরু করার আগে থেকেই তোত্তো-চানের 'রাকুগো' হাসির নাটক শুনতে খুব ভাল লাগতো। ও গোলাপি পর্দার গায়ে কান লাগিয়ে মজার মজার কথাগুলো শুনতো, আর খুব হাসতো। মা এর আগে 'রাকুগো' শোনার ব্যাপারে কখনো আপত্তি করেননি, গতকালই প্রথম করলেন। গতকাল আসলে বাবার অর্কেস্ট্রার বন্ধুরা এসেছিলেন, ওদের বাইরের ঘরে বসে বাজনা প্র্যাকটিস করবার জন্য। চেলো বাজান যিনি, তিনি তোত্তো-চানের জন্য অনেকগুলো কলা উপহার নিয়ে এসেছিলেন। মা ওকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখো, তোমার জন্য সুনেসাদা তাচিবানা কী নিয়ে এসেছেন।' তোত্তো-চান তো ভারি খুশি!' ও মাথা নিচু করে ধন্যবাদ জানানোর পর হঠাৎ মাকে বলে উঠলো, 'কেয়া বাত'! এতো দেখছি জবর ব্যাপার।' ব্যাস, সেই থেকেই নিষেধাজ্ঞা জারি হলো।

তারপর থেকে তোত্তো-চান লুকিয়ে লুকিয়ে হাসির নাটক শুনতো, মা বাবা যখন বাড়িতে থাকতেন না তখন। খুব মজার কিছু শুনলে, ও খুব জোরে জোরে হাসতো। বড়রা কেউ ওকে সে সময় দেখলে হয়তো ভাবতেন, এত সব শক্ত শক্ত কথা ও বোঝে কেমন করে? কিন্তু আসলে ছোটদেরও নিজস্ব একটা কৌতুকবোধ থাকে। যতই ছোট হোক না কেন, খুব মজার কোনো কথা ওরা দিব্যি উপভোগ করতে পারে।

রেলগাড়ির নতুন কামরা

দুপুরে খাবার সময় মিয়ো-চান খবরটা দিলো। 'জানিস, আজ রাতে একটা নতুন রেলের কামরা আসছে।' মিয়ো-চান হেডমাস্টারমশাই-এর তিন নম্বর মেয়ে, তোত্তো-চানের ক্লাসেই পড়ে।

এমনিতে ওদের ছ'টা রেলের কামরা ছিলো, মাঠের ওপর পর পর সার দিয়ে দাঁড়

করানো। প্রতিটাতে একটা করে ক্লাসঘর। নতুনটাতে একটা নাকি লাইব্রেরি করা হবে। সে কথা শুনে সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

'কোন দিক দিয়ে কামরাটা আসবে, কে জানে?' একজন বললো। প্রশ্নটা শুনে সবাই জোর ভাবতে লাগলো।

'হয়তো ওইমাচি লাইন ধরে আসবে, তারপর লেভেল ক্রসিং থেকে এদিকে চলে আসবে,' একজন বললো।

'তাহলে তো কামরাটাকে লাইন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।' আর একজন বলে উঠলো।

'হয়তো ঠেলাগাড়িতে করে আনা হবে।' আরো একজনের মনে হলো।



'কি করে? এত বড় ঠেলাগাড়ি হয় নাকি?' আর কেউ প্রতিবাদ করে উঠলো।

'তা বোধহয় হয় না...'

কারো মাথাতেই আর কিছু আসছিলো না। ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারছিলো ঠেলাগাড়িতে না, ট্রাকের মাথায়ও না—কামরাটা কোনোটাতেই আঁটবে না। অনেক ভেবে তোত্তো-চান বললো, 'আমার মনে হয় ওরা স্কুল পর্যন্ত রেললাইন পেতে দেবে।'

'কোত্থেকে?' একজন জানতে চাইলো।

'কোত্থেকে? এখন ট্রেনটা যেখানে আছে, সেখান থেকে।' তোত্তো-চান নিজেই বুঝতে পারছিলো যে ও ঠিক বলছে না। ট্রেনটা কোত্থেকে আসছে সে বিষয়ে তো ওর কোনই ধারণা ছিলো না; তাছাড়া ওরা নিশ্চয় ঘরবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে, রেললাইন পেতে, তারপর গাড়িটাকে নিয়ে আসবে না।

অনেক আগডুম বাগডুম আলোচনার পর ছেলেমেয়েরা ঠিক করলো আজ ওরা তাহলে আর বাড়িতেই যাবে না। স্কুলে থেকে ট্রেনের কামরার আসাটা দেখবে। ঠিক হলো, মিয়ো-চান গিয়ে ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করবে যে ওরা থাকতে পারে কি না। বেশ খানিকক্ষণ পর মিয়ো-চান ফিরে এলো।

'কামরাটা অনেক রাতে আসবে।' মিয়ো-চান বললো। 'আর যখন কোনো ট্রেন চলবে না, তখন। কেউ যদি সত্যিই দেখতে চাও, তাহলে এখনই বাড়ি গিয়ে মা বাবার কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়ে এসো। যারা কামরাটা দেখতে চায়, রাতের খাবারের পর তারা তাদের ঘুমের পোশাক আর একটা করে কম্বল নিয়ে স্কুলে চলে আসবে।'

'কী মজা!' ছেলেমেয়েদের আগে কখনো এত উত্তেজনা হয়নি।

'ঘুমের পোশাক আনতে হবে?'

'আর কম্বল?'

সেদিন দুপুরবেলায় কারো তো আর পড়ায় মন বসে না। স্কুল ছুটি হওয়া মাত্র তোত্তো-চানের ক্লাসের সবাই সোজা বাড়ি চলে গেলো। সবার মনে একই আশা, রাতের ঘুমের পোশাক আর কম্বল সমেত আবার স্কুলে দেখা হবে।

বাড়ি ফিরেই তোত্তো-চান মাকে বললো, 'একটা ট্রেন আসছে। কেমন করে আসছে কেউ জানে না। ঘুমের পোশাক আর কম্বল চাই। আমি যেতে পারি তো?' এমন বর্ণনা থেকে মা আর কী বুঝবেন? মেয়ের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই ঠাউর করতে পারলেন না, কেবল মেয়ের সাংঘাতিক তৎপরতা দেখে অনুমান করলেন যে বিশেষ কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তখন মা তোত্তো-চানকে নানান প্রশ্ন করতে থাকলেন এবং অবশেষে বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী। শুনে মায়ের মনে হলো তোত্তো-চানের নিশ্চয় এটা দেখা উচিত, কারণ এমন সুযোগ তো আর বার বার আসবে না। মায়ের তো নিজেরই কামরাটা দেখতে ইচ্ছে করছিলো!

তোত্তো-চানের ঘুমনোর পাজামা আর কম্বল নিয়ে, রাতের খাবারের পর মা ওকে স্কুলে পৌঁছে দিতে গেলেন। মোট দশজন মত জড়ো হয়েছিলো স্কুলে। তাদের মধ্যে কয়েকজন উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েও ছিলো, যারা কামরা আসার খবরটা জেনে গিয়েছিলো। আরো কয়েকজনের মাও এসেছিলেন। আর তাঁদের সকলকে দেখেই মনে হচ্ছিলো যেন রাতটা স্কুলে থেকে যাবার খুব ইচ্ছে। কী আর করা? হেডমাস্টারমশাইয়ের হাতে ছেলেমেয়েদের রেখে তাঁরা যে যাঁর বাড়ি চলে গেলেন।

ছেলেমেয়েরা সবাই কম্বল মুড়ি দিয়ে হলঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লো। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'গাড়ি এলে আমি তোমাদের ডেকে দেবো।' ওরা ভেবেছিলো, ওদের বুঝি ঘুমই আসবে না, কিন্তু সারাদিনের উত্তেজনা আর ক্লান্তির পর চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠেছিলো। 'আমাকে কিন্তু ডাকতে ভুলিস না,' অন্যদের এই কথাটা বলার আগেই সবাই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো।

'এসেছে এসেছে!' চিৎকার শুনে তোত্তো-চান তড়াক করে উঠে সোজা স্কুলের মাঠ পেরিয়ে বাইরের গেটে গিয়ে দাঁড়ালো। ভোরের কুয়াশার চাদরের আড়ালে একটা মস্ত রেলগাড়ির কামরার ছায়া দেখা যাচ্ছিলো। ঠিক যেন স্বপ্নের মতন—রাস্তা বরাবর একটা রেলগাড়ি, এগিয়ে আসছে, নিচে কোনো রেললাইন পাতা নেই, কোনো কু-ঝিক-ঝিক শব্দও নেই। একটা মস্ত ট্রেলারের ওপরে চেপে আসছিলো কামরাটা, আর ট্রেলারটাকে আবার টেনে আনছিলো ওইমাচি রেলডিপোর একটা ট্র্যাক্টর। সেই রাতে তোত্তো-চান আর ওর বন্ধুরা অনেক অনেক নতুন কিছু শিখেছিলো—কেমন ট্র্যাক্টর নামের একটা গাড়ি ট্রেলার নামের মস্ত গাড়িটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে; কেমন ট্রেলার জিনিসটা ঠেলাগাড়ির চেয়ে অনেক অনেক বড় হয়। এই সব দেখে ওরা তো দারুণ মুগ্ধ!

ভোরের আলোর ভিতর দিয়ে ট্রেলারে চেপে, রেলের কামরাটা মৃদু মন্থর গতিতে এগিয়ে আসতে লাগলো। পথটা তখন একদম ফাঁকা ছিলো।

এরপরই একটা বিশাল হৈচৈ শুরু হয়ে গেলো। তখন এখনকার মতন মস্ত ক্রেন পাওয়া যেতো না, তাই কামরাটাকে ট্রেলার থেকে নামানো ছিলো দুরূহ কাজ। তাকে নামিয়ে স্কুলের মাঠের ঠিক জায়গা মতন বসাতে হবে। যারা গাড়িটার সঙ্গে এসেছিলো, তারা ট্রেলারের নিচে কাঠের পাত দিয়ে একটা দিক উঁচু করার চেষ্টা করলো, যাতে করে কামরাটা গড়িয়ে নামতে পারে মাঠের ওপরে।

'এটা খুব ভালো করে দ্যাখো,' হেডমাস্টারমশাই বললেন। 'এগুলোকে বলে রোলার। কোনো জিনিস যখন গড়িয়ে গড়িয়ে নামে তখন তার পিছনে বিশেষ শক্তি কাজ করে। সেই শক্তি দিয়েই মস্ত কামরাটাকে নামানো হচ্ছে।'

ছেলেমেয়েরা খুব মন দিয়ে গোটা ঘটনাটা দেখতে লাগলো। 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো,' বলে ওরা গাড়িটাকে নামাচ্ছিলো, আর সেই হেঁইয়োর তালে তালেই সুর্যোদয় হচ্ছিলো

যেন। স্কুলের বাকি ছ'টা কামরার মতন নতুনটার তলা থেকেও চাকাগুলো খুলে নেওয়া হয়েছিলো। তার দূর দূরান্তে ছুটে চলার দিন শেষ হয়ে গিয়েছিলো, এখন কাজ শুধু ছেলেমেয়েদের হাসি বয়ে বেড়ানো।

ঘুমের পোশাক পরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর ভোরের আলো এসে পড়েছিলো—আনন্দে ওরা স্থির থাকতে পারছিলো না, কেবল হাসছিলো, লাফিয়ে লাফিয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের গলা থেকে ঝুলে পড়ছিলো। হেডমাস্টারমশাইও হাসিমুখে ওদের অত্যাচার সহ্য করছিলেন। সবার মুখে অপূর্ব একটা হাসি লেগেছিলো।

এই দিনটার কথা কেউ কখনো ভুলতে পারেনি।

সাঁতার

সেই দিনটার কথা তোত্তো-চানের সব সময় মনে থাকবে। যেদিনটা প্রথম ও সুইমিং পুলে সাঁতার কেটেছিলো। তাও আবার গায়ে একটাও কিচ্ছু না পরে, এমন কি ইজেরও না।

সকালবেলায় হেডমাস্টারমশাই এসে বললেন, 'হঠাৎ খুব গরম পড়ে গেছে। ভাবছি, আজ পুলটাতে জল ভরলে হয়।'

'কী মজা!' বলে ছোটরা সব লাফালাফি শুরু করে দিলো। মনে হচ্ছিলো তোত্তো-চানের উৎসাহ যেন উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের চেয়েও বেশি।

তোমোই-এর সুইমিং পুলটা আবার একটু অন্যরকমের, সাধারণ চারকোণা নয়, নৌকোর মতো অনেকটা। স্কুল চত্বরের সঙ্গে মিলিয়েই হয়তো এমন একটা পুল তৈরি করা হয়েছিলো। সুইমিং পুলটা ছিল ক্লাসঘর আর হলের মধ্যিখানে।

সারা সকাল ধরে তোত্তো-চান আর ওর বন্ধুরা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে জানলা দিয়ে বাইরে পুলটার দিকে একটু করে তাকিয়ে নিচ্ছিলো। যখন খালি ছিলো তখন পুলে কত শুকনো পাতা জমে ছিলো, যেমন স্কুলের মাঠে থাকে, কিন্তু এখন পরিষ্কার জল ভরার পর দিব্যি পুল পুল লাগছিলো।

দুপুরের খাওয়ার শেষে বাচ্চারা সব পুলের ধারে গিয়ে জড়ো হলো। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'প্রথমে আমরা একটু ব্যায়াম করে নেবো, তারপর সাঁতার কাটবো, ঠিক আছে?'

তোত্তো-চান ভাবছিলো, সাঁতার কাটার পোশাক? ওর স্যুইমিং স্যুট? বাবা মার সঙ্গে যখন ও কামাকুরাতে গেছে তখন তো স্যুইমিং স্যুট, রাবারের রিং, আরো কত কী সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে গেছে! ওর ঠিক মনে পড়ছিলো না, গতকাল ওদের দিদিমণি বলেছিলেন কি স্যুইমিং স্যুট আনার কথা?

না। হেডমাস্টারমশাই কেমন করে যেন ওর মনের কথাটা জেনে গিয়েছিলেন। উনি বললেন, 'স্যুইমিং স্যুটের জন্য ভাবনা নেই। হলঘরে গিয়ে দ্যাখো!'

তোত্তো-চান আর ক্লাস ওয়ানের অন্য বাচ্চারা হলে ঢুকে দ্যাখে বড় ক্লাসের ছেলেমেয়েরা সবাই মহা আনন্দে জামা কাপড় খুলতে ব্যস্ত, যেন সবাই কোনো স্নানঘরে যাবে। তারা সব গায়ে কিচ্ছুটি না দিয়ে মাঠের দিকে ছুট লাগাচ্ছিলো। তোত্তো-চান আর ওর বন্ধুরাও তাই করলো। হলের উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে পেলো, বাকিরা ততক্ষণে ব্যায়াম শুরু করে দিয়েছে। তোত্তো-চান আর ওর বন্ধুরাও একছুটে খালি গায়ে হলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

সাঁতার শেখাতে এসেছিলো মিয়ো-চানের দাদা, হেডমাস্টারমশাইয়ের বড় ছেলে। ও তোমোইতে পড়াতো না, তবে ইউনিভার্সিটির সাঁতারের টিমে ছিলো। স্কুলের নাম আর ওর নাম দুটো এক—'তোমোই'। তোমোই সাঁতারের ছোট প্যাণ্ট পরে অপেক্ষা করছিলো।

ব্যায়াম শেষে বাচ্চাদের গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতেই সব চিৎকার করে উঠলো আর ঝপাঝপ পুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তোত্তো-চান প্রথমটায় জলে নামতে চায়নি; ও পরখ করে নিচ্ছিলো পুলটার মধ্যে দাঁড়ানো যায় কিনা। জলটা কি স্নানঘরের মত গরম ছিলো না, কিন্তু দারুণ আরামের ছিলো। যে দিকেই হাত বাড়াও, কেবল জল আর জল। রোগা বাচ্চা, মোটা বাচ্চা, ছেলে, মেয়ে সবাই জলের মধ্যে ছপাৎ ছপাৎ করছে, হাসছে আর এ ওকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কী যে মজা! তোত্তো-চান ভাবছিলো, আহা রে, রকিটা যদি স্কুলে আসতে পারতো! যদি রকি জানতো যে সাঁতার কাটতে স্যুইমিং স্যুট লাগবে না, তাহলে ও নির্ঘাত জলে নেমে পড়তো—তোত্তো-চান মনে মনে তাই ভাবলো।

তোমরা হয়তো ভাবছো, হেডমাস্টারমশাই এইভাবে ছেলেমেয়েদের সব জামাকাপড় খুলে সাঁতার কাটার কথা ভেবেছিলেন কেন? আসলে সবাইকে যে সব জামাকাপড় খুলতেই হবে, এমন কোনো নিয়মও কিন্তু ছিলো না। ধরো, তুমি যদি তোমার স্যুইমিং স্যুটটা স্কুলে নিয়ে আসতে এবং সেটা পরতে চাইতে, তাহলে অবশ্যই সেটা পরে জলে নামতে পারতে। অন্যদিকে, হঠাৎ একদিন যদি ইচ্ছে হতো যে সবাই মিলে সাঁতার কাটি, যেমন আজকের এই দিনটিতে হয়েছিলো, তাহলেও সেটা করা যেতো। গায়ে কোনো কিছু না পরে কেন? কারণ হেডমাস্টারমশাই মনে করতেন ছেলেমেয়েদের নিজেদের শরীরের পার্থক্য নিয়ে এত বেশি কৌতূহলের কোনো মানে হয় না। এটা তো একটা সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার, তাই নিয়ে এত লুকোচুরির কী আছে?

হেডমাস্টারমশাই ছেলেমেয়েদের বোঝাতে চাইতেন যে আসলে সমস্ত শরীরই সুন্দর। তোমোইতে কত রকমের বাচ্চা আসতো, ইয়াসুকি-চানের মতন কেউ, যার পোলিও ছিল, অথবা অন্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা, কিম্বা কেউ হয়তো খুবই ছোটোখাটো—হেডমাস্টারমশাই চাইতেন যে ওদের নিজেদের শরীর নিয়ে কোনো দ্বিধা, কোনো লজ্জা যেন না থাকে, ওদের যেন কখনো নিজেদের দুর্বল বা ছোট মনে না

হয়। ফলে যা হতো, প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রথম প্রথম একটু লজ্জা পেতো, কিন্তু ধীরে ধীরে ওদের লজ্জা, দ্বিধা, সব কেটে যেতো, আর ওরাও আনন্দের সঙ্গে এই খেলায় যোগ দিতে পারতো।

ছেলেমেয়েদের মা বাবারা সবাই কিন্তু এই কিচ্ছু না পরে সাঁতার কাটাটা পছন্দ করেননি। কেউ কেউ তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্যুইমিং স্যুট দিয়ে দিতেন। এবং জোর করতেন যেন ওরা স্যুট পরেই সাঁতার কাটে। অবশ্য, তাঁরা তো জানতেন না সেই স্যুইমিং স্যুট প্রায় কখনোই পরা হতো না। তোত্তো-চানের মতন বন্ধুদের দেখে—যারা প্রথম থেকেই কিছু না পরে সাঁতার কাটবে ঠিক করেছিলো—আর যারা স্যুইমিং স্যুট আনতে ভুলে যেতো, তাদের দেখে, এই ছেলেমেয়েরাও ঠিক করেছিলো যে কিছু না পরে সাঁতার কাটতেই মজা বেশি। কেবল বাড়ি ফেরার সময় ওরা খেয়াল করে স্যুইমিং স্যুটগুলো ভিজিয়ে নিয়ে যেতো! তাই তোমোই-এর প্রায় সব বাচ্চাই রোদে পুড়ে, জলে ভিজে খয়েরি হয়ে গিয়েছিলো, স্যুইমিং স্যুটের সাদা রেখা প্রায় কারো শরীরেই দেখা যেতো না।

রিপোর্ট কার্ড

স্টেশনে পৌঁছেই একবারও এদিকে ওদিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ির দিকে ছুট দিলো তোত্তো-চান, পিঠের ওপর কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে। কেউ ওকে সে সময় দেখলে ভাবতো নির্ঘাত সাঙঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। ও তো স্কুলের গেট পেরোনো থেকেই এইভাবে ছুটছে।

বাড়ি পৌঁছে, দরজা খুলে ও জানান দিলো, 'আমি এসে গেছি।' তারপর রকিকে খুঁজতে লাগলো। রকি সামনের চাতালের মেঝেতে পেটটা চেপে ধরে ঠাণ্ডা হচ্ছিলো। তোত্তো-চান কোনো কথা না বলে সোজা রকির পাশে বসে পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে ভিতর থেকে ওর রিপোর্ট কার্ডটা বের করলো। তারপর রিপোর্ট খুলে নম্বরগুলো রকিকে দেখাতে লাগলো।

'দ্যাখ,' খুব গর্বের সঙ্গে বলেলো তোত্তো-চান। 'এ' 'বি', নানান জিনিস লেখা ছিলো ওই কার্ডে। তোত্তো-চান অবশ্য জানতো না 'এ' ভালো, না কি 'বি', অতএব রকি যে আরোই এসব কিছু বুঝতে পারবে না, সে তো জানাই কথা। তবু, জীবনের প্রথম রিপোর্ট কার্ডটা ও রকিকেই প্রথম দেখাতে চেয়েছিলো এবং ও নিশ্চিত ছিলো যে রকিরও তাতে খুব আনন্দ হবে।

কার্ডটা দেখে রকি একটু গন্ধ শুঁকে নিয়ে তোত্তো-চানের মুখের দিকে তাকালো। 'কেমন? খুব দারুণ না?' তোত্তো-চান ওকে জিজ্ঞেস করলো। তারপর বললো, 'খুব শক্ত শক্ত সব কথা লেখা আছে, তুই বোধহয় পড়তে পারবি না!' রকি আর একটু ঘাড় কাত করলো, যেন আবার কার্ডটাকে ভালো করে পড়ছে। তারপর

তোত্তো-চানের হাতটা একটু চেটে দিলো। 'বেশ,' বলে তোত্তো-চান উঠে দাঁড়ালো। 'এবার মাকে দেখাই গিয়ে।'

তোত্তো-চান চলে যাবার পর রকি আবার ঠাণ্ডা মেঝেতে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো। শুধু তোত্তো-চান কেন, যে কোনো কেউই ওর ওই ভঙ্গী দেখলে মনে করতো রকি বুঝি এখনো রিপোর্ট কার্ডের কথাই ভাবছে।

গ্রীষ্মের ছুটি

'আগামী কাল আমরা ক্যাম্প করতে যাবো। সবাই ঘুমের পাজামা আর কম্বল নিয়ে চলে এসো।' হেডমাস্টারমশাই কাগজে কথাটা লিখে সবার হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তোত্তো-চান সেটা নিয়ে গিয়ে মাকে দেখালো। পরদিন থেকে গরমের ছুটির শুরু।

'ক্যাম্প করা মানে কী মা?' তোত্তো-চান জানতে চাইলো।

মাও কথাটা ভাবছিলেন, কিন্তু মুখে বললেন, 'ক্যাম্প করা মানে তো বাইরে তাঁবু পেতে ঘুমোনো, তাই না? তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে আকাশের চাঁদ তারা দেখা যায়। কিন্তু কোথায় তোদের নিয়ে যাবে, ভাবছি। ভাড়ার কথা তো লেখেনি, স্কুলের কাছেই কোথাও যাবি বোধহয়।'

সেদিন রাতে তো তোত্তো-চানের আর কিছুতেই ঘুম আসে না। ক্যাম্পে যাবার ব্যাপারটা বেশ ভয়ের মনে হচ্ছিলো। এমন রোমাঞ্চকর, বুকের ভেতরটা ধুকধুক করছিলো। পরদিন সকালে উঠেই ও জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলো। কিন্তু বিকেলে যখন পিঠের ব্যাগটাতে ঘুমের পোশাক ভরে, ওপরে কম্বলটা রেখে, বাড়ির সবাইকে টা টা বলে স্কুলের দিকে রওনা দিলো, তখন ওর একটু যেন অসহায় লাগছিলো। আর একটু ভয়ও করছিলো।

ছেলেমেয়েরা স্কুলে জড়ো হবার পর হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'সবাই হলঘরে চলে এসো।' সকলে হলে ঢোকার পর উনি ছোট্ট স্টেজটাতে উঠে গেলেন, হাতে একটা শক্তপোক্ত সবুজ রঙের তাঁবু নিয়ে। 'এখন দেখে নাও কেমন করে তাঁবু খাটাতে হয়, ভাল করে দ্যাখো সবাই।' হাতের জিনিসটা মেলে ধরে, দাঁড়গুলোকে একদিকে টেনে এনে, খুঁটিগুলোকে অন্যদিকে সরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটা চমৎকার সবুজ তাঁবু খাটিয়ে ফেললেন উনি। 'চলো এবার তোমরা নিজেদের তাঁবু এই হলঘরে খাটিয়ে ফেলো। আমরা এখানেই ক্যাম্প পাতবো।'

মা মনে করছিলেন ক্যাম্প বুঝি বাইরে কোথাও, খোলা আকাশের নিচে পাতা হবে। যে কেউ হলেই তাই ভাবতো। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই অন্য কথা ভাবছিলেন। হলের ভিতরে বাচ্চারা সব ঠিকঠাক থাকবে, রাতে যদি বৃষ্টি নামে বা একটু ঠাণ্ডা বাড়ে, তাহলেও ওদের কিছু ক্ষতি হবে না।

'ক্যাম্প, ক্যাম্প!' ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করতে করতে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে এক একজন শিক্ষকের সাহায্যে নিজের নিজের তাঁবু খাটিয়ে ফেললো। এক একটা তাঁবুতে তিনজন মতন আঁটবে। তারপর ছেলেমেয়েরা সবাই হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এ ওর তাঁবুতে ঢুকতে বেরুতে লাগলো। তোত্তো-চান তাড়াতাড়ি ওর ঘুমনোর পাজামাটা পরে নিলো। সবার পাজামা পরা হলে হেডমাস্টারমশাই ওদের মধ্যিখানে বসে ওঁর নানা দেশ বিদেশে বেড়ানোর গল্প বলতে লাগলেন। কিছু কিছু ছেলেমেয়ে তাঁবুর ভিতরে শুয়ে পড়ে কেবল মাথাটুকু বের করে গল্প শুনছিলো, কেউ কেউ সোজা হয়ে বসে ছিলো, কেউ কেউ আবার উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলো। হেডমাস্টারমশাই কত সব দেশের গল্প বলছিলেন, অনেক জায়গার নামই ওরা শোনেনি। সেইসব সাগর পারের দেশের ছেলেমেয়েদের কথা শুনতে শুনতে ওদের মনে হচ্ছিলো তারাও যেন ওদের বন্ধু।

একটা ছোট্ট, সামান্য ঘটনা—স্কুলের হলঘরে তাঁবু পেতে শোয়া—এটাই ছেলেমেয়েদের কাছে একটা মস্ত ব্যাপার হয়ে উঠলো। এত আনন্দ, এত সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা ওরা কখনো ভুলতে পারেনি। হেডমাস্টারমশাই সত্যিই জানতেন ছোটদের কেমন করে খুশি করতে হয়।

গল্প শেষে হেডমাস্টারমশাই হলের আলো নিভিয়ে দিলেন আর বাচ্চারা সব যে যার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকে পড়লো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে হা হা-হি হি, ওখান থেকে চুপচাপ ফিস ফিস, আর কোথাও থেকে একটু হুটোপুটির শব্দ ভেসে এলো। তারপর সব চুপচাপ।

চাঁদ, তারা—এই সব ছাড়াই সেদিন ক্যাম্প করেছিলো ওরা। আর সবার খুব, খুউব মজা হয়েছিলো। স্কুলের ওই হলঘরটা একটা খোলা মাঠ হয়ে গিয়েছিলো সেই রাতে; আকাশের নিচে, মিটমিটে তারা আর চাঁদের আলোতে ওদের মুখগুলো যেন চকচক করছিলো।

তোত্তো-চানের অ্যাডভেঞ্চার

স্কুলের হলঘরে তাঁবু খাটানোর দুদিন পরে ঘটনাটা ঘটেছিলো। সেদিন তোত্তো-চান ইয়াসুয়াকি-চানকে ওর গাছে ওঠার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলো, সে কথা দুজনের মা-বাবা কেউই জানতেন না।

তোমোই-তে সবার একটা করে গাছ ছিলো। মানে, স্কুল চত্বরে যে গাছগুলো ছিলো, ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে তার একটা করে দখল করে নিয়েছিলো। সবাই যে যার নিজের গাছে চড়তো। তোত্তো-চানের গাছটা ছিলো বেড়ার কাছে, যে রাস্তাটা কুহনবুৎসুর দিকে চলে গেছে ঠিক তার ধারে। বেশ বড় একটা গাছ, গাছের গাটা পিছল, কিন্তু তুমি যদি একটু কায়দা করে একবার উঠে পড়তে পারো, তাহলে দেখবে মাটি থেকে ছ' ফুট

উঁচুতে একটা ডাল এমনভাবে ভাগ হয়ে গেছে যে তার উপরে চড়লে বেশ একটা দড়ির দোলনায় চেপেছি বলে মনে হবে। সেখানে উঠে তোত্তো-চান প্রায়ই টিফিনের সময় বা ছুটির পরে নিচের লোকজন আর ওপরের আকাশটাকে দেখতো।

ছেলেমেয়েরা মনে করতো গাছগুলো তাদের নিজেদের সম্পত্তি, ফলে কেউ যদি আর কারো গাছে চড়তে চাইতো, তাহলে তাকে গিয়ে বিনীতভাবে বলতে হতো, 'আমি কি একটু ভিতরে আসতে পারি?'

ইয়াসুয়াকি-চানের পোলিওর জন্য পায়ে অসুবিধে ছিলো বলে ওর কোনো নিজস্ব গাছ ছিলো না। সেজন্যেই তোত্তো-চান ওকে ওর গাছে নেমন্তন্ন করেছিলো। এই কথাটা অবশ্য ওরা আর কাউকে বলেনি, কারণ শুনলেই সবাই খুব ঝামেলা করবে, তা ওরা জানতো।

বাড়ি থেকে বেরনোর সময় তোত্তো-চান মা-কে বলেছিলো, ডেনেনচফুতে ইয়াসুয়াকি-চানের বাড়িতে যাচ্ছে। মিছে কথা বলেছিলো বলে ও মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলো না। তাই ও জুতোর ফিতের দিকে তাকিয়ে ছিলো। কিন্তু রকি তো যথারীতি ওর পিছনে পিছনে স্টেশন পর্যন্ত এসেছিলো। তখন ট্রেনে চাপার আগে তোত্তো-চান রকিকে সত্যি কথাটা বলে দিয়েছিলো, 'দ্যাখ, আমি স্কুলে যাচ্ছি ইয়াসুয়াকি-চানকে আমার গাছে চড়ার নেমতন্ন করেছি বলে!'

গলায় টিকিটটা ঝুলিয়ে তোত্তো-চান স্কুলে গিয়ে দেখলো ইয়াসুয়াকি-চান ফুলগাছগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এমনিতে কেউ কোথাও নেই, গ্রীষ্মের ছুটি চলছিলো যে, তাই। ইয়াসুয়াকি-চান তোত্তো-চানের থেকে বয়সে সামান্যই বড় ছিলো, কিন্তু ওর কথা শুনে মনে হতো ও বুঝি অনেকটা বড়।

তোত্তো-চানকে দেখামাত্র ইয়াসুয়াকি-চান তাড়াহুড়ো করে পাটা টেনে টেনে, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এলো। ওরা যে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু একটা করতে চলেছে এটা ভাবতেই তোত্তো-চানের খুব হাসি পেলো। ইয়াসুয়াকি-চানও হি হি করে হাসতে থাকলো। ইয়াসুয়াকি-চানকে নিয়ে তোত্তো-চান ওর গাছের দিকে এগিয়ে গেলো, তারপর ছুট দিলো দারোয়ানের ঘর থেকে একটা মই নিয়ে আসবার জন্য। এ রকমই ও ভেবে রেখেছিলো গত রাত থেকে। মইটা নিয়ে এসে ও গাছের গায়ে এমনভাবে ঠেকিয়ে রাখলো যাতে মইয়ের মাথাটা সেই ভাগ-হওয়া ডালটাকে ছুঁতে পারে। এবার নিজে তরতর করে ওপরে উঠে গিয়ে মইয়ের মাথাটা দুহাত দিয়ে ধরে রেখে ইয়াসুয়াকি-চানকে বলে উঠলো, 'এবারে চলে এসো তুমি। ওঠার চেষ্টা করো!'

ইয়াসুয়াকি-চানের হাতে পায়ে এতই কম জোর ছিলো যে মইয়ের প্রথম ধাপটাও বিনা সাহায্যে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তোত্তো-চান পিছন ফেরে নেমে এলো, এসে ইয়াসুয়াকি-চানকে নিচ থেকে ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু

বেচারা তো নিজেই ছোটখাট রোগা একটা মানুষ, ও কি এতশত পারে? মইটাকেই সোজা করে রাখা যাচ্ছিলো না, ইয়াসুয়াকি-চানকে তো দূরের কথা। ইয়াসুয়াকি-চান মইয়ের প্রথম ধাপ থেকে পা নামিয়ে চুপটি করে, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। এবং এই প্রথম তোত্তো-চান বুঝতে পারলো যে কাজটা যতটা সহজ মনে করেছিলো, ততটা সহজ হবে না। এখন তাহলে কী করবে ও?

ইয়াসুয়াকি-চান ওর গাছে চড়বে, এটাই ছিলো ওর ইচ্ছে। আর ইয়াসুয়াকি-চানও তাই আশা করে ছিলো। তোত্তো-চান ঘুরে গিয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের মুখোমুখি দাঁড়ালো। বেচারা এত মনমরা হয়ে গিয়েছিলো যে তোত্তো-চান গাল ফুলিয়ে, চোখ পিট পিট করে একটা মজার মুখভঙ্গী করে ওকে হাসানোর চেষ্টা করতে লাগলো। তারপর বললো, 'দাঁড়াও, একটা জিনিস করা যাক!' দারোয়ানের ঘরে ছুটে গিয়ে ও একটার পর একটা জিনিস টেনে বের করতে লাগলো, কাজে লাগানোর জন্য কিছু পায় কি না



দেখার জন্য। শেষ পর্যন্ত একটা বাড়ির সিঁড়ির মতন মই পেয়ে গেলো। ওটা এমনিতেই সোজা হয়ে থাকে, কাউকে ধরে থাকতে হয় না।

ওই সিঁড়ি-মইটা ও টেনে নিয়ে এলো গাছের গোড়ায়। নিজের গায়ের জোরে ও নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলো। মইটা সেই দু-ভাগ হওয়া ডালটাকে প্রায় ছুঁতে পারছিলো। বেশ বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব করে ও ইয়াসুয়াকি-চানকে বললো, 'এবার আর ভয় নেই। এটা লকবক করবে না।'

ইয়াসুয়াকি-চান ভয়ে ভয়ে একবার সিঁড়ি-মইটার দিকে তাকালো, একবার তোত্তো-চানের দিকে। তোত্তো-চানের সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিলো। ইয়াসুয়াকি-চান নিজেও খুব ঘামছিলো। ও গাছটার দিকে তাকালো, তারপর মনে মনে খুব শক্ত হয়ে ওর প্রথম পা রাখলো সিঁড়ির প্রথম ধাপে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছতে যে কতক্ষণ লেগেছিলো, তা ওরা দুজনের একজনও বলতে পারবে না। গণগণে সূর্যটা ওদের মাথার ওপর জ্বলছিলো। কিন্তু ওদের সেসব কিছুর দিকেই ভ্রুক্ষেপ ছিলো না। দুজনের মাথাতে তখন একটাই চিন্তা—ইয়াসুয়াকি-চানকে গাছে চড়তেই হবে। তোত্তো-চান নিচ থেকে ওর একটা একটা করে পা, এক ধাপ এক ধাপ করে ওপরের সিঁড়িতে তুলে দিচ্ছিলো, আর নিজের মাথা দিয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের পিছনটা ঠেলে দিচ্ছিলো। অবশেষে ইয়াসুয়াকি-চান মইয়ের মাথায় পৌঁছুলো।

'হুর্‌রে!'

কিন্তু তারপর বাকিটা যেন অসম্ভব মনে হলো। তোত্তো-চান লাফিয়ে দুভাগ হওয়া ডালে চড়ে বসলো। এবার ইয়াসুয়াকি-চানকে মই থেকে ডালে নিয়ে আসবে কেমন করে? সিঁড়ি-মইটাকে আঁকড়ে ধরে ইয়াসুয়াকি-চান তোত্তো-চানের দিকে তাকিয়ে রইলো। তোত্তো-চানের খুব কান্না পাচ্ছিলো। ও যে ভেবেছিলো ইয়াসুয়াকি-চানকে ওর ডালে নিয়ে এসে কত কী দেখাবে! কিন্তু কাঁদলো না ও, কাঁদলে যদি ইয়াসুয়াকি-চানও কেঁদে ফেলে।

তোত্তো-চান হাত বাড়িয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের হাতটা ধরলো। পোলিওতে ওর আঙুলগুলো সব দলা পাকিয়ে গিয়েছিলো। তবু তোত্তো-চানের চেয়ে হাতটা বড় ছিলো, আঙুলগুলোও লম্বা অনেকটা। তোত্তো-চান অনেকক্ষণ হাতটা ধরে রইলো, তারপর বললো, 'তুমি শুয়ে পড়ো আর আমি দেখি তোমাকে টেনে তুলতে পারি কি না।'

বড়রা কেউ যদি এই ভয়ানক বিপজ্জনক দৃশ্যটি দেখতেন—ভাগ হওয়া ডালে তোত্তো-চান দাঁড়িয়ে মইয়ের মাথায় পেটের ওপর ভর দিয়ে শোওয়া ইয়াসুয়াকি-চানকে প্রাণপণ টেনে চলেছে—তাহলে নিশ্চয় চিৎকার করে উঠতেন। কিন্তু ইয়াসুয়াকি-চান তো সমস্ত আস্থা রেখেছিলো তোত্তো-চানের ওপর। আর তার

জন্যে তোত্তো-চান জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলো। ওর ছোট্ট হাতের মুঠোয় ইয়াসুয়াকি-চানের হাত, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। এক এক সময় এক এক টুকরো মেঘ এসে ওদের প্রখর সূর্যের তাপের হাত থেকে রক্ষা করে যাচ্ছিলো। অবশেষে দুজনে গাছের ডালের ওপর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলো। তোত্তো-চান ঘামে ভেজা চুল মুখের ওপর থেকে সরিয়ে মাথা নিচু করে ইয়াসুয়াকি-চানকে আমন্ত্রণ জানালো : 'স্বাগতম!' ইয়াসুয়াকি-চান গাছের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে, লাজুকভাবে হেসে বললো, 'আসতে পারি ভেতরে?' ও তো কখনো এমন দৃশ্য দেখেনি এর আগে। 'গাছে ওঠা ব্যাপারটা তাহলে এইরকম!' বলে ও হাসলো।

দুই বন্ধুতে বেশ অনেকক্ষণ রইলো গাছের ওপরে। বসে বসে ওরা নানান গল্প করলো। 'জানো, আমার দিদি তো আমেরিকায় থাকে, ও বলেছে ওদের নাকি টেলিভিশন বলে একটা জিনিস আছে,' ইয়াসুয়াকি-চান খুব উৎসাহের সঙ্গে বললো। 'ও বলেছে জাপানে যখন টেলিভিশন আসবে তখন আমরা বাড়িতে বসেই সুমো পালোয়ানদের দেখতে পাবো। টেলিভিশন নাকি একটা বাক্সের মতন, আমার দিদি বলেছে।'

ইয়াসুয়াকি-চান, যে কি না একটা মাঠেও ঘুরে বেড়াতে পারে না, তার কাছে এই ঘরে বসে বসে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখতে পাওয়ার মানে যে কী হতে পারে, তা বোঝার মতন বড় তোত্তো-চান হয়নি তখনো। ও কেবল ভাবছিলো, একটা ঘরের ভিতরে একটা বাক্স, তার মধ্যে ইয়া বড় বড় সুমো পালোয়ান—এটা কেমন করে হতে পারে? ব্যাপারটা হলে কিন্তু দারুণ হবে, ও ভাবছিলো। তখনকার দিনে আসলে কেউ টেলিভিশনের কথা জানতো না। ইয়াসুয়াকি-চানই প্রথম তোত্তো-চানকে যন্ত্রটার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলো।

দূরে পাখির গান শোনা যাচ্ছিলো। আর গাছের ডালে বসে দুটি শিশু পরম আনন্দে গল্প করছিলো। ইয়াসুয়াকি-চানের সেই প্রথম গাছে চড়া এবং সে-ই শেষ।

সাহসের পরীক্ষা

'আচ্ছা, বল তো, ভয় করে পচা গন্ধ, খেতে ভালো, কোন জিনিস?' এই ধাঁধাটা ওদের এত পছন্দ ছিলো যে যদিও ওরা সবাই উত্তরটা জানতো, তবু বার বার এই একই ধাঁধা এ ওকে জিজ্ঞেস করতো। তোত্তো-চান আর ওর বন্ধুরা প্রায়ই একজন আর একজনকে বলতো, 'আমাকে একবার, 'ভয় করে, পচা গন্ধ, খেতে ভাল'র ধাঁধাটা জিজ্ঞেস কর না।' উত্তর ছিল, 'একটা দৈত্য, বাথরুমে গিয়ে মিষ্টি খাচ্ছে।'

তোমেই–তে সাহসের পরীক্ষার গল্পটা দিয়েও একটা ধাঁধা তৈরি করা যেতে পারে : 'ভয় করে—চুলকোয়—হাসি পায়, কী বলো তো?'

যে রাতে ওরা হলঘরে ক্যাম্প করেছিলো, সেদিন হেডমাস্টারমশাই বলেছিলেন, 'একদিন রাতে আমরা কুহনবুৎসু মন্দিরে একটা সাহসের পরীক্ষা নেবো। কে কে ভূত

সাজতে চাও হাত তোলো!' জনা সাতেক ছেলে হাত তুলেছিলো।

সাহসের পরীক্ষার দিন বিকেলবেলায় স্কুলের মাঠে ভূত সাজবে যারা তারা বেশ পোশাক-টোশাক নিয়ে হাজির। 'তোরা ভয়ের চোটে মরেই যাবি।' মন্দিরের দিকে যাবার আগে ওরা বাকিদের বলে গেলো।

বাকি প্রায় তিরিশজন ছোট ছোট পাঁচজনের দলে ভাগ হয়ে একে একে কুহনবুৎসুর দিকে রওনা দিলো। কথা ছিলো, ওরা মন্দিরের চত্বরটাতে একবার চক্কর মেরে, গোরস্থানটা ঘুরে নিয়ে, স্কুলে ফিরে আসবে। তবে, হেডমাস্টারমশাই ওদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে যদিও এটা একটা পরীক্ষা, তবু কেউ যদি চায়, সে অনায়াসেই মাঝপথে স্কুলে ফিরে আসতে পারে।

তোত্তো-চান বাড়ি থেকে একটা টর্চ নিয়ে এসেছিলো। মা বলেছিলেন, এটা হারিয়ো না যেন।' কটি ছেলে আবার ভূতদের ধরার জন্য প্রজাপতি ধরার জাল নিয়ে এসেছিলো; কেউ কেউ দড়ি এনেছিলো, ভূতদের বাঁধবে বলে!

হেডমাস্টারমশাই সব কথা বুঝিয়ে বলতে বলতে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো। ওরা 'দশকুড়ি নাড়িভূঁড়ি...' গুণে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেলো। তারপর আনন্দে আর উত্তেজনায় লাফাতে লাফাতে প্রথম দল কুহনবুৎসুর দিকে চললো। শেষে, তোত্তো-চানের দলেরও রওনা হবার সময় এলো।

হেডমাস্টারমশাই বলেছিলেন কুহনবুৎসু পৌঁছবার আগে ওরা কোনো ভূতের দেখা পাবে না, কিন্তু ছেলেমেয়েরা ঠিক তা মানতে পারেনি। তাই ওরা বেশ ভয়ে ভয়ে এগোতে লাগলো। মন্দিরের গেটে পৌঁছে ওরা পাহারারত দেবতাদের মূর্তিগুলি দেখতে পেলো। যদিও আকাশে তখন চাঁদ উঠেছিলো, তবু মন্দিরের চত্বরটা ওদের খুব অন্ধকার লাগছিলো। এমনিতে দিনের আলোতে খুবই সুন্দর, প্রশস্ত মনে হয় মন্দির চত্বরটা, কিন্তু এখন তা নয়, ভয়ের চোটে বাচ্চারা আর যেন নড়তেই পারছিলো না। কখন ভূতেদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কে জানে? একটু গাছের পাতা পড়লেই কেউ একজন 'ওর বাবা রে' বলে চিৎকার করে উঠছিলো। শেষমেষ এমন হলো, যার হাত ধরে হাঁটছে, তাকেই ভূত বলে মনে হতে থাকলো। তোত্তো-চান যে গোরস্থান পর্যন্ত যাবে না, সেটা ঠিকই করে ফেলেছিলো। ওখানেই নিশ্চয় ভূতেরা সব ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাছাড়া, অনেক হয়েছে সাহসের পরীক্ষা, এ বিষয়ে ওর অনেক জানা হয়ে গেছে, অতএব এখন ও ফিরে যেতেই পারে। ওর দলের অন্যরাও একই সময়ে এই একই কথা ভাবছিলো—ভাগ্যিস্ একমাত্র ও-ই এরকম ভাবছিলো না—তাই সবাই মিলে স্কুলের দিকে খুব জোর ছুট দিলো।

স্কুলে ফিরে দেখে, ওদের আগে যে দলগুলো রওনা দিয়েছিলো, সেগুলো ইতিমধ্যে সব ফিরে এসেছে। মনে হলো গোরস্থান পর্যন্ত যাবার সাহস কারোরই ছিলো না।

এমন সময় সাদা চাদরে মাথা ঢাকা একটি ছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে গেট দিয়ে স্কুলের ভিতরে ঢুকলো, সঙ্গে একজন শিক্ষক। সে বেচারা ভূত সেজে একটা কবরের পাশে ঘাপটি মেরে পড়েছিলো কিন্তু কেউই আসছিলো না দেখে ওর ভয় বাড়ছিলো। তখন ও বাইরে বেরিয়ে আসে। একজন মাস্টারমশাই টহল দিতে দিতে ওকে দেখতে পান—বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। উনি তখন ওকে স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

সবাই যখন প্রথম ভূতকে একটু চাঙা করার চেষ্টা করছে তখন ভূত নাম্বার টু'র কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ ঘটলো! সঙ্গে আর একটি ছেলে, সেও কাঁদছে। দ্বিতীয় ভূতও কবরের পাশে অপেক্ষা করছিলো। হঠাৎ অন্য ছেলেটির পায়ের শব্দ শুনে ভূতবাবাজী দৌড়ে বেরিয়ে ভয় দেখাতে যাচ্ছিলো, তখনই লাগল ধাক্কা। দুজনেই ব্যথা আর ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগে। এমনই মজার কাণ্ড যে ছেলেমেয়েরা হেসে কুটিকুটি। ভূতেরাও একই সঙ্গে হাসতে আর কাঁদতে থাকলো। তখনই তোত্তো-চানের এক সহপাঠী, নাম মিগিতা, এলো ফিরে। মিগিতা একটা খবরের কাগজ দিয়ে তৈরি টুপি পরে ভূত সেজেছিলো। মিগতি খুব রাগ করতে লাগলো গোরস্থানে কেউ যায়নি বলে। 'আমি সেই কখন থেকে বসে আছি। আর তোমরা এলেই না।' মশার কামড়ের চোটে ওর সারা হাত-পা খুব চুলকোচ্ছিলো।

'এই, ভূতকে মশা কামড়েছে!' বলে সবাই আবার হাসতে থাকলো!

ক্লাস ফাইভের মাস্টারমশাই মারুইয়ামা স্যার বললেন, 'আমি বরং গিয়ে বাকি ভূতেদের নিয়ে আসি।' কিছু ভূত দিশেহারা হয়ে বড় রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়িয়েছিলো। কিছু আবার ভয় পেয়ে বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলো—সবাইকে জড়ো করে উনি ফিরিয়ে আনলেন।

এরপর তোমোই-তে ছেলেমেয়েরা আর ভূতটুতের ভয় পায়নি কোনোদিন। ভয় পাবে কি? ভূতেরা নিজেরাই তো দেখা গেলো মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যায়'

রিহার্সাল

তোত্তো-চান খুব গম্ভীরভাবে ভারি ভারি পা ফেলে হাঁটছিলো। পাশে পাশে রকিও ওরই মতন ধীরস্থির গতিতে হাঁটছিলো আর থেকে থেকে তোত্তো-চানের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলো। এইভাবে হাঁটার একটাই মানে হতে পারে : ওরা বাইরে থেকে বাবার রিহার্সাল শুনতে যাচ্ছে। এমনিতে তো তোত্তো-চান শান্ত হয়ে হাঁটতে পারে না, হয় ও ছোটে, নয়তো এর বাগানের বেড়ার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে, ওর বেড়ার নিচ দিয়ে হামা দিয়ে এগিয়ে চলে, ছোটার সময় ও এদিক সেদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকে, যেন পথে কী সব পড়ে গেছে'

বাবারা যে হলঘরটায় রিহার্সাল করতেন, ওদের বাড়ি থেকে সেটা ছিলো পাঁচ

মিনিটের হাঁটা পথ। বাবা অর্কেস্ট্রার প্রধান যন্ত্রী, আর প্রধান যন্ত্রীরা সব সময় বেহালা বাজান। একবার তোত্তো-চানকে বাবাদের একটা অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সেখানে ও যে ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়েছিলো তা হলো, অনুষ্ঠানের শেষে, সবাই হাততালি দেবার পর, বাবাদের দলের যিনি পরিচালক ছিলেন, মানে কণ্ডাক্টর, তিনি তাঁর বিশেষ দাঁড়াবার জায়গাটা থেকে নেমে এসে বাবার সঙ্গে হাত মেলালেন। ভদ্রলোক বেশ ঘেমে গিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে হাত মেলানোর পর বাবা উঠে দাঁড়ালেন আর অর্কেস্ট্রার বাকি শিল্পীরাও উঠে দাঁড়ালেন।

'ওরা হাত মেলালো কেন?' তোত্তো-চান ফিস ফিস করে মাকে জিজ্ঞেস করলো।

'বাবা তো ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে জরুরী কাজ করেন, আর কণ্ডাক্টর তো খুব খুশি হয়েছেন ওঁরা ভালো বাজিয়েছেন বলে, তাই বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে উনি দলের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন,' মা ওকে বুঝিয়ে বলেছিলেন।

তোত্তো-চানের এই রিহার্সালটায় যেতে এত ভালো লাগতো কেন জানো? কারণ, স্কুলে যেমন সবাই ছোট, এখানে সবাই বড়, আর সকলে দারুণ দারুণ সব যন্ত্র বাজান। তার উপরে যে ভদ্রলোক অর্কেস্ট্রার কণ্ডাক্টর, মিস্টার রোজেনস্টক, উনি বেশ মজার জাপানী বলেন!

বাবা বলেছিলেন, যোশেফ রোজেনস্টক ইউরোপের খুব বিখ্যাত একজন কণ্ডাক্টর, কিন্তু ওখানে নাকি হিটলার নামে একজন খুব খারাপ লোক ভয়ানক সব কাজ করে বেড়াচ্ছে, তাই মিস্টার রোজেনস্টক গান বাজনা করার জন্য জাপানে পালিয়ে এসেছেন। বাবা খুব শ্রদ্ধা করতেন মিস্টার রোজেনস্টককে। তোত্তো-চান এই সব পৃথিবীর খবর তখন বুঝতে পারতো না। আসলে ঠিক সেই সময়টাতেই হিটলার ইহুদিদের ওপর খুব অত্যাচার শুরু করেছিলো। এমন পরিস্থিতি না হলে রোজেনস্টকের জাপানে আসার প্রশ্নই উঠতো না। উনি এসে জাপানের সঙ্গীত রচয়িতা এবং পরিচালক, কোমচাক ইয়ামাদার হাতে গড়া এই অর্কেস্ট্রাটিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দারুণভাবে গড়ে তুলেছিলেন। এমন একজন আন্তর্জাতিক মানের গুণী শিল্পীর হাতে না পড়লে এটা সম্ভব হতো না। মিস্টার রোজেনস্টক মনে করতেন জাপানের এই অর্কেস্ট্রাটিরও ইউরোপের যে কোনো প্রথম সারির অর্কেস্ট্রার মতন ভালো বাজাতে পারা উচিত। আর সে জন্যেই প্রত্যেকবার রিহার্সালের পর উনি কাঁদতে শুরু করতেন।

'আমি এত চেষ্টা করি আর আপনারা কিছুতেই যেন সাড়া দিতে পারেন না।'

চেলো বাজাতেন হিদেও সাইতো। রোজেনস্টক যখন বিশ্রাম নিতেন তখন উনি অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতেন। এঁদের মধ্যে উনিই সবচেয়ে ভালো জার্মান বলতে পারতেন। 'আমরা তো চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের বাজাবার স্টাইলটা যে এখনো ভালো করে তৈরি হয়নি। আপনি একথা মনে করবেন না যে আমরা ইচ্ছে করে এভাবে বাজাচ্ছি,' উনি রোজেনস্টককে স্বান্ত্বনা দিতেন।

তোত্তো-চান এই সব জটিলতা বুঝতে পারতো না, কিন্তু মাঝে মাঝে ও দেখতো যে মিস্টার রোজেনস্টকের মুখটা এমন লাল হয়ে গেছে যেন এক্ষুণি ধোঁয়া বেরোতে শুরু করবে। আর তখনই উনি জার্মান ভাষায় চিৎকার করতে শুরু করতেন। দুহাতের মধ্যে থুতনিটা গুঁজে রেখে তোত্তো-চান একটা জানলার ওপরে বসে বাইরে থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতো। মিস্টার রোজেনস্টকের ওই অবস্থা দেখে ও তড়াক করে লাফিয়ে নেমে রকির পাশে ঘাপটি মেরে বসে অপেক্ষা করতো কখন আবার বাজনা শুরু হবে, তার জন্য।

কিন্তু সাধারণত মিস্টার রোজেনস্টক খুব সুন্দর করে কথা বলতেন আর ওঁর জাপানীটা সত্যিই মজার ছিলো। 'চমৎকার কুয়োইয়াসানাগি-সান!' যখন সবাই খুব ভালো বাজাতেন তখন অদ্ভুত উচ্চরাণে কথাটা বলতেন উনি। অথবা স্রেফ বলতেন, 'অসাধারণ!'

তোত্তো-চান কখনো হলঘরের ভেতরে ঢোকেনি। জানলায় বসে বসে চুপি চুপি বাজনা শুনতেই ওর বেশি ভালো লাগতো। যখন বাজনা থেমে যেতো আর শিল্পীরা বাইরে বেরোতেন সিগারেট খাবার জন্য, তখন, অনেক সময়, বাবা আবিষ্কার করতেন তোত্তো-চান এসে বসে আছে। 'ও তত্স্কি, তুমি এখানে!' বাবা বলতেন।

মিস্টার রোজেনস্টক ওকে দেখতে পেলে ওঁর সেই উচ্চারণে বলতেন, 'সুপ্রভাত' কিংবা 'কী খবর?' আর তোত্তো-চান যখন বেশ বড় হয়ে গিয়েছিলো, তখন ওকে কোলে তুলে নিয়ে গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে ওকে আদর করতেন। এতে তোত্তো-চান একটু লজ্জা পেতো।

আবার মিস্টার রোজেনস্টককে ওর খুব ভালোও লাগতো। চোখে রুপোলি রঙের পাতলা ফ্রেমের চশমা, বড়সড় একটা নাক; তেমন লম্বা ছিলেন না, কিন্তু চেহারায় একটা সৌম্য, সুন্দর, শিল্পী শিল্পী ভাব ছিলো।

রিহার্সালের হলঘরটা তোত্তো-চানের খুব পছন্দ ছিলো। একটু পুরনো, ইউরোপীয় ধাঁচের একটা বাড়ি, ঝরঝরে, কিন্তু খুব সুন্দর। সেনজুকো দীঘির হাওয়া এসে সুরগুলোকে হলঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতো বহু, বহু দূর। মাঝে মাঝে মাছ-বিক্রেতার 'ভালো মাছ' হাঁকের সঙ্গে ওই সুর যেন মিশে যেতো।



ভালো মাছ উফ্ ভালো মাছ!

গরম জলের কুণ্ড

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে এসেছিলো। ছুটির শেষে ওদের স্কুল থেকে গরম জলের কুণ্ডতে বেড়াতে যাবার কথা ছিলো। তোমাই-এর ছেলেমেয়েদের কাছে এটাই ছিলো স্কুলের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান।

মা কিন্তু চট করে অবাক হবার মানুষ ছিলেন না, তবু যেদিন তোত্তো-চান বাড়ি এসে বলেছিলো, 'জানো, সবাই গরম জলের কুণ্ডতে বেড়াতে যাচ্ছে, আমিও কি যেতে পারি?' সেদিন মা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বুড়োবুড়িরা দল বেঁধে গরম জলের কুণ্ডতে বেড়াতে যায়, একথা মা জানতেন; তাই বলে ক্লাস ওয়ানের বাচ্চারা? অবশ্য, হেডমাস্টারমশাইয়ের চিঠিটা ভালো করে পড়ার পর মায়ের মনে হয়েছিলো, কী দারুণ আইডিয়া! তোই নামে একটা জায়গায় তোমোই-এর 'সাগর পারের ইস্কুল' বসবে। সিজুয়োকাতে ইজু নামে একটা উপদ্বীপ আছে। সেখানে ওই তোই গ্রাম। আর সেইখানে একটা গরম জলের কুণ্ড আছে, সমুদ্রের জলের ভিতরে। ফলে বাচ্চারা বেশ সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারবে আবার গরম জলে স্নানও করতে পারবে। তিন দিন, দু রাতের জন্য যাবে ওরা। তোমোই-এর এক ছাত্রের বাবার ওখানে একটা

বাড়ি আছে, পঞ্চাশজন ছেলেমেয়েই সেখানে থাকবে ঠিক হয়েছিলো। ক্লাস ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত সবাই। মা তো তোত্তো-চানকে এক কথায় যেতে দিতে রাজি হয়ে গেলেন।

যাবার দিন সবাই স্কুল চত্বরে এসে হাজির হলো। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'এবার শোনো তোমরা। আমরা ট্রেনে করে যাবো, তারপর জাহাজে। তোমরা কেউ কিন্তু হারিয়ে যেও না। এটা আমি মোটেও চাই না। বুঝেছো? তো চলো তাহলে?' ব্যাস, শুধু এটুকুই বলেছিলেন। তবু বাচ্চারা সবাই জিয়ুগায়োকা স্টেশান থেকে তোকিও-র ট্রেনে উঠলো যখন, তখন ওদের আশ্চর্য সুশৃঙ্খল ব্যবহার দেখলে অবাক হতে হতো। কেউ ছুটোছুটি করছিলো না, চিৎকার চ্যাঁচামিচি করছিলো না, আর যেটুকু গল্প করছিলো তার শুধু কাছাকাছি বসা বন্ধুদের সঙ্গে। তোমোই-এর ছেলেমেয়েদের একবারও বলা হয়নি যে লাইন করে দাঁড়াতে হবে, ট্রেনে চ্যাঁচামিচি করবে না, খাবার খেয়ে কাগজ, খোলা-খোসা, এইসব ছড়িয়ে ফেলবে না। তবু ওরা ওদের প্রতিদিনকার স্কুলের জীবন থেকে নিশ্চয় এমন কোনো শিক্ষা পেয়েছিলো, যার জন্য ওরা সহজভাবে বুঝে গিয়েছিলো যে যারা ছোটো আর দুর্বল তাদের ওপর গায়ের জোর খাটাতে হয় না; অসভ্য আচরণ খুব লজ্জার ব্যাপার, এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে অন্য কারোর বিরক্তি বা অসুবিধা হতে পারে; যখনই কোনো কাগজ, খোলা-খোসা এসব পড়ে থাকতে দেখবে, তখনই হাতে তুলে নোংরা ফেলার জায়গায় ফেলে দেবে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, যে তোত্তো-চান ক'মাস আগেও কথা বলে, রাস্তার বাজনাওয়ালাদের ডেকে, গোটা ক্লাসকে বিরক্ত করে মারছিলো, সেই তোত্তো-চানই তোমোই-তে প্রথম দিন থেকে ডেস্কে বসে, শান্ত হয়ে, মন দিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলো। আগের স্কুলের কেউ যদি এখন ওকে বন্ধুদের সঙ্গে এই ট্রেনে বসে সুন্দরভাবে গল্প করতে দেখতেন, তাহলে ভাবতেন, এ নিশ্চয় আর কোনো মেয়ে!

নামাজুতে নেমে ওরা ঠিক স্বপ্নের মতন একটা জাহাজে গিয়ে উঠলো। জাহাজটা তেমন বড় ছিলো না, কিন্তু ওরা এত উত্তেজিত ছিলো যে ঘুরে ঘুরে ডেকের প্রতিটা কোণা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো—এটা ছুঁয়ে, ওটা থেকে একটু ঝুলে পড়ে—আর তারপর জাহাজ যখন চলতে শুরু করলো, তখন পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের খুব করে হাত নেড়ে দিলো। কিন্তু খানিকবাদেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো আর ওদের খোলা ডেক ছেড়ে জাহাজের ভেতরে চলে যেতে হলো। একটু পরে, সমুদ্র খুব উত্তাল হয়ে ওঠায় তোত্তো-চান ও আরো কিছু ছেলেমেয়ের শরীর খারাপ লাগতে লাগলো। তখন ওদেরই একটি উঁচু ক্লাসের ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে 'উপ্‌স্‌, উপ্‌স্‌' বলে একবার এদিকে ছুটে গিয়ে, একবার ওদিকে ছুটে গিয়ে জাহাজটাকে মিছিমিছি সোজা করার চেষ্টা করতে লাগলো। যেই জাহাজটা একটা দিকে হেলে

পড়ছিলো, অমনি সে 'উপ্স্' বলে সেই দিকে ছুটে যাচ্ছিলো। এই না দেখে ছেলেমেয়েরা বমিভাব ভুলে গিয়ে হাসতে শুরু করলো। অমনি করে হাসতে হাসতে কখন যেন ওরা তীরে পৌঁছে গেলো। সবচেয়ে মজার কথা হলো, জাহাজ থেকে নামার পর যখন সবার বেশ সুস্থ আর চনমনে লাগছে, তখনই সেই 'উপ্স্ উপ্স্' করা ছেলেটারই শরীর খুব খারাপ হয়েছিলো।

একটি অপূর্ব সুন্দর, শান্ত পাহাড় আর বন দিয়ে ঘেরা সমুদ্র পারের গ্রামের নাম তোই। একটু জিরিয়ে নেওয়ার পর শিক্ষকরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমুদ্রে গেলেন। এটা তো ঠিক স্কুলে সাঁতার কাটার মতন ছিলো না, তাই এখানে ওরা সব সাঁতারের পোশাক পরেই জলে নামলো।

সমুদ্রের ভিতরে গরম জলের কুণ্ডটা সত্যিই এক আশ্চর্য ব্যাপার। কোনো কিছু দিয়ে তো আর ঘেরা ছিলো না, ফলে কোথায় যে সমুদ্রের ভিতরে গরম জলের কুণ্ড শুরু হচ্ছে তা বোঝার বিশেষ কোনো উপায় ছিলো না। কেউ যদি বলে দিতো যে এইখানেতে কুণ্ডটা রয়েছে, তখন জলের ভিতরে বসে পড়লে গরম জল এসে ঘাড় পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে যেতো। আহ্ কী আরাম! ঠিক যেন বাথটাবে বসে বসে স্নান করার মতন। সেখান থেকে সমুদ্রে চলে যেতে চাইলে পনেরো ফুট আড়াআড়িভাবে সাঁতার কাটলেই জলটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, যত দূরে যাও ততই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে জল, আর তখনই বুঝবে যে তুমি সমুদ্রে পৌঁছে গেছো।

তো, ধরো তুমি অনেকক্ষণ ধরে সমুদ্রে রয়েছো, আর বেশ ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে, তখন একটু তাড়াতাড়ি করে গরম জলের কুণ্ডটা পর্যন্ত সাঁতরে এসে ঘাড় অবধি উষ্ণ জলে ডুবিয়ে বসে থাকলেই হলো, মনে হবে যেন বাড়িতেই আছো। আর দৃশ্যটা কী মজার! ওদিকে সাঁতারের টুপি পরা ছেলেমেয়েরা সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে, এখানে কজন দিব্বি গোল হয়ে ভেসে গল্প করছে! কেউ ওদের এভাবে দেখলে ভাবতেন, 'গরম জলের কুণ্ডতে গেলে দেখি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বুড়োবুড়িদের মতন হয়ে যায়!'

তখনকার দিনে সমুদ্রতীরে কোনো ভিড় ছিলো না, তাই জায়গাটা যেন তোমোই-র ছেলেমেয়েদের নিজস্ব একটা বালুচর হয়ে গিয়েছিলো। এই সাঁতার, এই গরম জলে স্নান ওরা প্রাণভরে আনন্দ করেছিলো। এবং অতক্ষণ জলে থাকার পর সেদিন যখন ওরা ঘরে ফিরে গিয়েছিলো, তখন ওদের আঙুলের চামড়া একেবারে কুঁচকে একসা হয়ে গিয়েছিলো।

প্রতিরাতে লেপের ভেতর গুটিশুঁটি মেরে শোবার পর বাচ্চারা কেউ না কেউ একটা ভূতের গল্প বলতো। তোত্তো-চান আর ক্লাস ওয়ানের অন্য বাচ্চারা তো ওই সব গল্প শুনে ভয়ের চোটে কেঁদেই ফেলতো। তাও শোনা চাই। চোখে জল, তবু বলবে 'তারপর?'

স্কুলের হলের ক্যাম্প, আর সাহসের পরীক্ষা—ওসব তো মিছিমিছি অ্যাডভেঞ্চার ছিলো! তুলনায় তোই-এ থাকাটা ছিলো সত্যিকারের একটা অভিজ্ঞতা। যেমন, ছেলেমেয়েরাই পালা করে বাজার করতে যেতো, সবজি কিনতো, মাছ কিনতো, কেউ যখন জিজ্ঞেস করতো যে ওরা কোন স্কুলে পড়ে কিম্বা কোথা থেকে এসেছে, তখন ওদের খুব সুন্দর করে উত্তর দিতে হতো সে সব প্রশ্নের। একবার তো কয়েকটি ছেলেমেয়ে বনের মধ্যে প্রায় হারিয়েই গিয়েছিলো। অন্য কয়েকজন আবার সাঁতার কাটতে কাটতে সমুদ্রের ভিতরে এত দূরে চলে গিয়েছিলো যে আর ফিরতে পারছিলো না; এদিকে বাকিরা খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলো। আর কয়েকজনের আবার বালির ওপরে পড়ে থাকা কাচের টুকরোতে পা কেটে গিয়েছিলো। প্রত্যেকটা সমস্যায় বন্ধুদেরই সাধ্যমতো সাহায্য করতে হয়েছিলো।

অবশ্য, তোই সফরে এইসব সমস্যা নয়, মজা করাটাই নিত সময় বেশি। বনের ভিতরে ঝিঁঝি পোকারা গান গাইতো, আর একটা দোকানে দারুণ সব মিঠাই কিনতে পাওয়া যেতো। সমুদ্রের পারে ওরা এক ভদ্রলোককে দেখেছিলো, তিনি একলা একটা কাঠ দিয়ে একটা নৌকো তৈরি করছিলেন। ততদিনে বেশ নৌকোর মত দেখতে হয়ে গিয়েছিলো জিনিসটা। রোজ সকালে ওরা প্রথমেই ছুটে গিয়ে দেখতো কতটা এগিয়েছে ওঁর কাজ। তোত্তো-চানকে ওই মানুষটা একটা খুব সুন্দর বাঁকানো কাঠের টুকরো উপহার দিয়েছিলেন।

চলে আসার দিন হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'একটা ছবি তুললে কেমন হয়? তাহলে এই বেড়ানোটা বেশ মনে থাকবে!' আগে কোনোদিন ওদের সবার কোনো ছবি তোলা হয়নি, তাই সবাই দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লো। কিন্তু যেই না ক্যামেরা ট্যামেরা সব প্রস্তুত, অমনি কার যেন হিসি পেয়ে গেলো, তারপর আবার কে যেন উলটো করে জুতো পরেছে বলে সেটা খুলে ঠিক করতে লাগলো! শেষে ক্যামেরা হাতে মাস্টারমশাই যখন বললেন, 'সবাই ঠিক আছো তো?' তখন দেখা গেলো যে দু-একজন ক্লান্তির চোটে মাটিতে বসে পড়েছে, আর ছবির জন্য 'পোজ' দিতে পারছে না। ছবিটা তুলতে সত্যিই অনেক সময় লেগে গিয়েছিলো সেদিন।

কিন্তু ঐ ছবিটা—পেছনে সমুদ্র আর সামনে প্রত্যেকে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে—পরে সেটা ওদের এক মহা মূল্যবান সম্পদ হয়ে গিয়েছিলো। ছবিটার দিকে এক ঝলক তাকালেই হুড়মুড়িয়ে সব স্মৃতি এসে চোখের সামনে হাজির হতো—জাহাজটা, গরম জলের কুণ্ড, ভূতের ভয়, 'উপ্স্, উপ্স্' করা ছেলেটা! তোত্তো-চানের জীবনের সেই প্রথম গ্রীষ্মের ছুটির আনন্দ ও কখনোই ভুলতে পারেনি।

যখনকার কথা বলছি, তখন তোকিওতে তোত্তো-চানদের বাড়ির পেছনের পুকুরে বাগদা চিংড়ি পাওয়া যেতো। আর, ময়লা পরিষ্কারের গাড়িটা কে টেনে নিয়ে আনতো বলো তো? একটা মস্ত বড় ষাঁড়!

ইউরিদমিক্স

জাপানের স্কুলে ছেলেমেয়েরা নতুন ক্লাসে যায় এপ্রিল মাসে। গ্রীষ্মের ছুটির পর ওদের দ্বিতীয় সেমেস্টারের পড়াশুনো শুরু হলো। ইতিমধ্যে তোত্তো-চান নিজের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ছাড়াও অনেক বড় ছেলেমেয়ের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করে ফেলেছিলো। এটা সম্ভব হয়েছিলো গরমের ছুটির সময়কার নানান ক্যাম্প, বেড়াতে যাওয়া—এই সবের জন্য। ছুটির পর তোত্তো-চানের যেন তোমোই গাকুয়েন স্কুলটাকে আরো ভালো লাগতে লাগলো।

এমনিতে তো তোমোই-তে পড়াশুনোর ধরনটাই সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো, তাছাড়া এখানে গানবাজনার ওপরে খুব বেশি জোর দেওয়া হতো। তোমোইতে সঙ্গীত ছিলো পড়াশুনোরই অঙ্গ। প্রতিদিন একটা বিশেষ ক্লাস নেওয়া হতো এখানে, তার নাম 'ইউরিদমিক্স'। সুইৎজারল্যাণ্ডের সঙ্গীত রচয়িতা এবং শিক্ষক, এমিল জাক্-ডালক্রোসের সঙ্গীতের ছন্দ-শিক্ষার এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে প্রথম জানা যায় ১৯০০ সালে। তারপর ইওরোপ এবং আমেরিকার বহু স্কুলে এই শিক্ষা পদ্ধতিটি চালু করা হয় এবং 'ইউরিদমিক্স' নিয়ে এটা শুরু হয়। তোমোই গাকুয়েনে কেমন করে 'ইউরিদমিক্স' এলো, সেই গল্পটা বলি।

স্কুলটা চালু করার আগে হেডমাস্টারমশাই সোসাকু কোবায়াশি একবার ইওরোপে গিয়েছিলেন, সেখানে কেমন করে ছোটদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তা দেখে আসবার জন্য। উনি অনেক অনেক ছোটদের স্কুলে ঘুরে, অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদের সঙ্গে কথা বলে, শিশুশিক্ষার বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছিলেন। সে সময়ই প্যারিসে ডালক্রোসের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়। শিশুদের কেমন করে সঙ্গীতকে উপলব্ধি করতে শেখানো যায়, যাতে ওরা শুধু কান দিয়ে নয়, মন দিয়েও সঙ্গীতকে গ্রহণ করতে পারে, কেমন করে সঙ্গীতের মাধ্যমে শিশুদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো জাগিয়ে তোলা যায়, এইসব নিয়ে ডালক্রোস বিস্তর চিন্তাভাবনা করছিলেন। আর শিশুদের ছুটোছুটি লাফালাফি করা দেখতে দেখতে ওঁর মনে হয়েছিলো যে সঙ্গীত আর ছন্দের সাহায্যে ওদের কিছু ব্যায়াম করানো যেতে পারে। এই শিক্ষা পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছিলো 'ইউরিদমিক্স'।

প্যারিসে সোসাকু কোবায়াশি প্রায় বছর খানেক ধরে ডালক্রোসের স্কুলে ইউরিদমিক্সের পাঠ নিয়েছিলেন। ডালক্রোসের ভাবনা জাপানের অনেককেই প্রভাবিত করেছিলো, যেমন, সুরকার কোসচাক ইয়ামদা—জাপানে আধুনিক নৃত্যের প্রতিষ্ঠাতা ইনি, 'কাবুকি' অভিনেতা ইচিকাওয়া সাদানজি (দ্বিতীয়), আধুনিক নাটকের পথিকৃত কোওয়ারু ও সামুই, নৃত্যশিল্পী মিচিও ইকো। এঁদের সবারই মনে হয়েছিলো যে ডালক্রোসের শিক্ষার সঙ্গে নানান শিল্পের খুব গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য কোবায়াশিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ডালক্রোসের শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যবহার করেছিলেন।

'ইউরিদমিক্স' ব্যাপারটা কী জিজ্ঞেস করা হলে কোবায়াশি বলতেন; 'এটা একটা

খেলা যার ফলে শরীরের ক্রিয়াগুলো শুদ্ধ হয়; এই খেলা মনকে শেখায় কেমন করে শরীরের চলন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়; এর ফলে শরীর এবং মন ছন্দ আর তালকে বুঝতে শেখে। ইউরিদমিক্সের ফলে চরিত্রের মধ্যে একটা আশ্চর্য ছন্দ প্রকাশ পায়। আর, যে মানুষের চরিত্রে এই ছন্দ ফুটে ওঠে, সে প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে পারে।'

তোত্তো-চানদের প্রথমে শেখানো হয়েছিলো কেমন করে শরীরের চলন দিয়ে ছন্দ চিনতে হয়। হেডমাস্টারমশাই হলঘরের মঞ্চের ওপরে রাখা পিয়ানোটাতে কোনো একটা সুর বাজাতেন আর ছেলেমেয়েরা যে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতো সেখান থেকেই তালে তালে হাঁটতে শুরু করতো। ওরা যেমন খুশি হাঁটতে পারতো, কেবল কারো গায়ে ধাক্কা দেওয়া যেতো না। ফলে ওরা সাধারণত একই জায়গায় গোল হয়ে ঘুরতে থাকতো। যদি ওদের মনে হতো যে শুরুটা দুই দুই ছন্দে বাজছে, তাহলে ওরা সঙ্গীত পরিচালকের মতন করে দুহাত ওপর-নিচ করতে করতে হাঁটতো। আর, হাঁটার নিয়মটা ছিলো এই রকম : যেমন, দুম দুম করে পা ফেলা যেতো না, তেমনি ওরা ব্যালে নাচিয়েদের মতন পা টিপে টিপেও হাঁটতে পারতো না। ওদের বলা হয়েছিলো, খুব সহজভাবে হাঁটতে, যেন আরাম করে পা ফেলে চলেছে। দুই দুই ছন্দ পাল্টে যদি তিন-তিন ছন্দ বাজানো হতো, তখন ওরা ওদের চলা আর হাত নাড়ার ছন্দ পাল্টে ফেলতো। পিয়ানোর লয় বাড়া কমার সঙ্গেও ওদের চলা কখনো দ্রুত হতো, কখনো ধীর। এমনি করতে করতে ওরা ছয়-মাত্রার তাল পর্যন্ত শিখে গিয়েছিলো। চারমাত্রার তালটা বেশ সহজ ছিলো :

'এগোও পিছোও আর সামনে পিছনে করো।'

পাঁচমাত্রার তালটা ছিলো :

'এগিয়ে পিছিয়ে ঘুরে যাও আর সামনে পিছনে করো।'

ছমাত্রায় হাত এভাবে দোলাতে হতো :

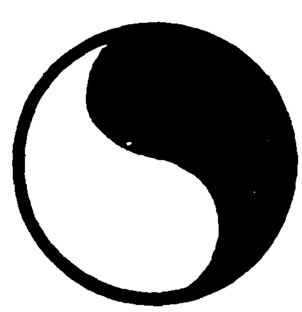
'এগোও পিছোও, সামনে করো, ঘুরে যাও আর ওপরে তাকাও, এ পাশ ও পাশ আর নিচেও তাকাও।'

ছন্দটা যখন কেবলই পাল্টে পাল্টে যেতো তখন তাল মেলানো বেশ শক্ত হয়ে পড়তো। আর হেডমাস্টারমশাই যখন বলতেন, 'আমি লয়, ছন্দ পাল্টালেও তোমরা কিছুই পাল্টাবে না, যতক্ষণ না আমি পাল্টাতে বলছি, তখন সেটা ভারি শক্ত একটা খেলা হতো। মানে, ওরা হয়তো দু মাত্রার সুরের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছিলো আর তিন মাত্রার সুর বাজতে শুরু করেছে, কিন্তু ওদের তখনো দু-মাত্রার ছন্দেই হেঁটে যেতে হবে। এটা খুবই কঠিন ছিলো, কিন্তু হেডমাস্টারমশাই বলতেন, এটা করতে পারলে একটা শিশুর মনোনিবেশ করার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে। শেষে উনি ওদের ডেকে বলতেন, 'এবার ছন্দ পাল্টাতে পারো তোমরা!'

রেহাই পেয়ে ছেলেমেয়েরা ওদের চলার ছন্দ পাল্টাতে শুরু করতো। কিন্তু এই সময়টাতেই ওদের সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হতো। ওরা হয়তো মনে মনে দু-মাত্রার ছন্দ থেকে বেরিয়ে গিয়ে শরীরটাকে তিন-মাত্রার ছন্দে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় হঠাৎ পিয়ানোতে পাঁচ-মাত্রার সুর বাজতে শুরু করেছে! প্রথম দিকে ওদের হাত পা যেমন তেমন করে চলতে শুরু করতো আর ওরা 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' বলে চিৎকার করতে থাকতো, কিন্তু পরের দিকে ওরা দিব্যি যে কোনো তালের সঙ্গে তাল রাখতে শিখে গিয়েছিলো। এমন কি, ওরা নিজেরাই তখন ছন্দ বদলের নানান খেলা তৈরি করে ফেলতো।

সাধারণত ছোটরা সবাই একলা একলা, যে যার নিজের মতন করে হাঁটতো, আবার কখনো কখনো ওরা জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরাধরি করেও ঘুরতো, কখনো আবার দু চোখ বুজে চলার চেষ্টা করতো। যা খুশি করা যেতো এই ক্লাসে, কেবল চলার সময় কথা বলাটা বারণ ছিলো। শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের যেদিন মিটিং হতো, সেদিন মায়েরা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতেন, কী সুন্দর নানান সুরের তালে তালে হাত নেড়ে নেড়ে, কখনো বা লাফিয়ে লাফিয়ে, ঘুরে চলেছে ওঁদের ছেলেমেয়েরা।

প্রথমত, ইউরিদমিক্সের লক্ষ্য ছিলো শরীর আর মনের ভিতরে তাল আর ছন্দের একটা বোধ জাগিয়ে তোলা। এর ফলে দেহ আর মনের চলনে একটা ঐক্যতান সৃষ্টি হতো। অবশেষে, এই ঐক্যতান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশুদের মনের মধ্যে কল্পনাশক্তি আর সৃজনশীলতার জন্ম হতো।



প্রথম যেদিন তোত্তো-চান এই স্কুলে এসেছিলো, সেদিন গেটের গায়ে স্কুলের নামটা দেখে ও মাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'মা, তোমোই মানে কী?' 'তোমোই' একটা খুব পুরনো জাপানী চিহ্ন, দাঁড়ি-কমার যে কমা, সেই কমার মতন দেখতে। দুটো 'তোমোই'—একটা কালো আর একটা সাদা—একটার পায়ের সঙ্গে অন্যটার মাথা মিলিয়ে এইরকম নিটোল গোল একটা চিহ্ন তৈরি করা হয়েছিলো। সেটাই ছিলো তোমোই গাকুয়েনের চিহ্ন।

এই চিহ্নতে হেডমাস্টারমশাইয়ের জীবনের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছিলো : শিশুদের শরীর আর মনের ঐক্যতান, একই ছন্দে তালে শরীর মনকে গড়ে তোলা। ইউরিদমিক্সের প্রচলন তিনি এজন্যেই করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এর ফলে খুব সুন্দর

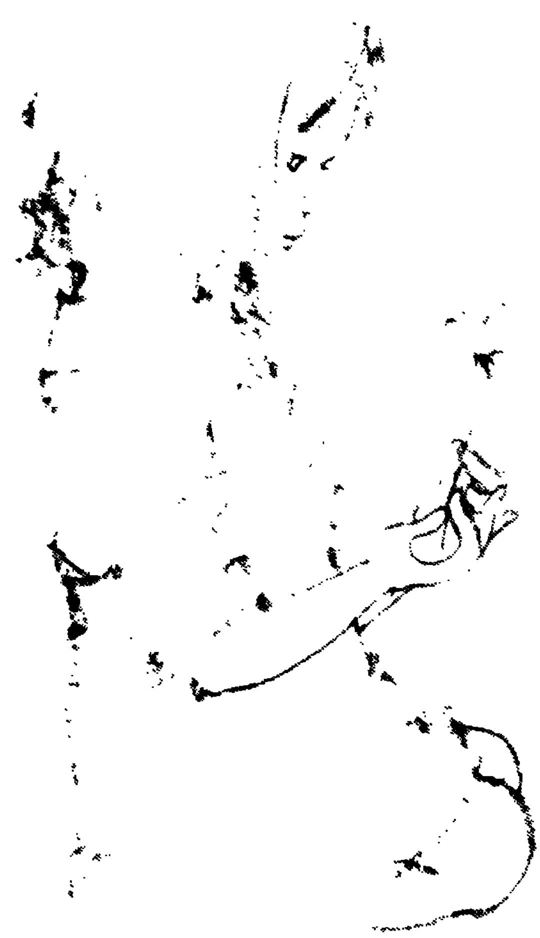
সহজভাবে শিশুরা বেড়ে উঠবে, বড়রা বাইরে থেকে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারবে না তাদের মনের ওপর।

এই যে হাল আমলের শিক্ষাব্যবস্থা, এই যে লেখা বুলি পড়ানো আর পাঠ মুখস্থ করানো, এর ঘোর বিরোধী ছিলেন সেসাকু কোবায়াশি। তিনি মনে করতেন মুখস্থ বিদ্যার ফলে শিশুদের অনুভূতি কমে যায়, ওদের প্রকৃতি থেকে পাঠ নেবার সহজাত ক্ষমতার ক্ষয় হয়, ওরা প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশকে অনুভব করতে পারে না। অথচ, সেটাই তো জীবনের আসল প্রেরণা!

কবি বাসো লিখেছিলেন :

শোনো! ওই যে ব্যাঙটা
প্রাচীন দীঘির নীরব জলে
ডুব দিলো, ওকে শোনো!

এই ব্যাঙকে তো নিশ্চয় যুগ যুগ ধরে কত মানুষই দীঘির জলে ডুব দিতে দেখে আসছে! যুগ যুগ ধরে কত মানুষই তো নিশ্চয় কেটলির নল থেকে ধোঁয়া বেরোতে আর গাছ থেকে আপেল খসে পড়তে দেখেছে, একা ওয়াট বা নিউটন তো নন! অথচ, এই যে চোখ থাকা কিন্তু কোনো সৌন্দর্য দেখতে না পাওয়া, কান থাকা কিন্তু সুর শুনতে না পাওয়া, বুদ্ধি থাকা অথচ বোধ না থাকা, মন থাকা কিন্তু তাতে সুখ দুঃখের স্পর্শ না লাগা, মনের মধ্যে আগুন জ্বলে না ওঠা—এগুলোকেই ভয় পেতে হয়, হেডমাস্টারমশাই বলতেন।



আর তোত্তো-চানের কাছে ব্যাপারটা ছিলো এইরকম : ইউরিদমিক্সের ক্লাসে ইসাডোরা ডানকানের মতন খালি পায়ে ছুটে বেড়ানো, লাফিয়ে লাফিয়ে চলা, এতে ওর কী যে আনন্দ ছিলো! এটাও ইস্কুলের পড়াশুনোর অঙ্গ? ও যেন ঠিক বিশ্বাসই করতে পারতো না।

আমি তো শুধু এটাই চাই

তোত্তো-চানের পুরনো স্কুলের কাছে, সেনজুকো দীঘির মধ্যিখানে ছোট একটা দ্বীপ ছিলো, আর সেই দ্বীপে ছিলো সৌন্দর্য আর সঙ্গীতের দেবী, বেনতেনের একটি মন্দির। ওই মন্দির চত্বরে প্রতি বছর মেলা বসতো। এরকম কোনো মেলায় আগে কখনো যায়নি তোত্তো-চান।

মা বাবার সঙ্গে পথের অল্প আলোর মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছিলো ও। মেলায় পৌঁছনো মাত্র হঠাৎ চারপাশটা খুব ঝলমলে হয়ে গেলো। তোত্তো-চান তখন প্রতিটা স্টলের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে দেখে নিতে লাগলো, ভিতরে কী কী আছে। নানা রকম শব্দ—কিঁচ কিঁচ, ছর্‌র্‌র্ ছর্‌র্‌র্, টুপ টুপ, আর কত সব দারুণ গন্ধ! তোত্তো-চানের সব কিছুই নতুন আর আশ্চর্য লাগছিলো।

ছোট ছোট খেলনা পাইপ; ভেতরে সিগারেট নয়, পেপারমিন্ট ভরা। পাইপের ওপরে আবার কুকুর, বেড়াল, 'বেটি বুশ' আর মজার মজার কত ছবি আঁকা! নানা রকমের কাঠি লজেন্স, বুড়ির মাথায় পাকা চুল, বাঁশের বন্দুক, যার ঘোরা টিপলেই ফট্ করে একটা শব্দ হয়! রাস্তার পাশে বসে একজন খেলা দেখাচ্ছিলো—এই কতগুলো ছুরি গিলে ফেললো, এই কতটা কাচ কচমচ করে খেয়ে ফেললো। ওদিকে আর একজন কী যেন একটা পাউডার একটা বাটির গায়ে ঘষে দিচ্ছিলো আর বেশ একটা টিংটিং শব্দ হচ্ছিলো তখন। সোনালি রঙের যাদু আংটি, যার ছোঁয়ায় পয়সা হাপিস হয়ে যায়; এমন ছবি যেটা এমনিতে দেখা যায় না, কেবল রোদ পড়লেই দেখা যায়; কাগজের ফুল, জলে ফেললেই ফুটে ওঠে—তোত্তো-চানের দুটো চোখ এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

'দ্যাখো!' বলে তোত্তো-চান এক বাক্সভর্তি হলুদ রং-এর মুরগির ছানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। ছানাগুলো সব খুব চিঁচিঁ করছিলো। বাবা আর মাকে তোত্তো-চান এক পাশে ডেকে নিয়ে বললো, 'আমাকে এর একটা কিনে দেবে? দাও না, প্লিজ!' ছানাগুলো সব মাথা তুলে তোত্তো-চানের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। আর ওদের ল্যাজগুলো খুব করে নাড়াতে লাগলো। তার সঙ্গে ওরা যেন আরো জোরে চিঁচিঁ করতে লাগলো। তোত্তো-চান ওদের সামনে উবু হয়ে বসে পড়লো। এত মিষ্টি দেখতে ছানাগুলো! তোত্তো-চানের মনে হচ্ছিলো এমন সুন্দর কিছু ও আগে কোনোদিন দেখেনি। 'কী সুন্দর না?' ও বললো। 'দাও না,' বলে ও বাবা মায়ের কাছে আবদার

করলো। কিন্তু, অবাক কাণ্ড, ওঁরা ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। ‘তোমরা যে বলেছিলে আমায় কিছু একটা কিনে দেবে? এটা দাও তাহলে! আমি তো আর কিচ্ছু চাইনি!’

‘এটা তুমি চেওনা, লক্ষ্মীসোনা,’ মা ওকে আদর করে বললেন। ‘এই ছানাগুলো ক’দিনের মধ্যেই মরে যাবে।’

‘কেন?’ তোত্তো-চান কাঁদতে লাগলো।

যে লোকটা মুরগির ছানাগুলো বিক্রি করছিলো, সে যাতে শুনতে না পায় সেদিকে খেয়াল রেখে বাবা ওকে একটু সরিয়ে এনে বললেন, ‘এখন ওদের সত্যিই খুব মিষ্টি লাগছে তত্‌স্‌কি, কিন্তু বেচারারা বেজায় অসুস্থ। ওরা কিছুতেই বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। তখন তোমারই খুব কষ্ট হবে। তাই তোমাকে আমরা এটা কিনে দিতে চাইনা।’

কিন্তু তোত্তো-চানের তো মাথায় ঢুকে গিয়েছিলো যে ওই মুরগির ছানাগুলোই ওর চাই, তাই ও কিছুতেই মা-বাবার কথা মানতে পারছিলো না। ‘আমি ওদের মরতে দেবো না, ওদের আমি ঠিক দেখে রাখবো।’ মা-বাবা যতই ওকে ওই ছানাগুলোর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চান, ও ততই সরতে চায় না, কেবল করুণ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছানাগুলোও করুণ চোখে তোত্তো-চানকে দেখছিলো, আর চিঁচি চিঁচি করে ডাকছিলো। কেবল মাত্র একটা মুরগির ছানা, আর কিছুই তো চায় না ও। ‘দাও না আমাকে একটা কিনে, দাও না, প্লিজ!’ ও আকুল হয়ে বলতে থাকে। কিন্তু মা বাবাও শক্ত হয়ে থাকেন। ‘তোমাকে আমরা এটা দিতে চাই না, কারণ পরে তুমিও খুব কাঁদবে।’

তোত্তো-চান এবার ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগলো আর ওর দু গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সেই অবস্থাতেই ও হাঁটতে শুরু করলো। আধো-অন্ধকার পথ দিয়ে হাঁটার সময় ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, ‘আমি তো কোনোদিন এইভাবে কিছু চাইনি, আর কক্ষনো চাইবোওনা, কেবল একটা মুরগির ছানা কিনে দাও আমায়! প্লিজ!’ মা-বাবাকে শেষ পর্যন্ত ওর আবদার মেনে নিতেই হলো।

খুব জোর ঝমঝমে বৃষ্টির পর হঠাৎ রোদ উঠলে যেমন লাগে, তোত্তো-চানের চোখ মুখও তেমনি ঝলমল করে উঠলো। একটা বাক্সের মধ্যে দুটো ছানা নিয়ে ও বাড়ি ফিরে চললো।

পরদিন মা একজন কাঠের মিস্তিরিকে ডেকে এনে ওর জন্যে খড়খড়ি দেয়া একটা বাক্স তৈরি করিয়ে দিলেন আর তাতে একটা ইলেকট্রিক আলোও লাগিয়ে দেওয়া হলো, মুরগির ছানাদের উত্তাপ দেবার জন্য।

সারাটা দিন ধরে তোত্তো-চান ছানাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সত্যি, দেখতে কী যে মিষ্টি! কিন্তু হায়! চারদিনের মাথায় একটা ছানার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলো,

পাঁচদিনের দিন অন্যটার। তোত্তো-চান ওদের কত্ত আদর করলো, কতবার ওদের নাম ধরে ডাকলো, কিন্তু ওরা আর কিছুতেই সাড়া দিলো না, চোখ মেলে তাকালো না। বাবা মা যেমন বলেছিলেন, তেমনই হলো। ও একলা একলা খানিক কাঁদলো, তারপর বাগানে একটা গর্ত খুঁড়ে ছানা দুটোকে মাটির তলায় শুইয়ে দিলো। শেষে ছোট একটা ফুল রেখে দিলো ওই সমাধির ওপরে।

ছোট্টকাঠের বাক্সটা খালি হয়ে যাওয়ার পর যেন খুব মস্ত দেখাচ্ছিলো। তারই এক কোণে একটা হলুদ পালক পড়েছিলো, সেটা দেখা মাত্র তোত্তো-চানের মেলার দিনটার কথা মনে পড়ে গেল—কেমন করে ছানাগুলো চিঁচিঁ করছিলো, সেই সব কথা। দাঁত দিয়ে শক্ত করে ওর ঠোঁট চেপে ধরে চুপি চুপি কাঁদতে লাগলো ও। এত আকুল হয়ে কোনো কিছু কখনো চায়নি এর আগে। আর, কেমন নিমেষের মধ্যে তা হারিয়ে গেলো। সে-ই প্রথম খুব ভালবাসার কাউকে হারাবার যন্ত্রণা অনুভব করেছিলো তোত্তো-চান।

সবচেয়ে খারাপ পোশাক

বাবা-মাদের হেডমাস্টারমশাই সব সময় বলতেন, আপনারা বাচ্চাদের ওদের সবচেয়ে খারাপ পোশাকটা পরিয়ে স্কুলে পাঠাবেন। এ-কথা বলার কারণ ছিলো, বাচ্চারা তাহলে মনের আনন্দে যা খুশি তাই করতে পারে, কাদা মাখুক বা জামা ছিঁড়ে যাক, বাড়ি গিয়ে বকুনি খাবার ভয় থাকে না আর। সুন্দর জামা পরে এসে সারাক্ষণ সতর্ক হয়ে থাকতে হবে, এই না দাগ লেগে যায়, এই না ছিঁড়ে যায়, ফলে ভয়ে ভয়ে খেলবো—হেডমাস্টারমশাইয়ের মনে হতো যে এটা মোটেও ঠিক নয়। তোমোই-র আশপাশে অনেক ছোটদের স্কুল ছিলো যেখানে ছেলেমেয়েরা সব দারুণ ফিটফাট পোশাক পরে যেতো—মেয়েরা সেলর-স্যুট আর ছেলেরা কলার-তোলা জ্যাকেট আর হাফ প্যান্ট—কিন্তু তোমোইতে বাচ্চারা সবাই খুব সাধারণ জামা পরে আসতো আর ওদের যত-খুশি খেলায় কেউ বাধা দিতো না। তখনকার দিনে জিন্সের মতন শক্তপোক্ত প্যান্ট পাওয়া যেতো না, ফলে প্রায় সব ছেলের প্যান্টেই এখানে ওখানে তালি-তাপ্পি মারা থাকতো, আর মেয়েরা বাজারের সবচেয়ে শক্ত কাপড়ের তৈরি ফ্রক বা স্কার্ট পরে স্কুলে আসতো।

তোত্তো-চানের সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিলো এর ওর বাগানের বেড়ার তলা দিয়ে হামা দিয়ে ওপারে চলে যাওয়া, কিংবা পাশের কোনো ফাঁকা জমিতে ঢুকে পড়া; তাই এই পোশাকের নিয়মটাতে ওর খুব সুবিধে হয়েছিলো। তখনকার দিনে কাঁটাতারের বেড়ার খুব চল ছিলো, কখনো কখনো সেই বেড়া একেবারে মাটি ছুঁয়ে থাকতো। তেমন কোনো বেড়ার তলা দিয়ে হামাগুড়ি দেবার জন্য ওকে প্রথমে কুকুরদের মতন মাটিতে বেশ একটা গর্ত খুঁড়ে নিতে হতো। ও যতই সতর্ক থাকুক না কেন, এই

করতে গিয়ে অবধারিতভাবে ওর জামা কাঁটায় আটকে গিয়ে ছিঁড়ে যেতো। একবার মসলিনের খুব পুরনো একটা জামা এমনভাবে কাঁটাতারে আটকে গিয়েছিলো যে সেটা ছিঁড়ে একেবারে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছিলো। যদিও পুরনো, তবু ও জানতো যে জামাটা মায়ের খুব পছন্দ। তাই ও খুব করে মাথা খাটিয়ে ভাবতে লাগলো, বাড়ি গিয়ে কী বলবে। কাঁটাতারে আটকে ছিঁড়ে গেছে, মাকে সে কথা বলবে কেমন করে? কিছু একটা গল্প তো বানিয়ে বলতে হবে যাতে মনে হয় যে ওর কিচ্ছু করার ছিলো না? ও তখন একটা গল্প বানিয়ে ফেললো :

'বাড়ি ফেরার পথে, জানো মা,' তোত্তো-চান বাড়ি ফিরেই গল্পটা বলতে শুরু করলো, 'অনেকগুলি ছেলেমেয়ে—তাদের আমি চিনি না—ওরা আমার দিকে কতগুলো ছুরি ছুঁড়ে মারতে লাগলো। দ্যাখো না, তাই তো আমার জামাটা কেমন ছিঁড়ে গেছে।' গল্পটা বানাতে বানাতে ও ভাবছিলো, মা যদি এর পর কোনো প্রশ্ন করেন, তাহলে ও কী উত্তর দেবে? ভাগ্যে মা শুধু বললেন, 'তাই তো! কী ভয়ানক কাণ্ড!' তোত্তো-চান মস্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। মা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে ওরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার ফলে ওর জামাটা বাঁচানোর কোনো উপায় ছিলো না!

মা অবশ্যই ওর ছুরি ছোঁড়ার গল্পটা বিশ্বাস করেননি। ছুরি ছুঁড়ে মারলে শুধুমাত্র জামাটাই ছিঁড়তো না, ওর গায়েও আঘাত লাগতো। তাছাড়া, তোত্তো-চানকে দেখে তো, একটুও ভয় পেয়েছে বলে মনে হচ্ছিলো না। ওর গল্প শুনেই মা সব বুঝে গিয়েছিলেন। তবে, তোত্তো-চান তো গল্প বানিয়ে বলার মেয়ে নয়! তার মানে, ওর নিশ্চয় জামাটা ছিঁড়ে যাওয়ায় খুব খারাপ লেগেছে। যাক, সেটুকু যে হয়েছে, সেটা ভালো কথা । মা এই ফাঁকে তোত্তো-চানকে অনেক দিন ধরে জানতে চাওয়া একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন।

'ছুরি লেগে তোমার জামা কেমন করে ছিঁড়ে গেছে তা আমি বুঝলাম, কিন্তু রোজ রোজ তোমার ইজেরটাও কেমন করে ছিঁড়ে যায় বলো তো?' মা এটা কিছুতেই বুঝতে পারতেন না—কেমন করে তোত্তো-চান প্রতিদিন ওর লেস লাগানো ইজেরের পেছনটা ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ি ফেরে! কাদা মেখে ফেরা, বা স্লিপ দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ার সময় পেছনটা ফেসে যাওয়া এক কথা, কিন্তু ওইভাবে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যায় কেমন করে ওর ইজের?'

তোত্তো-চান একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'দ্যাখো, যখন তুমি বেড়ার নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওপারে যাবে, যখন তুমি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ওপারে যাবে, তখন যাবার সময় বেড়ায় তোমার স্কার্ট বা জামা আটকে যাবেই, আর ফেরার সময় ইজেরও আটকে যাবে! বেড়ার এ মাথা থেকে ও মাথা, ঢোকার সময় বলতে হবে 'আসতে পারি?' আর বেরোবার সময় বলতে হবে, 'আচ্ছা, চলি তাহলে' আর তখনই তোমার ইজের, জামা—সব ছিঁড়ে যাবে। যাবেই দেখো?'

মা ঠিক ব্যাপারটা ধরতে পারলেন না, কিন্তু ওর কথা শুনতে বেশ মজা লাগছিলো। ‘খেলাটা বুঝি খুব ভালো?’ মা জিজ্ঞেস করলেন।

‘তুমিও একবার খেলে দ্যাখো না!’ মায়ের প্রশ্নে তোত্তো-চান বেশ অবাক হয়ে উত্তর দিলো। ‘এত মজা হয়, জানো মা, দেখবে তোমারও ইজের ছিঁড়ে যাবে!’

তোত্তো-চানের দারুণ খেলাটা ছিল এইরকম : প্রথমে কাঁটাতারে ঘেরা একটা ফাঁকা জমি খুঁজে পেতে হবে। তারপর নিচের তারটা তুলে, মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে বলতে হবে, ‘ভেতরে আসতে পারি কি?’ বলে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ার ওদিকে চলে যেতে হবে। তারপর, পাশের আর একটা তার উঁচু করে তুলে, মাটিতে আর একটা গর্ত খুঁড়ে পিছোতে পিছোতে বলতে হবে, ‘চলি তাহলে!’

তোত্তো-চানের ইজের ছেঁড়ার রহস্য এবার স্পষ্ট হয়ে গেলো মায়ের কাছে। বারবার ওই ‘আসতে পারি কি?’ আর ‘চলি তাহলে’ বলে ঢোকা আর বেরোনো করতে করতেই ওর জামা, ইজের, সব ছিঁড়ে একসা হয়। ওদিকে তোত্তো-চান তো খুশি মনে কাঁটাতার তুলে, গর্ত খুঁড়ে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। ইজেরের আর কী দোষ!

বড়দের কাছে খেলাটা হয়তো বেজায় ক্লান্তিকর মনে হবে, অথচ ছোটদের এতে কত যে আনন্দ! চুলে ধুলো, নখের ডগায়, কানের ভিতরেও—তোত্তো-চানকে দেখতে দেখতে মায়ের বেশ একটু হিংসেই হচ্ছিলো। আর হেডমাস্টারমশাইয়ের বিচারের তারিফ না করে উপায় নেই। কেমন সুন্দর ভেবেচিন্তে বলেছিলেন যে, ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে বাজে পোশাকটা পরিয়ে স্কুলে পাঠাবেন! নোংরা করা যেতে পারে, ছিঁড়লে ক্ষতি হবে না, এমন পোশাক। হেডমাস্টারমশাই যে সত্যিই ছোটদের মন বুঝতে পারতেন, এই জামার ব্যাপারটা থেকেও তা বোঝা যায়।

তাকাহাশি

একদিন সকালবেলায়, ছেলেমেয়েরা সবাই তখন স্কুলের মাঠে খেলছিলো, হেডমাস্টারমশাই বললেন, ‘তোমাদের একজন নতুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ওর নাম তাকাহাশি। ও ক্লাস ওয়ানের ট্রেনের যাত্রী হবে।’

তোত্তো-চান সহ সবাই তাকাহাশির দিকে তাকালো। তাকাহাশি ওর টুপি খুলে ওদের কুর্ণিশ করে বললো, ‘কেমন আছো?’ তোত্তো-চানেরা তো সবে ক্লাস ওয়ানে পড়ছে, ফলে দেখতে সবাই বেশ ছোটখাট। কিন্তু ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তাকাহাশিকে যেন আরো অনেক ছোট মনে হলো। ছোট ছোট হাত-পা, কিন্তু কাধটা বেশ চওড়া। টুপি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো ও—এই দাঁড়িয়ে থাকাটার মধ্যে কেমন একটা করুণ ভাব ফুটে উঠেছিলো।

‘চল, ওর সঙ্গে আলাপ করি,’ তোত্তো-চান সাক্কো-চান আর মিয়ো-চানকে বললো। ওরা তাকাহাশির দিকে এগিয়ে গেলো। ওদের কাছে আসতে দেখে তাকাহাশি খুব

সুন্দর করে হাসলো। তখন ওরাও হাসলো। মস্ত গোল গোল চোখ তাকাহাশির, দেখে মনে হচ্ছিলো যেন ও কিছু বলতে চায়। 'তুমি কি রেলগাড়ি-ক্লাসরুমটা দেখতে চাও?' তোত্তো-চান বললো। 'হুম্...,' বলে তাকাহাশি ওর টুপিটা ফের মাথার ওপর চাপিয়ে নিলো।

ওদের ক্লাসটা দেখাবার উত্তেজনায় তোত্তো-চান রেলগাড়ির দিকে ছুট্রে এগিয়ে গেলো। দরজায় পৌঁছে ও ডাক দিলো, 'তাড়াতাড়ি!' তাকাহাশিকে দেখে মনে হচ্ছিলো ও বেশ জোরেই ছুটছে, তবু ও অনেকটা পিছনে পড়েছিলো। 'আসছি!' বলে তাকাহাশি হাঁচর-পাঁচর করে এগোতে লাগলো।

তোত্তো-চান বুঝতে পারছিলো যে, যদিও তাকাহাশির ইয়াসুয়াকি-চানের মতন পোলিও হয়নি, তবু ওরও চলতে একই রকম সময় লাগে। ও চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলো। তাকাহাশি সাধ্যমতন জোরেই চলছিলো, তাই আর বাড়তি তাড়া দেবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। ওর পা দুটো এমনিতেই খুব ছোট, তায় আবার ধনুকের মতন বাঁকানো। বড়রা জানতেন, স্কুলের শিক্ষকরাও, যে ওর শরীরটা আর বড় হবে না। তোত্তো-চান ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে তাকাহাশি ওর হাত দুটো দুলিয়ে দুলিয়ে আরো জোরে ছোটার চেষ্টা করতে লাগলো। দরজায় পৌঁছে ও তোত্তো-চানকে বললো, 'তুমি কিন্তু দারুণ ছোটো!' তারপর তাকাহাশি বললো, 'আমার বাড়ি ওসাকায়।'

'ওসাকা!' তোত্তো-চান দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ওর কাছে ওসাকা ছিলো একটা স্বপ্ন-শহরের নাম। ওর ছোট মামা, যে কি না তখন কলেজে পড়ে, সে ওদের বাড়িতে এলেই ওর মাথাটা ধরে ওপরে তুলে বলতো, 'তোকে আমি ওসাকা দেখাবো। পাচ্ছিস দেখতে ওসাকা?'

এটা ছিল ছোটদের সঙ্গে বড়দের একটা খেলা, কিন্তু তোত্তো-চান ছোটমামার কথাটা বিশ্বাস করতো। ওইভাবে মাথা ধরে টেনে তোলার ফলে গাল টনটন করতো, চোখেও ব্যথা করতো, তবু ও ভাবতো যে খুব ভালো করে তাকালে হয়তো সত্যিই ওসাকা শহরটাকে দেখতে পাবে। কিন্তু কখনোই পেতো না দেখতে। তবু ছোটমামা এলে তোত্তো-চান আবদার করতো, 'ওসাকা দেখাও, ওসাকা দেখাও!' সেই ওসাকায় তাকাহাশির বাড়ি, ওর সেই স্বপ্ন-শহরে!

'আমাকে ওসাকার গল্প বলো,' তোত্তো-চান বললো।

'ওসাকা?' তাকাহাশির মুখে একটা সুন্দর হাসি মাখানো ছিলো। গলার স্বরটা বড়দের মতন, ঝরঝরে। ঠিক তখনই প্রথম পিরিয়ড শুরু হবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। 'এ যাঃ,' তোত্তো-চান আফসোসের সুরে বললো। তাকাহাশি বেশ খুশি মনে, শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে সামনের সারিতে গিয়ে বসলো। ব্যাগের আড়ালে ওর গোটা শরীরটাই যেন ঢেকে গিয়েছিলো। তোত্তো-চান তাড়াতাড়ি করে ওর পাশে গিয়ে

বসলো। ওর তাকাহাশিকে ছেড়ে যেতে একটুও ইচ্ছে করছিলো না। সেই থেকেই তোত্তো-চান তাকাহাশির খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেলো।

দেখে চলো!

স্কুল থেকে ফেরার পথে, বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে তোত্তো-চান দারুণ একটা জিনিস দেখতে পেলো। রাস্তার ধারে মস্ত উঁচু একটা বালির পাহাড়। সমুদ্র থেকে এত দূরে বালি? কী আশ্চর্য! তোত্তো-চানের ভারি আনন্দ হলো। একবার একটু লাফিয়ে নিয়ে ও একছুটে পাহাড় চূড়োয় ওঠার চেষ্টা করলো। কিন্তু, কোথায় ঝুরঝুরে বালি? এ তো জল দিয়ে সিমেণ্ট আর বালি মাখানো প্লাস্টার! ছপ্! স্কুল ব্যাগ আর জুতোর ব্যাগ সমেত ও বুক পর্যন্ত ডুবে গেলো ওই সিমেণ্ট-মাখাতে, ওকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন একটা পাথরের মূর্তি! যতই চেষ্টা করে নিজেকে টেনে তোলার ততই তলিয়ে যেতে থাকে ওই প্লাস্টারের তালের মধ্যে। পায়ের জুতোও তো খোলার উপক্রম; তোত্তো-চান খুব চেষ্টা চালাতে লাগলো যাতে সম্পূর্ণ ডুবে না যায়। অতএব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না ওর, বাঁ হাতে জুতোর ব্যাগ ধরা আর সেই শুদ্ধই হাতটা সিমেণ্টে মাখামাখি। দু একজন অপরিচিত মহিলা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের ও ডেকে বললো 'একটু শুনবে, একটু শুনবে'? তাঁরা মনে করলেন তোত্তো-চান বুঝি খেলা করছে, তাই একটু হেসে চলে গেলেন।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হবার মুখে মা তোত্তো-চানের খোঁজে বেরিয়ে দেখেন এই কাণ্ড! তখন একটা লম্বা বাঁশ জোগাড় করে, তোত্তো-চানকে তার একটা দিক ধরতে বলে অন্য দিকটা খুব জোরে টানতে লাগলেন মা। কিন্তু ওঁর নিজের পা-ই যে প্লাস্টারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলো। ততক্ষণে তোত্তো-চান আপাদমস্তক সিমেণ্ট মেখে এক টুকরো দেয়াল হয়ে গেছে।

'আমি তোমাকে আগে একবার বলেছিলাম না যে কোনো কিছুর ওপর ঝাঁপ দেবার আগে একবার একটু ভালো করে দেখে নেবে যে জিনিসটা কী?' মা বললেন। যে ঘটনার কথা মা বলছিলেন তা ঘটেছিলো একদিন স্কুলে খাওয়াদাওয়ার ওই সময়টাতে। সেদিন দুপুরে তোত্তো-চান হলঘরের পেছনের রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছিলো। পথের মধ্যে একটা খবরের কাগজ পড়ে থাকতে দেখে ও ভাবলো, একটা লাফ দিয়ে এটার ওপরে এসে পড়লে বেশ মজা হবে। যেই না ভাবা অমনি ও পিছিয়ে গিয়ে ছুটে এসে পড়লো কাগজের মাঝখানে। আর অমনি ও পড়ে গেলো বাথরুমের নোংরার ট্যাঙ্কের ভিতরে। মানে, যে ট্যাঙ্কে একবার ওর পয়সার থলেটা পড়ে গিয়েছিলো। আসলে, ট্যাঙ্কের ঢাকনাটা সেদিন কেন যেন খোলা ছিলো, তাই দারোয়ানজি ওর ওপর একটা কাগজ পেতে রেখেছিলো, যাতে বাজে গন্ধটা বেশি দূর না ছড়ায়। ইস্! কী বিভৎস একটা কাণ্ডই যে ঘটেছিলো সেদিন! শেষে অনেক ধুয়ে, মুছে, ঘসে মেজে, তবেই না চেনা

তোত্তো-চানটাকে ফিরে পাওয়া গিয়েছিলো! মা সেই দিনটার কথাই বলছিলেন।

'আমি আর কোনোদিন কোনো কিছুর ওপরে ওইভাবে লাফ দেবো না,' তোত্তো-চান মাথা নিচু করে বললো। মা একটু আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই ও যা বললো তাতে মা বুঝতে পারলেন যে নিশ্চিন্ত হবার মতন তেমন কিছু আসলে ঘটেনি। 'আমি আর কোনোদিন কোনো খবরের কাগজ বা বালির পাহাড়ের ওপর লাফ দেবো না,' তোত্তো-চান বললো। অর্থাৎ, অন্য কিছুর কথা ঠিক বলা যাচ্ছে না!

দিনের আলো ক্রমে কমে আসছিলো। ওরা যতক্ষণে বাড়ি গিয়ে পৌঁছলো ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে।

তারপর...ইয়ে...মানে...

দুপুরের খাওয়ার সময়টা তোত্তো-চানের সব সময়ই খুব ভালো লাগতো, আর এখন তো হেডমাস্টারমশাই একটা নতুন খেলা চালু করেছেন।

আগের মতনই এখনো পঞ্চাশজনের টিফিনবাক্সের ভেতরে 'সাগর থেকে, পাহাড় থেকে' খোঁজা হয়, হেডমাস্টারমশাইয়ের পেছনে ওঁর স্ত্রী গামলা হাতে টহল দেন। এখনো খাওয়া শুরু হবার আগে সবাই মিলে 'চিবোও চিবোও' গানটা গেয়ে নেয়, তারপর দস্তুর মতন 'ইতাদাকিমাসু' বলে খাওয়া শুরু হয়। এর সঙ্গে এখন আবার একটা নতুন ব্যাপার জুড়েছে। প্রতিদিন এখন ওদের কাউকে না কাউকে একটা বক্তৃতা দিতে হয়।

একদিন হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'আমার মনে হয় আমাদের সকলেরই ভালো করে কথা বলতে শেখা উচিত। তোমরা কী বলো? এখন থেকে খাবার সময় একজন কেউ হলঘরের মাঝখানের গোল জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলবে। ঠিক আছে?'

কারো মনে হলো, নিজে ভালো করে কথা বলতে না পারলেও অন্যদের কথা তো শোনা যাবে! কারো কারো মনে হলো, বেশ তো সকলকে গল্প শোনানো যাবে! তোত্তো-চান ঠিক জানতো না ও কী বলবে, তবু চেষ্টা করে দেখতে তো অসুবিধে নেই? বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরেই আইডিয়াটা বেশ পছন্দ হচ্ছিলো। ঠিক হলো, পরদিন থেকেই চালু হবে বক্তৃতা দেওয়া।

এমনিতে জাপানের শিশুদের খাবার সময় কথা বলা বারণ। কিন্তু, হেডমাস্টারমশাই বহু দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং সেই দেশ দেখার অভিজ্ঞতা থেকে ওঁর মনে হয়েছিলো, খাবার সময় গল্প করাটা খুব ভালো ব্যাপার। ছেলেমেয়েদের ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে খাবার খেতে বলতেন উনি। তাছাড়া, ওঁর মনে হয়েছিলো যে অনেকের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শেখাটা খুব দরকার। তাই ওঁর মাথায় এই বক্তৃতার আইডিয়াটা এসেছিলো। ছেলেমেয়েরা রাজি হবার পর হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'দারুণ কিছু একটা বলতে হবে, তার কিন্তু কোনো মানে নেই। তোমাদের যা ইচ্ছে,

তা-ই বলতে পারো। যা তোমাদের করতে ইচ্ছে করে, সে বিষয়ে—একবার চেষ্টা করে দেখতে তো ক্ষতি নেই, তাই না?' তোত্তো-চান খুব মন দিয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা শুনেছিলো।

কে আগে বলবে, কে পরে, তার একটা তালিকা করা হলো। ঠিক হলো, যার যেদিন কথা বলার থাকবে, সেদিন গান শেষ হলে সে তাড়াতাড়ি করে খাবারটা খেয়ে নেবে।

দুদিনের মধ্যেই ছেলেমেয়েরা বুঝতে পেরেছিলো যে এক আধজন বন্ধুর সঙ্গে খাবার সময় গল্প করাটা এক কথা, কিন্তু গোটা স্কুলের সামনে কথা বলাটা অত সহজ নয়, তার জন্যে বেশ সাহসের প্রয়োজন হয়। কয়েকজন তো লজ্জার চোটে কেবল হেসেই চলছিলো। একটি ছেলে দিব্যি একটা বক্তৃতা দেবে বলে মনে মনে তৈরি হয়ে এসেছিলো—কী বলবে, কীভাবে বলবে, সব ঠিক করা ছিলো, কিন্তু কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালো যেই অমনি সব গেলো গুলিয়ে। বার কয়েক বক্তৃতার শিরোনামটা বলে আর বেশি দূর এগোতে পারলো না বেচারা। 'ব্যাঙেরা কেন আড়াআড়িভাবে লাফায়'—অন্তত তিনবার এটা বলার পর ও শুরু করলো, 'বৃষ্টি পরে যখন...' তারপর তার কোনো কথা খুঁজে পেলো না ছেলেটা। শেষে 'ব্যাস্



এইটুকুই, নমস্কার,' বলে ও নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়লো।

তোত্তো-চানের তখনো বলার সময় আসেনি, তবু ও ঠিক করে রেখেছিলো যে ওর প্রিয় রাজপুত্র রাজকন্যার গল্পটাই আবার বলবে। সবাই গল্পটা জানতো, তাই যখনই ও গল্পটা বলতে শুরু করতো তখনই ছেলেমেয়েরা বলে উঠতো, 'আর শুনবো না ওই গল্প'! সে যাই হোক, তবুও ও ওই গল্পটাই বলবে বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো।

এই নতুন খেলাটা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় একদিন একটি ছেলে বললো যে সে কিছুই বলবে না। 'আমার কিচ্ছু বলার নেই,' সে বললো। কথাটা শুনে তোত্তো-চান খুব অবাক হয়ে ভাবলো, কেমন করে কারো বলার মতন কিছু না থাকতে পারে? কিন্তু সেই ছেলেটির সত্যি সত্যিই কিছু বলার ছিলো না। খাওয়া শেষ করে নিজের খালি টিফিন বাক্সটা সামনে নিয়ে ও বসে রইলো। হেডমাস্টারমশাই তখন এগিয়ে গিয়ে ওর কাছে দাঁড়ালেন।

'তোমার তাহলে কিছুই বলার নেই?'

'না।'



ছেলেটি কিন্তু কোনো চালাকি করছিলো না, ও সত্যিই বলার মতন কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলো না। হেডমাস্টারমশাই ওঁর ফোকলা দাঁতের পরোয়া না করে হা হা করে হেসে উঠলেন।

'বেশ, তোমায় তাহলে বলার মতন কিছু একটা কথা খুঁজে দেয়া যাক।'

'কথা খুঁজে দেবে?' ছেলেটি অবাক হয়ে বললো।

হেডমাস্টারমশাই ওকে তুলে এনে মাঝখানে, গোল জায়গাটাতে দাঁড় করিয়ে দিলেন, আর নিজে ওর জায়গায় গিয়ে বসে পড়লেন।

'মনে করে দ্যাখো তো? আজ সকালে স্কুলে আসবার আগে তুমি কী করেছিলে? প্রথমে কী করলে, ভাবো তো?'

'আমি...মানে...' ছেলেটি মাথা চুলকোতে লাগলো।

'চমৎকার! তাহলে তো তোমার অন্তত কিছু একটা বলার ছিলো! এই তো 'আমি...মানে...' বললে! তো, 'আমি...মানে...'র পর কী হলো?'

'মানে...ইয়ে...আমি ঘুম থেকে উঠলাম,' ও আরো জোরে মাথা চুলকোতে লাগলো। তোত্তো-চান আর ওর বন্ধুরা খুব মজা পাচ্ছিলো; ওরা মন দিয়ে ছেলেটির কথা শুনতে লাগলো। 'তারপর...মানে...' ছেলেটি আবার মাথা চুলকোল। ডেস্কের ওপর হাত দুটো জড়ো করে রেখে হেডমাস্টারমশাই হাসি হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'খুব ভালো কথা। তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। তুমি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেছিলে, এটা তো সকলকে বোঝাতে পেরেছো? দ্যাখো, ভাল কথা বলতে পারার জন্য তোমাকে দারুণ মজার কিছু বলতে হবে, যাতে সবাই বেশ হাসতে পারে, এমন কিন্তু নয়। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, তুমি বলেছিলে তোমার কিছুই বলার নেই, কিন্তু বলার মতন কিছু একটা কথা তো তুমি খুঁজে পেলে, তাই না?'

ছেলেটি কিন্তু বসে পড়লো না। এবার ও বেশ গলা চড়িয়ে বললো, 'তারপর...মানে...' সবাই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর কথা শুনতে লাগলো। মস্ত করে একটা শ্বাস টেনে নিয়ে ও বলতে লাগলো, 'তারপর...মানে...ইয়ে...মা...মানে...মা বললেন 'দাঁত মাজো' ইয়ে...আর আমি দাঁত মাজলাম।'

হেডমাস্টারমশাই হাততালি দিয়ে উঠলেন। ছেলেমেয়েরাও সবাই হাততালি দিতে থাকলো। এর ফলে ছেলেটি আর একটু জোর গলায় বলতে থাকলো, 'তারপর...ইয়ে...' হাততালি থামিয়ে আর একটু সামনের দিকে ঝুঁকে সবাই প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগলো। শেষে ছেলেটি বেশ বিজয়ীর মতন বলে উঠলো, 'তারপর...মানে...আমি স্কুলে চলে এলাম!'

একটি ছেলে তো এমনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কথা শুনছিলো যে ওর নাকটা সটান গিয়ে টিফিনবাক্সে ধাক্কা খেলো! যাই হোক, সবাই তখন বেজায় খুশি যে

ছেলেটি বলার মতন কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে। হেডমাস্টারমশাই খুব জোরে হাততালি দিতে লাগলেন সাথে তোত্তো-চান আর ওর বন্ধুরাও। আর সেই 'ইয়ে...মানে...' ছেলেটি, যে তখনো সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, সেও হাততালি দিয়ে উঠলো। হাততালির শব্দে হলঘরটা গমগম করতে লাগলো। অনেক বড় হয়ে যাবার পরও হয়তো ছেলেটি সেদিনের সেই হাততালির শব্দ ভুলতে পারেনি।

আমরা তো শুধু খেলছিলাম!

একটা ভয়ানক দুর্ঘটনায় তোত্তো-চান খুব বিচ্ছিরিভাবে জখম হলো। ঘটনাটা ঘটলো ওর স্কুল থেকে ফেরার পর, রকির সঙ্গে 'নেকড়ে নেকড়ে' খেলার সময়।

খেলাটা শুরু হয়েছিলো এইভাবে : ঘরের দুই প্রান্ত থেকে দুজনে গড়িয়ে এসে এ ওর গায়ে ধাক্কা খেয়ে, জড়াজড়ি করে হুটোপুটি করছিলো, তারপর আবার ওরা ছিটকে যাচ্ছিলো, আবার গড়িয়ে আসছিলো—এইভাবে খেলাটা চলছিলো। এক সময় ওদের মনে হলো—ওদের মনে হলো মানে তোত্তো-চানেরই মনে হলো আর কি—যে এই খেলাটাকে আর একটু জটিল করা যাক। ও ঠিক করলো, ঘরের দুদিক থেকে গড়িয়ে এসে দুজন যখন মুখোমুখি হবে, তখন দুজনেই নেকড়ের মতন ভঙ্গী করবে। যে বেশি ভালো নেকড়ে হতে পারবে, সে-ই খেলায় জিতবে। এখন, রকি ছিলো জার্মান শেপার্ড জাতের কুকুর, ফলে নেকড়ে সাজা ওর পক্ষে কিছুই কঠিন কাজ ছিলো না। কেবল কান দুটো খাড়া করে, মুখ খুলে দাঁত বার করলেই ওকে দিব্যি নেকড়ে নেকড়ে লাগতো দেখতে। ও ওর চোখ দুটোও বেশ রাগ রাগ ভাব করতে পারতো। ওদিকে, তোত্তো-চানের জন্য কাজটা একটু কঠিন ছিলো। হাত দুটো ওপর দিকে তুলে কান খাড়া করার ভঙ্গী করে, মুখ খুলে, গর্‌র্ গর্‌র্ শব্দ করে ও তেড়ে এসে রকিকে কামড়ানোর ভাব করছিলো। প্রথম দিকটাতে রকি বেশ ভালোই খেলছিলো, কিন্তু বেচারা তো নেহাতই একটা কুকুরছানা, তাই খানিক বাদে খেলা ভুলে গিয়ে ও সত্যি সত্যিই তোত্তো-চানকে বেশ জোরে কামড়ে দিলো। ছানা হলে কী হবে, চেহারায় তো তোত্তো-চানের ডবল, আর গায়ের জোরেও। এছাড়া ওর দাঁতগুলো ছিলো খুব ধারালো। ফলে, কিছু বুঝবার আগেই তোত্তো-চানের ডান কানটা ওর মাথা থেকে ঝুলে পড়লো আর আঝোরে রক্ত পড়তে লাগলো। চিৎকার শুনে মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে দেখেন যে মেয়ে দুহাত দিয়ে ডান কানটা ধরে ঘরের এক কোণে বসে আছে, সঙ্গে রকি। আর, তোত্তো-চানের জামা রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। বাবা বাইরের ঘরে বেহালা প্র্যাকটিস করছিলেন, চিৎকার শুনে ছুটে এলেন। রকি যেন বুঝতে পারছিলো যে একটা ভয়ানক গণ্ডগোল করে ফেলেছে, তাই দুপায়ের ফাঁকে ল্যাজ গুঁজে করুণ চোখে তোত্তো-চানের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

তোত্তো-চানের তখন একটাই চিন্তা। বাবা মা যদি রাগ করে রকিকে তাড়িয়ে

দেন? বা আর কারো কাছে দিয়ে দেন? সে তো ওর জীবনের সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা হবে। তাই, এদিকে হাত দিয়ে ডান কানটা ধরা, ওদিকে সে রকির পাশে বসে কেবলই কেঁদে চলেছে: 'রকিকে বোকো না, রকিকে বোকো না!'

মা আর বাবার জন্য তখন ওর কানটা পরীক্ষা করা বেশি জরুরি ছিলো, কিন্তু তোত্তো-চান তো কিছুতেই হাত সরাবে না। ও কেবল একটাই কথা বলে চলেছে: 'আমার ব্যথা করছে না। রকির ওপর রাগ কোরো না। রকিকে বোকো না।' বস্তুত, তখন তোত্তো-চানের কোনো ব্যথার অনুভূতি ছিলোও না। ওর মাথায় তখন একটা চিন্তা ঘুরছিলো—রকির কী হবে?

মা বাবা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে ঘটনাটা কী ঘটেছে। রকি নিশ্চয় তোত্তো-চানকে কামড়ে দিয়েছে। ওর কান থেকে তখনো রক্ত পড়ে চলেছে। কানটা দেখতে হবে তো! তাই ওঁরা কথা দিলেন যে, না, রকিকে কিছু করা হবে না। তখন মেয়ে কান থেকে হাতটা সরাতে রাজি হলো। কানটা দেখে মা তো একেবারে আঁতকে উঠলেন। বাবা ছোট্ট তোত্তো-চানকে কোলে তুলে নিয়ে ডাক্তারখানার দিকে ছুটতে লাগলেন। মা সামনে সামনে ছুটছিলেন।

ভাগ্যে সময় মতন ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়েছিলো! তাই তো কানটাকে আবার ঠিক আগের মতন করে সেলাই করে জুড়ে দেওয়া গেলো। বাবা মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। কিন্তু তোত্তো-চানের মাথায় তখনো একই চিন্তা—মা বাবা যে বলেছিলেন রকিকে বকবেন না, ওঁরা কথাটা রাখবেন তো?

মাথা থেকে চিবুক পর্যন্ত সাদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় তোত্তো-চান যখন বাড়ি ফিরলো, তখন ওকে একটা সাদা খরগোশের মতন দেখতে লাগছিলো। যদিও বাবা কথা দিয়েছিলেন যে রকিকে বকবেন না, তবু কুকুরটাকে আচ্ছা করে একটু শিক্ষা দিতে ইচ্ছে করছিলো খুব। কিন্তু মায়ের চোখ যেন বলতে চাইলো, 'তুমি না কথা দিয়েছিলে?' বাবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুপ করে রইলেন।

এদিকে, তোত্তো-চান তো বাড়িতে ঢুকেই রকিকে জানাতে চাইছিলো যে সব ঠিক আছে, তেমন কিছু হয়নি আর, ওকে কেউ বকবেও না। কিন্তু, কোথায় রকি? রকি? রকি? এই প্রথম তোত্তো-চান কেঁদে ফেললো। ও ডাক্তারের কাছে গিয়ে একবারও কাঁদেনি, কারণ ওর ভয় ছিলো যে তাতে বাবা মায়ের রকির ওপর রাগ বেড়ে যেতে পারে! কিন্তু এবার ওর চোখের জল আর আটকানো যাচ্ছিলো না। কাঁদতে কাঁদতে ও ডাকতে থাকলো, 'রকি, রকি, কোথায় তুই?'

অনেকবার ডাকার পর যখন সেই চেনা খয়েরি শরীরটা সোফার পেছন থেকে বেরিয়ে এলো তখন তোত্তো-চানের কান্না-ভেজা মুখে হাসি ফুটলো। রকি আস্তে করে গিয়ে ওর ভালো কানটাকে একটু চেটে দিলো—ব্যাণ্ডেজের ভেতর থেকে সামান্য একটু বেরিয়ে ছিলো কানটা। দু হাত দিয়ে রকিকে জড়িয়ে ধরে তোত্তো-চান ওর

কানের ভেতরে মুখ গুঁজে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো। মা আর বাবা বলতেন রকির কানের ভেতরে বিচ্ছিরি গন্ধ, কিন্তু গন্ধটা তোত্তো-চানের কী ভালোই না লাগতো!

রকি আর তোত্তো-চান, দুজনেরই সেদিন ক্লান্তির চোটে খুব ঘুম পেয়ে গিয়েছিলো।

গরমকাল শেষ হতে চলেছিলো। আকাশে একটা গোল চাঁদ আর নিচে সাদা ব্যাণ্ডেজে মোড়া একটা ছোট্ট মেয়ে আর তার ছোট্ট কুকুর। সেদিন সেই ছোট্ট কুকুরটা মনে মনে সংকল্প করেছিলো, আর কোনোদিন 'নেকড়ে নেকড়ে' খেলবে না। গ্রীষ্ম-শেষের গোল চাঁদ দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলো। তোত্তো-চান আর রকি সেদিন দুজন দুজনের আরো ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলো।

স্পোর্টস

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের তিন তারিখে তোমোইতে স্পোর্ট্স হতো। অনেক গবেষণার পর হেডমাস্টারমশাই এই দিনটাকে বার্ষিক খেলাধূলোর দিন হিসেবে বেছেছিলেন, কারণ উনি দেখেছিলেন যে ওই দিনটতে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম থাকে। কী জানি কীভাবে উনি এই ব্যাপারটা বুঝেছিলেন? হয়তো নভেম্বরের তিন তারিখকে শরতের শেষ দিন মনে করা হতো বলে হেডমাস্টারমশাই এই দিনটিকে বেছেছিলেন? কিংবা হয়তো আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করে করে উনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন? এমনো হতে পারে যে মেঘের দল ঠিক করেছিলো শিশুদের এই আনন্দ উৎসবটিকে মাটি করবে না—আহা রে, কত না উৎসাহের সঙ্গে ওরা ওদের স্কুলকে সাজিয়ে তুলতো এই স্পোর্টসের জন্য!

আশ্চর্য! এই দিনটাতে কিন্তু সত্যিই কখনো বৃষ্টি হতো না!

তোমোইতে সব কিছুই ছিলো অন্যরকম, বার্ষিক খেলাধূলার অনুষ্ঠানটিও। যে দুটি খেলা অন্য স্কুলেও হতো তা ছিল 'টাগ অফ ওয়ার' (দড়ি টানাটানি) আর তিন-পায়ের দৌড়। বাকি সব খেলাই ছিলো হেডমাস্টারমশাইয়ের নিজস্ব আবিষ্কার। তেমন কোনো বিশেষ জিনিসেরও দরকার হতো না, রোজকার ব্যবহারের সামগ্রী দিয়েই সেই সব খেলার আয়োজন করা যেতো।

যেমন ধরো, 'কার্প রেস'। কয়েকটা লম্বা আর রংচঙে কাপড়ের কার্প মাছ মাটিতে শোয়ানো থাকতো। যেমন কার্প মাছ মে মাসের 'বয়েজ ডে' উৎসবের দিন বাঁশের খুঁটি থেকে টাঙানো হয়, ঠিক তেমনি। বাঁশি বাজালেই ছেলেমেয়েদের কাপড়ের কার্পের দিকে ছুটে গিয়ে, মাছের গোল মুখের ভেতর দিয়ে পেটে চলে গিয়ে একেবারে ল্যাজ দিয়ে বেরিয়ে আসতে হতো। তারপর আবার খেলা শুরুর জায়গায় ফিরে যেতে হতো। তিনটে কার্প মাছ, একটা লাল আর দুটো নীল। তাই এক এক রাউণ্ডে কেবল তিনজন করে খেলতে পারতো। দেখতে সহজ লাগলেও খেলাটা ছিলো বেশ শক্ত। মাছের পেটের ভেতরটা অন্ধকার, ওদিকে মাছগুলো আকারে খুব লম্বা। তাই

অনেক সময়ই ছেলেমেয়েদের বোঝার উপায় থাকতো না ল্যাজ না মুড়ো, কোন দিকে তারা চলেছে। তোত্তো-চান সহ বেশ কয়েকজন অনেক দূর পর্যন্ত হামা দিয়ে চলার পর বুঝতে পারতো যে ওরা মাথার দিকটাতেই ফিরে যাচ্ছিলো, তখন আবার ঘুরে গিয়ে হামা দিতে শুরু করতে হতো। বাইরে থেকে খেলাটা দেখতে ভারি মজার ছিলো; মাছের পেটের ভেতরে ছেলেমেয়েরা দিক পাল্টাচ্ছে, হামা দিচ্ছে—মনে হতো তিনটে জ্যান্ত কার্প মাছ আঁকাবাঁকা হয়ে চলছে বুঝি।

আর একটা খেলার নাম ছিলো 'মায়ের খোঁজে'। বাঁশি বাজামাত্র ছেলেমেয়েদের আড়াআড়ি করে দাঁড় করানো একটা মই-এর ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে, ওপারে রাখা একটা ঝুড়ি থেকে একটা করে খাম তুলে নিয়ে, সেটা খুলে, ভেতরের কাগজটা পড়ে নিতে হতো। ধরো, তাতে যদি লেখা থাকতো 'সাক্কো-চানের মা', তখন যে সেই কাগজটা পেতো, তাকে ছুট্টে গিয়ে দর্শকের আসন থেকে সাক্কো-চানের মাকে খুঁজে নিয়ে, তাঁর হাত ধরে ছুটে গিয়ে দৌড়টা শেষ করতে হতো। মই-এর ভেতর দিয়ে গলে যাবার সময় খুব সাবধানে, বেড়ালের মতন নিপুণভাবে চলতে হতো, নয়তো পেছনটা মই-এর ফাঁকে আটকে যেতে পারতো। তাছাড়া, সাক্কো-চানের মাকে হয়তো বাচ্চারা চিনতো, কিন্তু কাগজে যদি লেখা থাকতো 'মিস ওকুর বোন' বা 'মিস্টার ৎসুর মা' বা 'মিসেস কুনিনোরির ছেলে', যাঁদের সঙ্গে ওদের কখনোই দেখা হয়নি, তখন ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ডাক দিতে হতো 'মিস ওকুর বোন' বলে। এটা করতে সাহসের প্রয়োজন হতো। কেউ যদি ঘটনাচক্রে নিজের মায়ের নাম লেখা কাগজটাই তুলতো, তাহলে তো কথাই নেই! অমনি সে লাফাতে লাফাতে মাকে এসে বলতো, 'মা, মা, চলো!' দর্শকদেরও এই খেলাটার সময় সতর্ক থাকতে হতো। কখন যে কার ডাক পড়বে কে জানে? আর, নাম ডাকা মাত্র তো বেঞ্চ বা মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, ভিড়ের মধ্যে একটু পথ করে নিয়ে, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গিয়ে অপেক্ষা করা বাচ্চাটির হাত ধরে ছুটে গিয়ে দৌড়টা শেষ করতে হতো। তাই যখনই কেউ একজন এসে দর্শকদের সামনে দাঁড়াতো তখন এমন-কি বাবারা পর্যন্ত দম বন্ধ করে নামটা শোনার জন্য অপেক্ষা করতেন, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব বা টুকটাক কিছু খাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতো না। শিশুদের মতন বড়দেরও প্রায় সমানভাবেই খেলায় যোগ দিতে হতো।

হেডমাস্টারমশাই আর অন্য শিক্ষকরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দু দলে ভাগ হয়ে গিয়ে টাগ-অফ-ওয়ার খেলতেন। সবাই মিলে দড়ি ধরে টানাটানি করতো আর 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' বলে চেঁচাতো। ইয়াসুয়াকি-চানের মতন যাদের দড়ি টানাটানিতে অসুবিধে, তাদের কাজ ছিলো দড়ির মাঝখানে বাঁধা রুমালটা কোন দিকে বেশি চলে যাচ্ছে এবং ফলে কোন দল জিতছে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

শেষের খেলাটা ছিলো 'রিলে রেস'। এতেও গোটা স্কুল যোগ দিতো, কিন্তু এই খেলাটাও তোমোইতে অন্যভাবে খেলা হতো। খুব বেশি দূর পর্যন্ত কাউকেই দৌড়তে

হতো না। প্রত্যেককে হলঘরে যাবার যে গোল সিঁড়ি আছে তা দিয়ে একবার উঠতে হতো, একবার নামতে হতো। আপাত দৃষ্টিতে দেখতে তো জলের মতন সোজা, কিন্তু খেলাটা আসলে খুব একটা সহজ ছিলো না। গোল সিঁড়িগুলো ছিলো খুব গায়ে গায়ে লাগানো, সিঁড়ির ধাপটা বিশেষ বড় ছিলো না। তাছাড়া, নিয়ম ছিলো যে এক এক ধাপের বেশি সিঁড়ি এক একবারে পেরোনো যাবে না। কাজটা সহজ ছিলো না, বিশেষ করে যাদের পা লম্বা ছিলো, তার জন্য। তাই, রোজ যে সিঁড়ি দিয়ে ওরা দুমদাম করে ওঠানামা করতো, স্পোর্টসের দিনে সেই সিঁড়িগুলোই কেমন যেন পাল্টে যেতো। ছেলেমেয়েরা সব হাসতে হাসতে, চেঁচাতে চেঁচাতে ওপর নিচ করতে লাগতো। দূর থেকে দেখলে মনে হতো যেন একটা রং-এর মিছিল, একটা রকমারি কাচের ক্যালাইডোস্কোপ। সব মিলিয়ে গোল সিঁড়ি ছিলো আটটা।

তোত্তো-চানের প্রথম স্পোর্টসের দিনটিও চমৎকার মেঘমুক্ত ছিলো, যেমনটা হেডমাস্টারমশাই প্রত্যাশা করেছিলেন। আগের দিন ছেলেমেয়েরা রঙিন কাগজ কেটে শিকল আর তারা বানিয়ে চারদিকে টাঙিয়ে দিয়েছিলো, ওদিকে আবার জমজমাট সব সুর বাজছিলো গ্রামাফোনে—সব মিলে বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব!

তোত্তো-চান ছোট্ট কালচে-নীল রং-এর শর্ট্‌স্ আর সাদা ব্লাউজ পরে এসেছিলো। ওর আসল ইচ্ছে অবশ্য ছিলো 'অ্যাথলেটিক ব্লুমার' পরার, মানে যে ছোট প্যান্টগুলোতে বেশ কুচি কুচি করা থাকে আর যা পরে মেয়েরা দৌড়য় বা অন্যান্য সব অ্যাথলেটিক্সের খেলা খেলে। খুব ইচ্ছে ওর ব্লুমার পরার! একদিন স্কুলে দেখেছিলো হেডমাস্টারমশাই কয়েকজন কিণ্ডারগার্টেনের দিদিমণিকে ইউরিদমিক্সের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। দিদিমণিরা সবাই ছোট ছোট কুচি দেয়া প্যান্ট পরেছিলেন। তোত্তো-চানের কী যে ভালো লেগেছিলো ওই প্যান্টগুলো! যখনই দিদিমণিরা জোরে পা দাপাচ্ছিলেন, অমনি ওদের পিছনগুলো দুলে দুলে উঠছিলো। এটাই তোত্তো-চানের দারুণ লেগেছিলো। তারপর, বাড়ি ফিরে ও ওর শর্ট্‌স্ পরে খুব করে মেঝেতে পা দাপাতে থাকলো। কিন্তু কিছুতেই ওর পিছনটা দুলে উঠছিলো না। বেচারা বাচ্চা মানুষ, তার শিশু শরীর কি আর বড়দের মতন দুলে উঠতে পারে? ও কিন্তু ধরে নিয়েছিলো যে ওই ছোট প্যান্টের জন্যই দিদিমণিদের শরীরে দুলুনি এসেছিলো। মাকে জিজ্ঞেস করাতে মা বললেন, 'ওই প্যান্টকে অ্যাথলেটিক ব্লুমার বলে।' তোত্তো-চান মাকে বলেছিলো যে ও ওই রকম ছোট প্যান্ট পরেই স্পোর্টসে যেতে চায়। কিন্তু অনেক খুঁজেও ওই ছোট মাপের ব্লুমার পাওয়া গেলো না। কী আর করা? ওকে শর্ট্‌স্ পরেই আসতে হলো। কিন্তু হায়! তাতে যে শরীর একটুও দুলে উঠলো না!

একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো ওই স্পোর্ট্‌সের দিনে। তাকাহাশি, যার কি না হাত-পাগুলো ওইরকম ছোট, ছোট ছিলো, স্কুলের সবচেয়ে বেঁটে মানুষ, সে-ই সব খেলায় প্রথম হতে থাকলো। একদম অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার! সবাই যখন কার্প মাছের

পেটের মধ্যে ঢুকে হাঁচড়পাচড় করছিলো, তাকাহাশি ততক্ষণে দৌড় শেষ করে ফেলেছিলো। মই-এর ভেতর দিয়ে যতক্ষণে বাকিরা কেবলমাত্র মাথাটুকু গলাতে পেরেছিলো, তাকাহাশি ততক্ষণে কোথায় কতদূরে পৌঁছে গিয়েছিলো। আর রিলে রেস? অন্যেরা তো কষ্ট করে এক ধাপ এক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলো, নামছিলো, কিন্তু তাকাহাশি বেশ তরতর করে উঠে, নেমে ওর দৌড় শেষ করে ফেলেছিলো। ঠিক যেন ছায়াছবির কোনো একটা অংশ একটু দ্রুত গতিতে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাই বললো, 'এই চল, তাকাহাশিকে হারাতেই হবে।' ওকে টপকে যাবার সংকল্প থাকলেও, কেউই ওকে হারাতে পারছিলো না। তোত্তো-চানও চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। সোজা পথে যেটুকু ছোটার ব্যাপার ছিলো তাতে তাকাহাশি পিছিয়ে পড়লেও জটিল ব্যাপারগুলোতে প্রতিবারই ও জিতে যাচ্ছিলো।

খুব খুশি হয়ে, গর্বে বুক ফুলিয়ে, তাকাহাশি পুরস্কার নিতে গেলো। ও সব কটা খেলাতেই প্রথম হয়েছিলো, তাই পুরস্কারের পর পুরস্কার পেতে লাগলো। সবারই একটুখানি হিংসে হচ্ছিলো। 'সামনের বছর আমি তাকাহাশিকে হারাবোই হারাবো'—মনে মনে এমন সংকল্প করলেও প্রতিবছরই তাকাহাশি সমস্ত পুরস্কার পেয়ে স্কুলের সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড় হয়ে গিয়েছিলো।

পুরস্কারের ব্যাপারটাও হেডমাস্টারমশাই নিজের মতন করে ভেবেছিলেন। প্রথম পুরস্কার একটা মস্ত মুলো, দ্বিতীয় পুরস্কার দুটো বার্ডকের শিকড়, তৃতীয় এক আঁটি পালং শাক—এই ধরনের সব জিনিস। অনেকদিন পর্যন্ত তোত্তো-চান মনে করতো যে, সব স্কুলেই বুঝি স্পোর্টসে এমন সব শাক-সবজি পুরস্কার দেওয়া হয়।

তখনকার দিনে বেশিরভাগ স্কুলেই নোটবই, পেন্সিল, রাবার ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়া হতো। তোমোই-র ছেলেমেয়েরা এই কথাটা জানতো না ঠিকই, তবু ওই মুলো আর বার্ডকের ব্যাপারটা ওদের একটুও ভালো লাগতো না। যেমন, ধরো তোত্তো-চান। কয়েকটা পেঁয়াজ আর এক জোড়া বার্ডকের শিকড় নিয়ে ট্রেনে করে বাড়ি ফিরতে ওর খুবই লজ্জা লাগছিলো। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ছাড়া কিছু বাড়তি পুরস্কারও দেওয়া হতো, ফলে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু একটা সবজি পেয়ে যেতো। কিন্তু সবজি নিয়ে বাড়ি ফিরতে এতো লজ্জাই বা কেন? মায়ের জন্য বাজার থেকে কিছু একটা কিনে আনতে তো কই লজ্জা করতো না ওদের? কিন্তু কী জানি কেন, স্কুল থেকে সবজি নিয়ে বাড়ি ফিরছে, ওদের মনে হতো এই ব্যাপারটা খুবই বোকা বোকা।

মোটা মতন একটি ছেলে একটা বাঁধাকপি পুরস্কার পেয়ে ভেবেই পাচ্ছিলো না সেটা নিয়ে ও কী করবে। 'আমি এটা নিতে চাই না, আমি এটা ফেলে দেবো,' ও বললো।

গাজর, মুলো ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অন্য ছেলেমেয়েরাও এই ধরনের কথাবার্তা বলছিলো। হেডমাস্টারমশাইয়ের কানেও নির্ঘাত কথাগুলো

পৌঁছেছিলো, কারণ উনি উঠে এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী হয়েছে বলো তো? তোমরা এগুলো নিতে চাও না বুঝি? খানিক থেমে থেকে উনি বললেন, 'মাকে গিয়ে এগুলো দিয়ে বোলো আজ রাতের জন্য কিছু একটা রান্না করতে। এই সবজিগুলো তো তোমরা নিজেরা নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে উপার্জন করেছো, তোমাদের বাড়ির সবার জন্য তোমরা নিজেরা কিছু একটা রোজগার করে নিয়ে যাচ্ছো আজ। এটা ভাবতে তোমাদের ভালো লাগছে না? এগুলো খেতে নিশ্চয় খুব ভালো লাগবে, দেখো!'

হেডমাস্টারমশাই ঠিকই বলেছিলেন। এই প্রথম তোত্তো-চান ওর বাড়ির জন্য কিছু একটা নিজে রোজগার করে নিয়ে যাবে, এ তো দারুণ ব্যাপার। 'আমি মাকে মশলাদার বার্ডক রাঁধতে বলবো!' হেডমাস্টারমশাইকে ও বললো। 'পেঁয়াজ দিয়ে কী করতে বলবো এখনো ভাবিনি।'

এবার অন্যেরাও ভাবতে শুরু করলো বাড়িতে সেই রাতে কী কী রান্না হতে পারে, সেই কথা, আর যে যার ভাবনা হেডমাস্টারমশাইকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো। 'চমৎকার! এবার তাহলে তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো?' বলে হেডমাস্টারমশাই খুব সুন্দরভাবে হাসলেন। ওঁর চোখ মুখ যেন আলোয় ঝলমল করে উঠলো। এই সবজিগুলো রান্না হবার পর ছেলেমেয়েদের বাড়িতে সবাই মিলে কেমন স্পোর্টসের গল্প করতে করতে রাতের খাবার খাবে, হয়তো মনে মনে সে কথাটাই ভাবছিলেন উনি।

তাকাহাশির কথাটাই যে বেশি করে ভাবছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ছেলেটার খাবার টেবিল তো সেদিন প্রথম পুরস্কারের সবজিতে বোঝাই হয়ে গিয়েছিলো নিশ্চয়। হেডমাস্টারমশাই ভাবছিলেন, ছেলেটার নিশ্চয় এই দিনটার কথা বেশি করে মনে থাকবে। ও যে এত বেঁটে, ও যে আর একটুও বাড়বে না, এই নিয়ে হীনমন্যতা তৈরি হবার আগে হয়তো ওর এই দিনটার কথা মনে পড়বে। কে জানে? এই যে অদ্ভুত সব খেলা, হয়তো ওর কথা ভেবেই এমন সব খেলার আবিষ্কার করেছিলেন হেডমাস্টারমশাই। যাতে তোমোই-র স্পোর্টসে তাকাহাশি সব কটা প্রথম পুরস্কার পেতে পারে।

কবি ইসসা

ছেলেমেয়েরা হেডমাস্টারমশাইকে ভালবেসে 'ইসসা কোবায়াশি' বলে ডাকতো। ভালবেসে ওঁর নামে ওরা একটা কবিতা লিখেছিলো :

ইসসা কোবায়াশি,
আমাদের খুব প্রিয়,
মাথায় মস্ত টাক!

উনিশ শতকের এক বিখ্যাত কবি ছিলেন ইসসা নামে, তাঁর পদবিও ছিল হেডমাস্টারমশাই-এর মতন—'কোবায়াশি'। এই ইসসা কোবায়াশির তিন লাইনের 'হাইকু' কবিতা হেডমাস্টারমশাই সোসাকু কোবায়াশি খুব ভালবাসতেন। ওদের এত বেশি শোনাতেন ইসসার কবিতা যে হেডমাস্টারমশাই-এর মতন ইসসাও ছেলেমেয়েদের কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন।

ইসসার কবিতায় একটা আশ্চর্য সততা আর গভীরতা ছিলো, যা হেডমাস্টারমশাইকে মুগ্ধ করতো। জীবনের ছোট্ট ছোট্ট সামান্য জিনিস নিয়ে লেখা কবিতা; সেই সময়কার অসংখ্য হাইকু কবির মাঝখানে ইসসা ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁর নিরাভরণ পদ্যের শিশুসুলভ সারল্য হেডমাস্টারমশাইকে খুব আকর্ষণ করতো, তাই একটু সুযোগ পেলেই উনি ছাত্রছাত্রীদের ইসসার কোনো একটা কবিতা শিখিয়ে দিতেন। ওরাও লাইনগুলো মুখস্থ করে নিতো। যেমন :

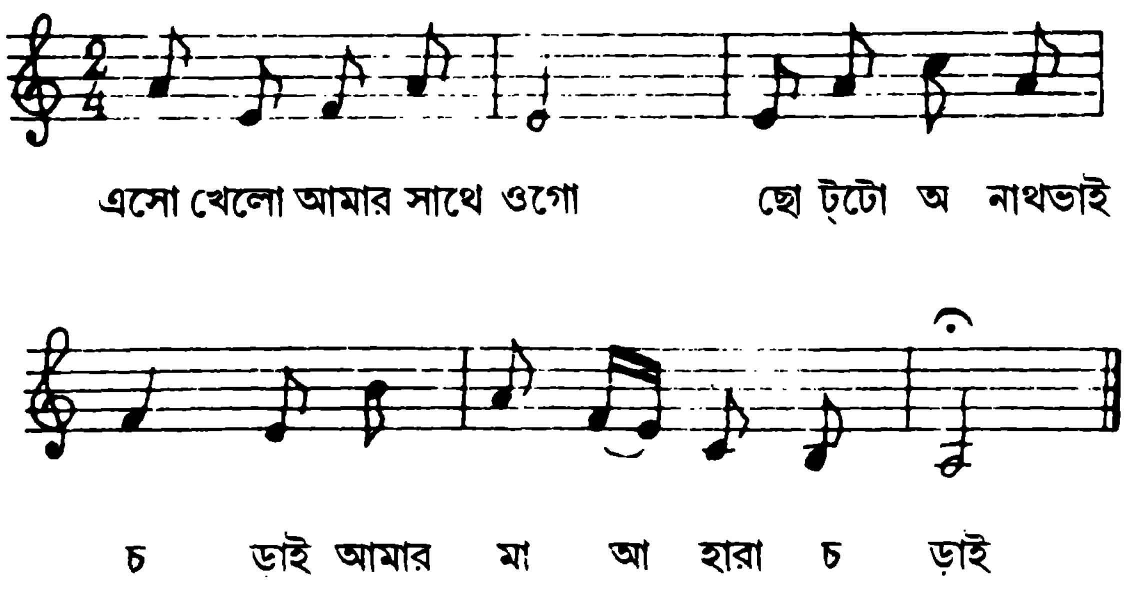
ও ভাই রোগা ব্যাঙ,
তুমি হেরো না যেন!
ইসসা আছে তোমার পাশে।

চড়াই, ছোট্ট চড়াই,
সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও,
ওই আসছে রাজার ঘোড়া!

মাছিটাকে ছেড়ে দাও।
হাত নিঙড়ে, পা নিঙড়ে
ও তো তোমার দয়াই চায়!

হেডমাস্টারমশাই একবার একটা হাইকুতে সুর দিয়েছিলেন, আর ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে গেয়েছিলো :

সোসাকু কোবায়াশি



অনেক সময় আবার হেডমাস্টারমশাই হাইকুর ক্লাস নিতেন, যদিও সেটা ঠিক পাঠ্যসূচির মধ্যে পড়তো না। তোত্তো-চান জীবনের প্রথম হাইকুটা লিখেছিলো নোরাকুরো সম্পর্কে। নোরাকুরো ছিলো ওর প্রিয় গল্পের চরিত্র—একটা কুকুর, যাকে নিয়ে একটা কমিক বেরুতো সে সময়কার একটি ছোটদের পত্রিকাতে। নোরাকুরো নাকি একজন সাধারণ সৈন্য হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো, তারপর ধীরে ধীরে চাকরীতে ওঠানামা করতে করতে অবশেষে বেশ উঁচু পদে চলে গিয়েছিলো।

নেড়িকুকুর ব্ল্যাক
চলেছে বিশ্বভ্রমণে,
এখন সে আর যুদ্ধে নেই বলে।

হেডমাস্টারমশাই বলেছিলেন, 'চেষ্টা করবে সহজ কিছু নিয়ে হাইকু লেখার। তুমি যা ভাবছো, তেমন কিছু নিয়ে লিখবে।'

তোত্তো-চানের কবিতাটাকে ঠিক হাইকু বলা চলে না। কিন্তু ওর মাথার মধ্যে তখন কেমন ভাবনা চলতো, তার একটা আভাস পাওয়া যায় ওই তিনটে লাইন থেকে। এমনিতে হাইকুতে ৫-৭-৫-এর একটা ছন্দ-ভাগ থাকার কথা, ওরটা ৫-৭-৭ হয়ে গিয়েছিলো। আসলে, ইসসার ছোট্ট চড়াই নিয়ে লেখা হাইকুটাতে ৫-৮-৭ ছন্দ ভাগ দেখে ও ভেবেছিলো ওরটাও বুঝি চলবে।

যেদিন ওরা কুহনবুৎসু মন্দিরে হাঁটতে যেতো, কিংবা যেদিন বৃষ্টি পড়তো বলে ওরা বাইরে খেলতে যেতে পারতো না আর সবাই মিলে হলঘরটাতে জড়ো হতো, সেদিন তোমোইর 'ইসসা কোবায়াশি' ওদের হাইকু শোনাতেন। মাঝে মাঝে হাইকু দিয়ে হেডমাস্টারমশাই নিজের মনের কথা প্রকাশ করতেন—জীবন আর প্রকৃতি সম্পর্কে ওঁর ভাবনা হাইকুর তিন লাইনের মধ্যে ফুটে উঠতো। মনে হতো ইসসার কিছু হাইকু যেন তোমোই-র জন্যেই লেখা হয়েছিলো :

বরফ গলে যায়—
হঠাৎ সারা গ্রামে
শিশুরা হেসে ওঠে।

বিরাট রহস্য

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে, ট্রেনে তোত্তো-চান একদিন একটা পয়সা কুড়িয়ে পেলো—জীবনে সে-ই প্রথম।

ওইমাচির ট্রেনে উঠেছিলো ও। জিয়ুগায়োকার পরের স্টেশনের নাম মিদোরিগায়োকা। সেখানে ঢোকার মুখে রেললাইনটা একটা অদ্ভুত বাঁক নিতো, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটাও বেশ সশব্দে একদিকে হেলে পড়তো। তখন তোত্তো-চান শক্ত করে কিছু একটা ধরে থাকতো। ও ট্রেনের শেষের দিকের একটা কামরায় উঠতো। উঠে,

ডানদিকের দরজার কাছে গিয়ে, যেদিকে ট্রেন চলছে সেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতো। ওর নিজের প্ল্যাটফর্ম ডান হাতেই পড়তো আর ওর কামরাটা স্টেশন থেকে বেরোবার গেটের একেবারে মুখে গিয়ে দাঁড়াতো।

সেদিন, মিদোরিগায়োকাতে পৌঁছনোর আগে ট্রেনটা যখন বাঁক নিচ্ছিলো, তখনই তোত্তো-চান দেখতে পেয়েছিলো ওর পায়ের কাছে পয়সার মতন কী একটা যেন পড়ে আছে। আগে একবার পয়সা ভেবে ভুল করে ও একটা বোতাম কুড়িয়ে তুলেছিলো; এবার তাই ভালো করে জিনিসটা পরীক্ষা করে নিতে হবে, ও ভাবলো। ট্রেনটা যখন আবার সোজা হয়ে চলতে লাগলো তখন ও ভালো করে জিনিসটাকে দেখে নিলো। হ্যাঁ, পয়সাই বটে—পাঁচ সেন। কারো হাত থেকে পয়সাটা পড়ে গেছে হয়তো আর পড়ে গিয়ে ওর দিকে গড়িয়ে এসেছে, তোত্তো-চান ভাবলো। কিন্তু, কার হাত থেকে পড়লো? ওর আশপাশে তো কেউ ছিলো না? এখন কী করা? তোত্তো-চানের মনে পড়লো কে যেন ওকে বলেছিলো যে কখনো পয়সা কুড়িয়ে পাও যদি, সোজা পুলিসের হাতে দিয়ে দেবে। কিন্তু, ট্রেনে কি আর কোনো পুলিসকে পাওয়া যাবে?

ঠিক তক্ষুনি ট্রেনের দরজা খুলে কণ্ডাকটার ওদের কামরায় ঢুকলেন। তোত্তো-চানের কী যে হলো ও নিজেই জানে না, কেন যেন ওর ডান পাটা দিয়ে পয়সাটা চেপে দিলো। কণ্ডাকটার ওকে চিনতেন। উনি তাকিয়ে হাসলেন। তোত্তো-চান সেদিন ভালো করে হাসতেই পারলো না; পায়ের নিচে চেপে রাখা পয়সাটার কথা ভেবে ওর কেমন যেন নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগছিলো। তাই ও ঠোঁট ফাঁক করে দুর্বলভাবে একটু হাসলো। ঠিক তখনই ট্রেনটা উকায়ামা স্টেশনে দাঁড়ালো। এর পরেরটাতে ও নামবে। এখানে বাঁদিকে প্ল্যাটফর্ম, তাই বাঁ দিকের দরজাটা খুলে গেলো আর বেশ অনেক যাত্রী গাড়িতে উঠে এলেন। তোত্তো-চান একটু ধাক্কা খেলো ঠিকই, কিন্তু নড়ার কোনো চেষ্টাই ও করলো না। পয়সাটা পা দিয়ে চেপে রাখতে রাখতে ও ভেবে নিলো এর পর কী করবে। ট্রেন থামলে পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে কোনো পুলিসকে দিয়ে দেবে। তারপর মনে হলো, বড়রা কেউ ওকে পয়সা কুড়োতে দেখে যদি চোর ভাবে? তখনকার দিন পাঁচ সেন দিয়ে ক্যারামেল লজেন্সের একটা ছোট প্যাকেট পাওয়া যেতো, অথবা চকোলেটের একটা লম্বা টুকরো। তাই, বড়দের কাছে সামান্য হলেও, তোত্তো-চানের কাছে পাঁচ সেনের মূল্য ছিলো অনেক। তোত্তো-চানের তাই খুব ভাবনা হতে লাগলো। 'ঠিক আছে,' ও মনে মনে বললো, 'আমি আস্তে করে বলবো যে আমার পয়সা পড়ে গিয়েছিলো। আমাকে তো সেটা তুলতেই হবে! তখন নিশ্চয় সবাই বিশ্বাস করবে যে পয়সাটা আমারই!' তারপরই আবার ওর মনে হলো, 'এই কথাটা বলার সময় সবাই যদি আমার দিকে তাকায় আর কেউ যদি বলে ওঠে যে "ওটা তো আমার", তাহলে?

অবশেষে ও ঠিক করলো যে স্টেশনে পৌঁছবার আগে ও নিচু হয়ে বসে, জুতোর

ফিতে বাঁধার ভান করে পয়সাটা চুপি চুপি তুলে নেবে। প্ল্যানটা কাজে দিলো। তোত্তো-চান প্ল্যাটফর্মে নামলো খুব ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত হয়ে। হাতের মুঠোয় ধরা পাঁচ সেন। থানাটা স্টেশন থেকে বেশ দূরে, অতদূর যেতে হলে ওর বাড়ি ফিরতে খুব দেরি হয়ে যাবে তার মাও খুব চিন্তা করবেন, তাই ও মনে মনে এইরকম ঠিক করলো :

'এখন পয়সাটা একটা গোপন জায়গায় রাখবো, তারপর কাল ওটা স্কুলে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের দেখাবো আর জিজ্ঞেস করবো কী করা উচিত। তাছাড়া, বন্ধুদের তো পয়সাটা দেখানোই উচিত, কারণ আর কেউ তো কখনো এরকম একটা পয়সা কুড়িয়ে পায়নি!' এবার, এটা লুকোবে কোথায়? বাড়ি নিয়ে গেলে মা হয়তো নানা প্রশ্ন করবেন, তাই অন্য কোথাও পয়সাটা রেখে যেতে হবে।

স্টেশনের পাশে একটা ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে তোত্তো-চান বেশ নিশ্চিন্ত হলো যে এইখানে কেউ আসবে না, কেউ ওকে দেখতে পাবে না। এবার ও একটা লাঠি দিয়ে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে, পাঁচ সেনটাকে তার মধ্যে ফেলে দিয়ে গর্তটা মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে দিলো। তারপর একটা অদ্ভুত দেখতে পাথর সেই গর্তটার ওপরে রেখে দিলো, যাতে পরে জায়গাটা চিনতে অসুবিধে না হয়। এবার খুব জোরে ছুট্রে ও বাড়ি ফিরে গেলো।

সাধারণত তোত্তো-চান রাতের বেলায় এত কথা বলে চলতো যে শেষ পর্যন্ত মা বলতেন, 'ব্যাস্, আজ আর নয়। এবার ঘুমোতে হবে।' কিন্তু সেদিন রাতে ও বেশি কিছু না বলেই শুয়ে পড়লো। পরদিন ঘুম ভাঙার পর ওর মনে হলো, কী যেন একটা খুব জরুরি কাজ করার আছে! তারপর হঠাৎ গুপ্তধনের কথাটা মনে পড়ে গেলো।

বাড়ি থেকে একটু আগে ভাগে বেরিয়ে ও রকিকে নিয়ে ছুটে গেলো সেই ঝোঁপটার কাছে। তারপর দুজনে মিলে ঝোঁপের ভিতরে ঢুকে পড়লো। 'এখানে! এখানে!' অদ্ভুত পাথরটা জায়গা মতনই রয়েছে। 'তোকে একটা দারুণ জিনিস দেখাবো, দাঁড়া,' ও রকিকে বললো। তারপর, পাথরটা সরিয়ে খুব সাবধানে মাটি খুঁড়তে লাগলো। অবাক কাণ্ড! পাঁচ সেনটা গেলো কোথায়? এত অবাক ও কখনো হয়নি। কেউ কি ওকে ওটা লুকোতে দেখে ফেলেছিলো? না কি পাথরটাই কোনোভাবে সরে গিয়েছিলো? ও চারপাশের মাটি খুঁড়তে লাগলো, কিন্তু পাঁচ সেন বেমালুম উধাও! খুব মন খারাপ হয়ে গেলো। বন্ধুদেরও দেখানো হবে না পয়সাটা। কিন্তু, পয়সাটা উধাও হলো কেমন করে? ও কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছিলো না।

এরপর ও যখনই ওই ঝোঁপের পাশ দিয়ে যেতো তখনই একটু মাটি খুঁড়ে দেখতো। কিন্তু পয়সাটা আর পাওয়া যায়নি। মাঝে মাঝে ওর মনে হতো হয়তো কোনো ছুঁচো পয়সাটা গিলে ফেলেছিলো। কখনো ভাবতো, সত্যিই ওইরকম কিছু ঘটেছিলো তো? কখনো মনে হতো, ঈশ্বর হয়তো ওকে পয়সাটা লুকিয়ে রাখতে

দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু, যতই ভাবুক না কেন, ঘটনাটা সত্যিই খুব অদ্ভুত ছিলো। এই রহস্য ও কোনোদিন ভুলতে পারেনি।

হাত নেড়ে কথা বলা

একদিন, জিয়ুগায়োকা স্টেশনের গেটের কাছে তোত্তো-চান তিনটি ছেলেমেয়েকে হাত নেড়ে নেড়ে ইশারায় কথা বলতে দেখলো—দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে; মেয়েটি ওর চেয়ে সামান্য বড় হবে। দেখে মনে হচ্ছিলো ওরা বুঝি মুকাভিনয় মুকাভিনয় খেলছে। এই খেলাটা তো ওরাও খেলে, কিন্তু ওই ছেলেমেয়েরা আরো অনেক রকমের ইশারা করছিলো যা তোত্তো-চানের জানা ছিলো না। কী মজার ব্যাপার! ও কাছে গিয়ে ওদের আরো ভালো করে দেখতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো যেন ওরা গল্পে মশগুল, কিন্তু কেউ কোনো শব্দ করছিলো না। একজন অনেক রকম ইশারা করছিলো হাত দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে আর একজনও নানা ভঙ্গী করছিলো, তৃতীয়জন কী সব বললো, তারপর সবাই মিলে খুব হেসে উঠলো। তবে ওদের হাসিতেও তেমন শব্দ হচ্ছিলো না। মনে হচ্ছিলো ওরা এই খেলাটাতে খুব যেন মজা পাচ্ছে। ওদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর তোত্তো-চানের মনে হলো, ওরা নিশ্চয় হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। 'ইশ্! আমিও যদি ওরকম হাত নেড়ে কথা বলতে পারতাম!' ও ভাবলো। ওদের দেখে ওর একটু হিংসেই হচ্ছিলো। একবার ভাবলো ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলাটায় যোগ দেবে, তারপর মনে হলো কেমন করে ওদের হাত নেড়ে বোঝাবে, ও কী চায়? তাছাড়া, ওরা তো তোমোইতে পড়ে না, ওর সঙ্গে আলাপও নেই, ফলে ওইভাবে এগিয়ে যাওয়াটা অভদ্রতা মনে হতে পারে। তাই ও ওদের দূর থেকে দেখতে লাগলো, যতক্ষণ না ওরা তোয়োকোর ট্রেন যে প্ল্যাটফর্মে আসে, সেই প্ল্যাটফর্মে চলে গেলো।

'একদিন আমিও এইভাবে হাত নেড়ে কথা বলতে শিখবো,' তোত্তো-চান মনে মনে ঠিক করলো।

তখনো তোত্তো-চান মূক বধির মানুষদের কথা জানতো না। যারা কানে শুনতে পায় না আর কথা বলতে পারে না, তারা কেমন করে কথা বলে, জানতো না। এই ছোট ছেলেমেয়েগুলি যে ওইমাচির মূক বধিরদের সরকারি স্কুলে পড়ে—যে ওইমাচির ট্রেনে করে ও রোজ স্কুলে আসে—সেই কথাও ওর জানা ছিলো না। ওর কেবল মনে হয়েছিলো যে ওই চোখ চকচক করা ছেলেমেয়েগুলির হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলার মধ্যে একটা সৌন্দর্য আছে। একদিন ওদের বন্ধু হবে ও, তোত্তো-চান ভাবলো।

সাতচল্লিশজন রোনিন যোদ্ধার গল্প

ইওরোপ এবং পৃথিবীর নানান দেশের নানান চিন্তা সোসাকু কোবায়াশিকে প্রভাবিত

করেছিলো। ইউরিদমিক্স, খাবার সময়কার নানান নিয়ম, ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাঁটতে যাওয়া, চিবিয়ে খাওয়ার গান—এই সব কিছুতেই তোমোইর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিলো।

হেডমাস্টারমশাই-এর নিকটতম সহকর্মী—অন্যান্য স্কুলে যাঁকে অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টারমশাই বলা হয়—সেই মিস্টার মারুইয়ামা কিন্তু অনেক ব্যাপারেই মিস্টার কোবায়াশির ঠিক উল্টো চরিত্রের মানুষ ছিলেন। মারুইয়ামা নামের মানে 'গোল পাহাড়', আর সেই 'গোল পাহাড়ের' মতনই গোল ছিলো মিস্টার মারুইয়ামার মাথা। পুরোপুরি টাক, কেবল দুই কানের পাশে একটু একটু সাদা চুলের গোছা। চোখে গোল চশমা, গাল দুটো টকটকে লাল—মিস্টার মারুইয়ামাকে দেখতেও ছিলো হেডমাস্টারমশাই-এর থেকে অনেকটাই আলাদা। তার উপর আবার উনি প্রাচীন চীনা কবিতা আবৃত্তি করতেন গম্ভীর গলায়।

ডিসেম্বর মাসের চোদ্দ তারিখে, ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলে জড়ো হয়েছে, তখন মিস্টার মারুইয়ামা ঘোষণা করলেন : 'প্রায় আড়াইশ বছর আগে এই দিনটিতে আমাদের সাতচল্লিশজন রোনিন যোদ্ধার সেই বিখ্যাত লড়াইয়ের ঘটনাটা ঘটেছিলো। আজ আমরা তাই সেঙ্গাকুজি মন্দিরে গিয়ে ওই যোদ্ধাদের সমাধিতে ফুল দিয়ে আসবো। তোমাদের বাবা মায়েদের কাছ থেকে অনুমতি চাওয়া হয়ে গেছে।'

হেডমাস্টারমশাই আপত্তি করলেন না। এ বিষয়ে তিনি মনে মনে কী ভাবতেন, বাবা মায়েরা ঠিক জানতেন না, তবে আপত্তি যখন করেননি, তখন নিশ্চয় ওঁর মত, আছে, এটা ওঁরা ধরে নিয়েছিলেন। রোনিন যোদ্ধাদের সমাধিতে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাবার ব্যাপারটা ওঁদের বেশ ভাবিয়েছিলো।

রওনা দেবার আগে মিস্টার মারুইয়ামা ছেলেমেয়েদের সাতচল্লিশজন রোনিন যোদ্ধার ঘটনাটা বলে দিলেন। রাজা আসানো খুন হবার পর তাঁর অনুগত সাতচল্লিশজন যোদ্ধা সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা করেছিলো দুই বছর ধরে। ওদের অস্ত্রের যোগান দিয়েছিলেন রিহেই আমানোইয়া নামে এক সাহসী ব্যবসায়ী। তারপর রিহেই আমানোইয়াকে যখন সরকারের পেয়াদা এসে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, তিনি তখন কেবল একটাই কথা বলেছিলেন : 'আমি রিহেই আমানোইয়া, আমি একজন ভদ্রলোক!' আর কিচ্ছু বলেননি তিনি, রোনিন যোদ্ধাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একটাও কথা ফাঁস করেননি।

ছেলেমেয়েরা এইসব এত কথা ঠিক মতন বুঝতে না পারলেও পড়াশুনো না করে কুহনবুৎসু মন্দিরের চেয়েও অনেক দূরে হাঁটতে যাবার উত্তেজনায় ওরা ছটফট করতে লাগলো—তারওপর আবার সঙ্গে করে টিফিন নিয়ে যাওয়া!

হেডমাস্টারমশাই আর অন্য শিক্ষকদের বিদায় জানিয়ে ওরা মিস্টার মারুইয়ামার সঙ্গে রওনা দিলো। যাবার পথে মাঝে মাঝেই ওরা হেঁকে উঠছিলো, 'আমি রিহেই আমানোইয়া, আমি একজন ভদ্রলোক!' মেয়েরাও চিৎকার করে বলছিলো, 'আমি

রিহেই আমানোইয়া, আমি একজন ভদ্রলোক!' সেই কথা শুনে পথ-চলতি মানুষেরা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাসছিলো। সেঙ্গাকুজি মন্দিরটা প্রায় সাত মাইল দূরে, কিন্তু তখনকার দিনে তো মোটর গাড়ির এত চল ছিলো না, তাই ওরা হেঁটে হেঁটেই অতটা পথ গেলো। মাথার ওপরে ডিসেম্বর মাসের নীল আকাশ, আর খানিক পরে পরেই 'আমি রিহেই আমানোইয়া, আমি একজন ভদ্রলোক!'—হাঁক, পথটা সত্যিই তেমন দীর্ঘ মনে হয়নি আর।

সেঙ্গাকুজিতে পৌঁছে মিস্টার মারুইয়ামা প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধূপকাঠি আর একগুচ্ছ ফুল ধরিয়ে দিলেন। মন্দিরটা ছিলো কুহনবুৎসুর চেয়ে ছোট, আর এর চত্বরে সার বাঁধা অনেকগুলি কবর ছিলো। রোনিন যোদ্ধাদের স্মৃতি বিজড়িত এই মন্দিরে এসে তোত্তো-চানের মনটা শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো; ও মিস্টার মারুইয়ামার দেখাদেখি ধূপ আর ফুল নিয়ে এগিয়ে গেলো কবরের দিকে, আর কবরের ওপর সেগুলি নামিয়ে রেখে নতজানু হয়ে ওর শ্রদ্ধা জানালো। সবাই খুব চুপ করে গিয়েছিলো—তোমোইর



ছেলেমেয়েরা যে এত নিঃশব্দে কোনো কাজ করতে পারে, তা জানাই ছিলো না। সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধূপকাঠির ধোঁয়া বাতাসের গায়ে কত সব নক্সা, কত সব ছবি এঁকেছিলো!

এর পর থেকে সব সময়ই ধূপের গন্ধে ওদের মিস্টার মারুইয়ামা আর রিহেই আমানোইয়ার কথা মনে পড়তো। ধূপের গন্ধ ওদের কাছে নিস্তব্ধতার প্রতীক হয়ে গিয়েছিলো।

সাতচল্লিশজন রোনিন যোদ্ধার গল্পটা ছোটরা খুব একটা না বুঝলেও, সেদিনের পর থেকে মিস্টার মারুইয়ামাকে ওদের খুব বেশি ভালো লাগতে শুরু করেছিলো, যেমন হেডমাস্টারমশাইকে ভালো লাগতো। তবে দুজনের প্রতি ভাল লাগাটা দু ধরনের ছিলো। তোত্তো-চানের খুব ভাল লাগতো চশমার ভারি কাঁচের আড়ালে মিস্টার মারুইয়ামার ছোট্ট দুটো চোখ, আর ওঁর শান্ত কণ্ঠস্বর—ওর বড়সড় চেহারাটার সঙ্গে সেই কণ্ঠস্বরের কোনোই মিল ছিলো না।

মাসোও চা-আ-আ-ন!

রেললাইনের ধারের একটা বস্তিতে একদল কোরিয়ার মানুষ থাকতো। স্টেশনে যাওয়া আসার পথে তোত্তো-চান ওদের দেখতে পেতো। ও অবশ্য জানতো না যে ওরা কোরিয়ান; গোলগাল এক মহিলা, মাঝখানে সিঁথি, আর চুলগুলো টেনে একটা খোঁপা করে বাঁধা—তাঁকে ও দেখতো রোজ। মহিলার সাদা রাবারের জুতো জোড়া নৌকোর মতন ছুঁচোল, স্কার্টটা লম্বা আর ছোট্ট ব্লাউজের সামনে ফিতেয় বাঁধা একটা বড়সড় ফুল। মনে হতো যেন মহিলা সব সময় ওর ছেলেকে খুঁজছেন : 'মাসোও চা-আ-আ-ন!' 'মাসোও চা-আ-আন!' বলে। কিন্তু জাপানী ভাষায় উচ্চারণটা হওয়া উচিত ছিলো 'মা-সা-ও-চান', তার বদলে মহিলা বলেন 'চা-আ-আ-ন'। ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে কী যেন একটা আর্তি ফুটে উঠতো।

ওইমাচির ট্রেনের লাইনের পাশেই ছিলো বস্তিটা। উঁচু পাড়ের উপরে। কোন ছেলেটা মাসাও-চান, তোত্তো-চান তাও জানতো। ওর থেকে একটু বড়, হয়তো ক্লাস টু-তে পড়ে, কিন্তু কোন স্কুলে যে যায়, তা তোত্তো-চান জানতো না। মাথার চুল উশকো খুশকো, সব সময় একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে দেখতো ও। একদিন, তোত্তো-চান যখন ওদের বস্তির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, ও দেখতে পেলো মাসাও-চান পা ফাঁক করে, দু হাত কোমরে রেখে, একটু বেপরোয়া ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। 'কোরিয়ান বাচ্চা!' বলে ও চিৎকার করে উঠলো।

ওর গলার স্বরে কী অসম্ভব ঘৃণা! তোত্তো-চান ভয়ে পেয়ে গেলো। ও তো কোনোদিন ওকে কিচ্ছু করেনি—সত্যি কথা বলতে কি, ওরা কোনোদিন কথাই বলেনি—তাহলে ওর সঙ্গে ওইভাবে কথা বললো কেন মাসাও-চান?

বাড়ি ফিরে এসে তোত্তো-চান মাকে বললো, 'আজ আমাকে মাসাও-চান 'কোরিয়ান বাচ্চা' বলেছে।' মা অমনি হাতটা মুখের ওপর চেপে ধরলেন, আর ওঁর চোখ জলে ভরে উঠলো। তোত্তো-চান ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলো কথাটা নিশ্চয় খুব খারাপ কিছু। মায়ের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো আর ওঁর নাকের ডগাটা লাল হয়ে উঠলো। 'হায় রে বেচারা!' মা বললেন। 'লোকে নিশ্চয় ওকে 'কোরিয়ান বাচ্চা' 'কোরিয়ান বাচ্চা' বলে ডাকে, তাই ও ধরে নিয়েছে কথাটা একটা গালাগাল। এত ছোট্ট একটা ছেলে—কেমন করে ও কথাটার মানে বুঝবে? হয়তো ও ভেবেছে যে কথাটা 'বাকা'র মতন খারাপ কিছু, লোকে যেমন কাউকে 'বোকা হাঁদা' বলে গাল দেবার সময় 'বাকা' বলে! হয়তো ওকে এতবার এই কথাটা শুনতে হয় যে ও ঠিক করেছে এই খারাপ কথাটা ও-ও আর কাউকে শোনাবে। তাই তোমাকে ওইভাবে বলেছে। মানুষ এতো নিষ্ঠুর হয় কেন?'

চোখ মুছে মা তোত্তো-চানকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বললেন, 'তুমি হলে জাপানী আর মাসাও-চানের দেশ কোরিয়া। কিন্তু ও তো তোমারই মতন একটা ছোট্ট বাচ্চা! শোনো, লক্ষ্মী সোনা, কাউকে কখনো তোমার থেকে অন্য রকম ভেবো না, কেমন? ভেবো না যে 'ওই মানুষটা জাপানী, এ কোরিয়ান', কেমন? মাসাও-চানের সঙ্গে সবসময় সুন্দর করে কথা বোলো। কোরিয়ান বলে তার সঙ্গে অন্যেরা দুর্ব্যবহার করবে, এটা যে কী অন্যায়!'

এসব শক্ত শক্ত কথা তোত্তো-চান ঠিক ভালো করে বুঝতে পারেনি, কিন্তু ও এটুকু বুঝেছিলো যে মাসাও-চানের সম্পর্কে মানুষ মিছিমিছি খারাপ কথা বলে। তাই হয়তো ওর মা সব সময় অমন আকুল হয়ে ছেলেকে খুঁজে বেড়ান। পরদিন যখন তোত্তো-চান ওই বস্তিটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন ও শুনতে পেলো মাসাও-চানের মা ওর নাম ধরে ডাকছেন : 'মাসোও-চা-আ-আ-ন!' তোত্তো-চান তখন মনে মনে ঠিক করলো যে যদিও ও কোরিয়ান নয়, তবু মাসাও-চান যদি ওকে কিছু বলে, উত্তরে ও বলবে, 'আমরা সবাই ছোট, আমরা সবাই এক!' তারপর ওর বন্ধু হবার চেষ্টা করবে।

বিরক্তি আর উদ্বেগ মেশানো তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে মাসাও-চানের মা যখন ওকে ডাকতেন, তখন সেই সুর হাওয়ার বুকে ভেসে বেড়াতো, যতক্ষণ না চলন্ত ট্রেনের ঝমঝম শব্দ এসে হাওয়াটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যেতো। 'মাসোও-চা-আ-আ-ন!' ওই ব্যথা ভরা ডাক একবার যে শুনেছে, কোনোদিন আর ভুলতে পারবে না।

বেণী বাঁধা মেয়ে

সে সময় তোত্তো-চানের দুটোই আকাঙ্খা ছিল : এক, অ্যাথলেটিক ব্লুমার পরার; দুই, চুলে বেণী বাঁধার। ট্রেনে ও ওর চেয়ে বয়সে বড়, বেণী বাঁধা মেয়েদের দেখতো আর ভাবতো, ইস্! আমার চুলটাও যদি এইভাবে বাঁধা যেতো! ক্লাসের বাকি সবার চুলই

ছোট ছিলো, কেউ কেউ আবার রাবারব্যাণ্ড দিয়ে একটু উঁচু ঝুঁটি বেঁধে আসতো, কেবল তোত্তো-চানের চুল ছিলো ডান দিকে সিঁথি করা, ফিতে দিয়ে বাঁধা। মায়ের ওই রকমই পছন্দ ছিলো। ওদিকে তোত্তো-চানের খুব শখ ছিলো ঝুঁটি বেঁধে, তারপর বেণী করার।

শেষে একদিন মা ওকে ছোট্ট দুটো বেণী বেঁধে দিলেন। গোড়াটা রাবারব্যাণ্ড দিয়ে এঁটে নিয়ে মা সরু সরু ফিতে দিয়ে ফুল করে দিয়েছিলেন, আর তখন তোত্তো-চানের নিজেকে বেশ বড় মেয়ে, বড় মেয়ে বলে মনে হচ্ছিলো। আয়নায় নিজেকে দেখে অবশ্য বুঝতে পারছিলো যে, ট্রেনের মেয়েদের চেয়ে ওর বেণী দুটো অনেকটাই ছোট আর পাতলা হয়েছে, খানিক যেন টিকটিকির ল্যাজের মতন! তবুও রকির কাছে গিয়ে দু হাতে দুটো বেণী তুলে ধরে বললো, 'দারুণ না?' রকি একটু চোখ পিটপিট করে ওর দিকে তাকালো। 'তোকেও বেণী বেঁধে দেওয়া গেলে বেশ হতো,' তোত্তো-চান বললো।

সেদিন ট্রেনে বসে তোত্তো-চান মাথাটাকে যতটা সম্ভব স্থির রাখার চেষ্টা করতে লাগলো। বেণী দুটো যদি আলগা হয়ে যায়! 'ইস্, কেউ যদি একটু বলতো যে, 'দারুণ তো তোমার বেণী!' তাহলে কী ভালোই না হতো!' মনে মনে ও তা-ই ভাবতে লাগলো। কিন্তু কেউ ওর নতুন বেণী লক্ষই করলো না। কেবল স্কুলে পৌঁছনোর পর ওর ক্লাসের সাক্কো-চান, মিয়ো-চান আর কেইকো আয়োকি বললো, 'বেণী! ও মা!' তোত্তো-চানের তাতে ভারি আনন্দ হলো।

ছেলেদের কারো ওর বেণী সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ ছিলো বলে মনে হলো না। কিন্তু, হঠাৎ দুপুর বেলায় ওয়ি নামে ওর ক্লাসের একটি ছেলে জোর গলায় বলে উঠলো, 'আরে! তোত্তো-চানের দেখি নতুন চুলের কায়দা!' তোত্তো-চান খুব খুশি হয়ে গর্বের সঙ্গে বলে উঠলো, 'এগুলিকে বেণী বলে!' এ কথা বলামাত্র ওয়ি ওর কাছে এসে দু হাত দিয়ে ওর বেণী দুটো ধরে বললো, 'ভালোই হলো। আমার খুব ক্লান্ত লাগছিলো। এখন বরং এগুলো ধরে একটু দোল খাওয়া যাক। রেলগাড়ির রডের থেকে যে হাতল ঝুলে থাকে, তার চেয়ে এগুলি অনেক ভালো!'

ঘটনাটা এখানেই থামলো না। ওয়ি ছিলো চেহারায় তোত্তো-চানের দ্বিগুণ-ক্লাসের সবচেয়ে বড়সড়, মোটা-গাট্টা ছেলে। আর তোত্তো-চান তো রোগা প্যাংলা। তাই ও যখন তোত্তো-চানের বেণী জোড়া ধরে টান দিলো তখন তোত্তো-চান সোজা থপ্ করে পড়ে গেলো মাটিতে। প্রথমে তো ওর বেণী দুটোকে ট্রেনের হাতল বললো, তায় আবার সেগুলি ধরে টান মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দিলো, 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' করে ওকে স্পোর্টসের দিনের দড়ির লড়াইয়ের মতন করে টানতে লাগলো—তোত্তো-চান এবার ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললো।

তোত্তো-চানের কাছে বেণী বাঁধা ছিলো বড় হওয়ার প্রতীক, আর ও আশা করেছিলো যে, বেণী বেঁধে এসেছিলো বলে বুঝি সবাই ওকে সম্ভ্রমের চোখে দেখবে। ও কাঁদতে

কাঁদতে হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে ছুটে গেলো। দরজায় কড়া নাড়া শুনে হেডমাস্টারমশাই দরজা খুলে ওঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে তোত্তো-চানের একেবারে মুখের কাছে মুখ এনে জানতে চাইলেন, কী হয়েছে?

তোত্তো-চান ওর বেণী দুটো হাত দিয়ে দেখিয়ে নিয়ে বললো, 'ওয়ি এই দুটো নিয়ে টানছিলো। ও "হেঁইয়ো হেঁইয়ো" করছিলো।'

হেডমাস্টারমশাই ওর মুখের দিকে তাকালেন। ওর কান্না-ভেজা মুখের সঙ্গে বেণী দুটো যেন খাপ খাচ্ছিলো না ঠিক। ওই বেণীর সঙ্গে একটা হাসি খুশি মুখই বেশি মানাতো। হেডমাস্টারমশাই তোত্তো-চানকে মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তারপর ওঁর ফোকলা দাঁতের কথা একবারও না ভেবে, এক গাল হাসলেন। 'কাঁদছো কেন? তোমার চুলটা তো দারুণ বাঁধা হয়েছে।'

'তোমার পছন্দ হয়েছে?' তোত্তো-চান একটু যেন লজ্জাই পেল।

'দারুণ!'

নিজের চেয়ারের থেকে নেমে দাঁড়িয়ে, চোখ মুছে, তোত্তো-চান বললো, 'আমি আর একটুও কাঁদবো না। ওয়ি যদি 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' করে। তাহলেও না।'

হেডমাস্টারমশাই হেসে মাথা নাড়লেন। তোত্তো-চানও হাসলো। বেণীর সঙ্গে মুখের এই ভাবটারই দরকার ছিলো। নিচু হয়ে, হেডমাস্টারমশাইকে সম্মান জানিয়ে, তোত্তো-চান ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে লাগলো। খানিক আগের চুল টানার কথাটা ও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো, এমন সময় ওয়ি ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগলো। তারপর বেশ জোর গলায় ও বলে উঠলো। 'আমি খুব দুঃখিত রে, তোর চুল টেনেছিলাম বলে। হেডমাস্টারমশাই আমাকে খুব বকেছেন। বলেছেন 'মেয়েদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।' আর বলেছেন মেয়েদের প্রতি নরম হতে হয়, মেয়েদের যত্ন নিতে হয়।'

তোত্তো-চান বেশ অবাক হয়ে গেলো। এর আগে কখনো ও এমন কথা শোনেনি। সব সময় তো সবাই বলে ছেলেরাই আসল; যে সব বাড়িতে অনেক ভাইবোন থাকে, সেখানে ছেলেদেরই আগে খেতে দেওয়া হয়। আর, কোনো মেয়ে যদি কোনো কথা বলে, তখন তার মা বলেন, 'মেয়েদের কথা বলার কথা নয়। ছোট্ট মেয়েদের শুধু দেখবে সবাই, কেউ তাদের গলার স্বর শুনবে না—এটাই নিয়ম।'

অথচ হেডমাস্টারমশাই ওয়িকে বলেছেন মেয়েদের যত্ন নেবার কথা! কী আশ্চর্য, তোত্তো-চান ভাবছিলো। তারপরই ওর মনে হলো, বাঃ বেশ তো ব্যাপারটা! কেউ যত্ন নিলে তো খুবই ভালো হয়!

ওদিকে ওয়ি বেচারা তো বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছিলো। ভাবো একবার, মেয়েদের যত্ন নিতে হবে, মেয়েদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করতে হবে! তাছাড়া, ওই একটি দিনই ও হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে বকুনি খেয়েছিলো। দিনটাকে ও ভুলতে পারেনি।

থ্যাঙ্ক ইয়্যু!

নতুন বছরের ছুটি। গরমের ছুটিতে সবাই যেমন বহুবার স্কুলে জড়ো হয়েছিলো, এই ছুটিটা তেমন ছিলো না। এই ছুটিটা সবাই যে যার পরিবারের সঙ্গেই কাটাতো।

মিগিতা সকলকে একটাই কথা বলে বেড়াচ্ছিলো : 'নতুন বছরের ছুটিতে আমি কিয়ুশুতে যাচ্ছি, আমার দাদুর কাছে।' অন্য দিকে তাই-চান, যার আবার বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ভারি ভাল লাগতো, সে বললো, 'আমি দাদার সঙ্গে ওর ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে যাবো।' তাই ও ছিলো খুব উত্তেজিত। 'দেখা হবে! দেখা হবে!' বলে সবাই বন্ধুদের বিদায় জানালো।

তোত্তো-চান বাবা মায়ের সঙ্গে শিগা পাহাড়ে স্কি করতে গিয়েছিলো সেবার। সেখানে বাবার বাজনার দলের কণ্ডাকটার, হিদেও সাইতো, যিনি নিজে চেলো বাজাতেন, তাঁর একটা খুব সুন্দর বাড়ি ছিলো। প্রত্যেক শীতে ওরা গিয়ে ওঁর সঙ্গে কয়েকদিন থাকতো। তোত্তো-চান স্কুলে ভর্তি হবার সময় থেকেই স্কি করতে শিখছিলো।

স্টেশন থেকে একটা ঘোড়ায় টানা স্লে-গাড়ি নিয়ে স্কি করার জায়গাটায় যেতে হতো। আশ্চর্য সাদা বরফে ঢাকা পাহাড়, একটানা সাদা, কেবল মাঝে মাঝে এক একটা গাছের মাথা উঁকি দিতো। স্কি-লিফ্‌ট্‌ বা অন্য কোনো যন্ত্র এই দৃশ্যপটে ছেদ টানতে পারেনি। মা বলেছিলেন, যাদের কোনো থাকার জায়গা নেই—ওদের যেমন মিস্টার সাইতোর বাড়িটা আছে—তারা হয় একটা জাপানী ধরনের সরাইখানায় থাকে বা একটা পাশ্চাত্য ধরনের হোটেলে গিয়ে ওঠে। সে যাই হোক, জায়গাটাতে প্রচুর বিদেশীর সমাগম হতো।

তোত্তো-চানের জন্য এবারের সফরটা অন্যবারের চেয়ে একটু অন্যরকম ছিলো। এখন ও ক্লাস ওয়ানের ছাত্রী এবং বাবা ওকে এখন একটু একটু ইংরেজি শেখাচ্ছেন। ও এখন 'থ্যাঙ্ক ইয়্যু' বলতে শিখেছে।

তোত্তো-চানকে বরফের মধ্যে স্কির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই বিদেশীরা কিছু না কিছু একটা বলতেন নিজেদের মধ্যে। হয়তো 'মিষ্টি মেয়েটা!' গোছের কিছু একটা বলতেন, কিন্তু তোত্তো-চান ওদের কথা ঠিক বুঝতে পারতো না। এতদিন পর্যন্ত ও তো কোনোই উত্তর দিতে পারতো না, কিন্তু এবার ও মাথা টাথা ঝাঁকিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইয়্যু' বলে উত্তর দেবার চেষ্টা করতো!

এতে বিদেশীরা খুশি হয়ে নিজেদের মধ্যে আরো কী সব বলাবলি করতো। কখনো একজন মহিলা হয়তো নিচু হয়ে তোত্তো-চানের গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে আদর করে দিতেন। কখনো একজন ভদ্রলোক ওকে কোলে তুলে নিতেন। তোত্তো-চান ভাবতো সামান্য একটু 'থ্যাঙ্ক ইয়্যু' বলে এত বন্ধু পাওয়া যায়। এ তো দারুণ ব্যাপার!

একদিন একজন চমৎকার মানুষ—বেশি বয়স নয় ভদ্রলোকের—এগিয়ে এসে এমন একটা ভঙ্গী করলেন যাতে মনে হলো উনি তোত্তো-চানকে বলছেন, 'তুমি কি

আমার সঙ্গে আমার স্কির সামনে একবার চড়বে?' বাবা বললেন, ঠিক আছে। 'থ্যাঙ্ক ইয়্যু', বললো তোত্তো-চান। উনি ওকে হাঁটু মুড়িয়ে ওঁর স্কির সামনে বসিয়ে দিলেন। তারপর, স্কি জোড়া জড়ো করে উনি ধীরে ধীরে তোত্তো-চানকে নিয়ে শিগা পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু ঢালটা বেয়ে নামতে লাগলেন। ওরা হাওয়ার মতন স্বচ্ছ গতিতে পাহাড় থেকে নামতে থাকলো আর হাওয়া তখন তোত্তো-চানের কানের পাশ দিয়ে শিশ দিয়ে চলে গেলো। তোত্তো-চান হাঁটু দুটো জড়ো করে নামতে লাগলো, একটু ভয় ভয় করলেও ব্যাপারটা খুব মজারও ছিলো। ওদের স্কিটা থামার পর সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। তোত্তো-চান উঠে দাঁড়িয়ে, স্কি থেকে নেমে, মাথা নিচু করে সকলকে সম্মান জানিয়ে বললো, 'থ্যাঙ্ক ইয়্যু।' তখন সবাই আরো জোরে হাততালি দিতে থাকলো।

অনেক অনেক দিন পর তোত্তো-চান জানতে পেরেছিলো যে যাঁর সঙ্গে ও সেদিন স্কিতে চড়েছিলো, তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত স্কি-চালক, স্নাইডার। স্নাইডার নাকি সব সময় রূপোর স্কি-লাঠি ব্যবহার করতেন। সেদিন খেলা শেষে, সবার যখন হাততালি দেওয়া হয়ে গেছে, স্নাইডার তখন নিচু হয়ে ওর পাশে বসে, ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইয়্যু' বলেছিলেন। এটা তোত্তো-চানের সবচেয়ে ভালো লেগেছিলো। যেন ও একটা ছোট মেয়ে নয়, মস্ত একজন মহিলা। স্নাইডার যখন এইরকম করেছিলেন, তোত্তো-চান তখন মনে মনে বুঝতে পেরেছিলো যে উনি একজন চমৎকার মানুষ। সেদিন ওদের ঘিরে রেখেছিলো উঁচু উঁচু পাহাড়, আর বরফের স্তূপ—সে দৃশ্য যেন ফুরোয় না।

লাইব্রেরি

শীতের ছুটির পর স্কুলে ফিরে এসে একটা নতুন জিনিস দেখে ছেলেমেয়েরা তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলো—ওদের ক্লাসগুলোর ঠিক উল্টোদিকে রেলগাড়ির যে নতুন কামরাটা রাখা ছিলো, সেটা একটা লাইব্রেরি হয়ে গেছে। হলঘরের পাশে সারবাঁধা ফুলগাছ, তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ওই লাইব্রেরি-গাড়ি। ওদের স্কুলের দারোয়ানজি, রিয়ো-চান, ওরা যাকে খুব শ্রদ্ধা করতো আর যে কি না হরেক রকমের কাজ করতে পারতো, সেই রিয়ো-চান ছুটিতে খুব পরিশ্রম করে লাইব্রেরিটাকে সাজিয়ে তুলেছিলো। অনেক তাক দিয়ে, দেয়ালটা রঙ করে, ছোট ছোট টেবিল চেয়ার পেতে। তাকে রাখা ছিলো নানা রং-এর বই।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'এটা তোমাদের লাইব্রেরি। তোমরা এখান থেকে যে কোনো বই নিয়ে পড়তে পারো। এমন কোনো কথা নেই যে এই বইটা অমুক ক্লাসের জন্য, ওটা অন্য ক্লাসের জন্য। সব কিছুই সবার জন্য। যখন খুশি লাইব্রেরিতে আসবে, যদি কোনো বই বাড়িতে নিয়ে যেতে চাও, তাও পারো, কেবল পড়া হয়ে গেলে অবশ্যই বইটা স্কুলে ফিরিয়ে আনবে। বাড়িতে যদি এমন কোনো বই থাকে

যেটা তোমাদের বন্ধুদের পড়াতে ইচ্ছে করছে, তাহলে এখানে নিয়ে এসো। মোট কথা, যত পারবে, পড়বে।'

'আজকের প্রথম পিরিয়ডটা লাইব্রেরি পিরিয়ড হোক তাহলে!' সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো।

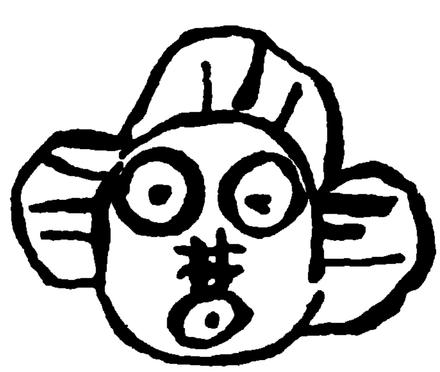
'তা-ই চাও তোমরা?' হেডমাস্টারমশাই ওদের আনন্দ দেখে খুব খুশি হলেন। নয় কেন? বেশ তো! তাই হোক!'

এবার তোমোই-র সব ছাত্রছাত্রী, পঞ্চাশজনের প্রত্যেকে, ঠেসাঠেসি করে লাইব্রেরি-কামরাতে উঠে পড়লো। উত্তেজনায় সবাই একটা করে বই নিয়ে পড়তে লাগলো। এতজনের বসবার মতন যথেষ্ট জায়গা ছিলো না। তাই অর্ধেক ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলো। খুব মজার ছিলো দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে, বসে, সবাই মিলে বই পড়ছে—ঠিক যেন একটা ভিড় রেলগাড়ির মতন!

ছেলেমেয়েদের খুব আনন্দ হচ্ছিলো। তোত্তো-চান তখনও ভালো করে পড়তে শেখেনি, তাই ও একটা দারুণ মজার ছবির বই তুলে নিলো। সবাই যখন বই বেছে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করে দিয়েছে, গাড়িটা তখন খুব চুপচাপ হয়ে গেলো। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? আবার সবাই কলকল করতে শুরু করে দিলো। কেউ জোরে জোরে পড়ছে, কেউ একে ওকে এটা ওটার মানে জিজ্ঞেস করছে, কেউ বই বদলাতে ব্যস্ত। একটি বাচ্চা 'গান আর ছবি' নামে একটা বই নিয়ে, জোরে জোরে সুর করে একটা ছড়া পড়তে পড়তে একটা মুখের ছবি আঁকতে লাগলো :

গোল চোখ, গোল চোখ
কাটাকাকুটি নাক
গোলগাল মুখ, ব্যাস
এইভাবে থাক।
চুল তিন খাড়া খাড়া
তিন চুল, হোঃ!
মোটাসোটা গিন্নিবান্নি,
গিন্নিবান্নি গো!

'হোঃ' বলা মাত্র গোল মুখটা এঁকে ফেলতে হবে, আর 'মোটাসোটা গিন্নিবান্নি' বলতে বলতে গোল মুখের তিন দিকে তিনটে গোল রেখা আঁকতে হবে। দাগগুলো



সব ঠিকমতন এঁকে ফেলতে পারলে মুহূর্তের মধ্যে একজন গোলগাল মহিলার মুখ আঁকা হয়ে যাবে, মাথার চুল প্রাচীন জাপানী কায়দায় বাঁধা :

তোমোইতে ছেলেমেয়েদের ইচ্ছেমত বিষয় বেছে নিয়ে পড়া করার স্বাধীনতা ছিলো, কিন্তু একই সঙ্গে ওদের শেখানো হয়েছিলো, এমনভাবে মনযোগ দিয়ে কাজ করতে হয় যাতে পাশে যে যা-ই করুক না কেন, তাতে অন্যদের কোনো অসুবিধে হতে পারবে না। ফলে বাচ্চাটি যখন গান গেয়ে গেয়ে ওর 'গিন্নির' ছবিটা আঁকছিলো, বাকিরা তখন দিব্বি যে যার কাজ করে যাচ্ছিলো। কেবল দু'এক জন ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো।

তোত্তো-চানের বইটা ছিলো একটা লোক-কাহিনী। একজন খুব ধনী লোকের মেয়ের কিছুতেই বিয়ে হচ্ছিলো না কারণ তার কেবল পেট গরম থাকতো। শেষে যাও বা একটা বর পাওয়া গেলো। বিয়ের রাতে উত্তেজনার চোটে বউ-এর পেট এমন গরম হলো আর এমন জোর হাওয়া বের করলো বউ, যে সেই হাওয়ার তোড়ে বর বাবাজি শূন্যে সাড়ে সাতপাক ঘুরে সোজা মাটিতে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো। গল্পের ছবিটাও তেমনি মজার ছিলো বর হাওয়ার মধ্যে পাক খাচ্ছে! তোত্তো-চানের পর সবাই বইটা পড়তে চেয়েছিলো।

ছেলেমেয়েরা সবাই ওই কামরার মধ্যে সারডিন মাছের মতন চ্যাপটা হয়ে দাঁড়িয়ে, বসে আনন্দ করে, বই পড়ছিলো। সকালবেলার আলোয় ওদের মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। সেই মুখগুলো দেখতে নিশ্চয় হেডমাস্টারমশাইয়ের ভারি তৃপ্তি হয়েছিলো। গোটা দিনটাই ওরা সেদিন লাইব্রেরিতে কাটিয়েছিলো।

এর পর থেকে যেদিনই বৃষ্টি পড়তো বলে ওরা বেরুতে পারতো না, সেদিনই ওরা লাইব্রেরিতে গিয়ে জড়ো হতো। অন্য অনেক সময়ও যেতো ওরা লাইব্রেরিতে। ওটা ওদের খুব প্রিয় একটা জায়গা হয়ে গিয়েছিলো।

একদিন হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'লাইব্রেরির পাশে একটা বাথরুম করতে হবে দেখছি!' কথাটা বলার কারণ ছিলো এই যে, ছেলেমেয়েদের পড়তে পড়তে আর খেয়াল থাকতো না যে বাথরুমে যেতে হবে। শেষে ওরা যখন আর হিসি চাপতে পারতো না তখন বিচিত্র সব ভঙ্গী করে কোনো রকমে ছুট লাগাতো হলঘরের ওপাশের বাথরুমের দিকে।

ল্যাজ

একদিন দুপুর বেলায়, স্কুল তখন ছুটি হয়ে গেছে আর তোত্তো-চান বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছে, এমন সময় ওয়ি ছুট্টে ওর কাছে এসে ফিসফিস করে বললো, 'হেডমাস্টারমশাই কার ওপর যেন খুব ক্ষেপে গেছেন।'

'কোথায়?' তোত্তো-চান জানতে চাইলো। কথাটা ওর বিশ্বাস হচ্ছিলো না।

হেডমাস্টারমশাই তো কখনো কারো ওপর রাগ করেন না? ওয়িও খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলো, নয়তো ওইভাবে ছুটে এসে তোত্তো-চানকে খবরটা দিতো না।

'রান্নাঘরে,' ওয়ি বললো। ওর ভালমানুষ চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিলো আর নাকের ফুটোটা আরো বড় হয়ে গিয়েছিলো।

'চল্!' ওয়ির হাত ধরে তোত্তো-চান ছুট লাগালো হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দিকে। একেবারে হলঘরের গায়ে লাগানো বাড়িটা; স্কুলে ঢোকার পেছনের গেটটার পাশেই ওদের রান্নাঘর। যেদিন তোত্তো-চান সেই নোংরার ট্যাঙ্কের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো, সেদিন ওকে ওই রান্নাঘরের ভিতর দিয়েই বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো ঘষে মেজে পরিষ্কার করার জন্য। আর, এই রান্নাঘরেই প্রতিদিন 'সাগর থেকে, পাহাড় থেকে' রান্না হয়, যারা ঠিক মতন টিফিন আনেনি, তাদের জন্য।

পা টিপে টিপে রান্নাঘরের কাছে যেতে যেতে ওরা বন্ধ দরজার ওপারে হেডমাস্টারমশাইয়ের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। 'এত অবিবেচকের মতো কথাটা বললেন কেমন করে আপনি? কেন বললেন যে তাকাহাশির একটা ল্যাজ আছে?'

ওদের ক্লাসের দিদিমণি বকুনিটা খাচ্ছিলেন। 'আমি তো সত্যি সত্যিই কথাটা বলতে চাইনি; আসলে সেই মুহূর্তে ওর দিকে চোখ পড়লো, আর ওকে এত মিষ্টি দেখাচ্ছিলো যে কথাটা বলে ফেললাম,' দিদিমণি উত্তর দিলেন।

'কিন্তু আপনি এই কথার তাৎপর্যটা বুঝতে পারলেন না? আপনাকে কেমন করে বোঝাই যে আমি তাকাহাশির প্রতি কতটা যত্ন নিতে চাই?'

সেদিন সকালের ঘটনাটা তোত্তো-চানের মনে পড়ে গেলো। দিদিমণি ওদের বোঝাচ্ছিলেন যে আদিম মানুষের একটা ল্যাজ ছিলো। এই কথা শুনে সবাই খুব মজা পেয়েছিলো। বড়রা হয়তো এই আলোচনাকে বিবর্তনের ইতিহাসের প্রথম পাঠ বলে আখ্যা দেবেন। গল্পটা ছোটদের খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছিলো। তারপর দিদিমণি যখন বললেন যে, প্রত্যেক মানুষেরই 'ককসিক্স' নামে একটা ল্যাজের মতন জিনিস আছে, তখন বাচ্চারা সবাই যার যার ককসিক্সটি খুঁজতে শুরু করে দিলো আর সবাই হেসে কুটিকুটি হলো। শেষে দিদিমণি বলেছিলেন, 'হয়তো আমাদের মধ্যেই কারো একটা ল্যাজ আছে। তুমি, তাকাহাশি? তোমার আছে নাকি ল্যাজ?'

তাকাহাশি অমনি উঠে দাঁড়িয়ে খুব জোর জোর মাথা নেড়ে বললো, 'না না, আমার কোনো ল্যাজ নেই।'

তোত্তো-চান বুঝতে পারলো যে, এই ঘটনাটার কথাই বলছেন হেডমাস্টারমশাই। এবার ওঁর গলায় সত্যিকারের রাগ ফুটে উঠছিলো। 'আপনার একবারও মনে হয়েছিলো কি যে তাকাহাশিকে ল্যাজের কথা বললে ওর কেমন লাগতে পারে?'

দিদিমণির উত্তরটা তোত্তো-চান আর ওয়ি শুনতে পেলো না। ল্যাজের কথায়

হেডমাস্টারমশাই কেন যে এত রাগ করছিলেন, তোত্তো-চান বুঝতেই পারলো না। ইস্! ওকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো যে, ওর ল্যাজ আছে কি না, ও তো তাহলে দারুণ খুশি হতো!

অবশ্য, ওর তো তাকাহাশির মতন কোনো সমস্যা ছিলো না, তাই হয়তো এমন একটা প্রশ্নে ওর খারাপ লাগতো না। ও তো আর পাঁচজনের মতনই দেখতে ছিলো। কিন্তু তাকাহাশি জানতো যে ও আর বড় হবে না। সেজন্যেই হেডমাস্টারমশাই স্পোর্টসের দিন কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা আবিষ্কার করেছিলেন, স্রেফ তাকাহাশিকে জিতিয়ে দেবার জন্য। এ জন্যেই উনি বলতেন যে বাচ্চারা সবাই সব জামাকাপড় খুলে সুইমিং পুলে নামবে, যাতে তাকাহাশির মতন বাচ্চাদের শরীর নিয়ে সব আড়ষ্টতা কেটে যায়। তাকাহাশি, ইয়াসুয়াকি-চানের মতন ছেলেমেয়েরা, যাদের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে চলতে হয়, তারা যাতে অন্যদের তুলনায় নিজেদের কোনো অংশে খাটো মনে না করে, সে কথা ভেবে উনি এমন সব নিয়ম চালু করেছিলেন। উনি নিজে এত করছেন, অথচ কেউ এমন চূড়ান্ত অবিবেচকের মতন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলছে। হেডমাস্টার-মশাই ঠিক বুঝতেই পারছিলেন না যে এটা কী করে সম্ভব হয়। শুধুমাত্র ওকে মিষ্টি লাগছিলো বলে কেউ জিজ্ঞেস করবে ওর ল্যাজ আছে কি না? এটা কী করে হয়? সেই সময়টাতে হেডমাস্টারমশাই তোত্তো-চানদের ক্লাসে এসেছিলেন পড়াশুনো কেমন চলছে, তা দেখবার জন্য, আর পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উনি দিদিমণির এই মন্তব্যটা শুনে ফেলেছিলেন।

দিদিমণি যে ইতিমধ্যে কেঁদে ফেলেছেন, তোত্তো-চান তা বাইরে থেকেই টের পেলো। উনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, 'আমার সত্যিই খুব ভুল হয়ে গেছে। কেমন করে আমি তাকাহাশির কাছে ক্ষমা চাইতে পারি?'

হেডমাস্টারমশাই কিচ্ছু বললেন না। কাচের দরজার ওপারে সব কিছু স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিলো না, কিন্তু কেন যেন তোত্তো-চানের মনে হচ্ছিলো এই সময়টাতে হেডমাস্টারমশাইয়ের পাশে থাকলে ভালো হতো। ব্যাপারটা যে ঠিক কী ঘটেছে তা ও ভাল করে বুঝতে পারেনি, তবু ওর মনে হয়েছিলো যে হেডমাস্টারমশাই ওদের সবার খুব ভালো বন্ধু। ওয়িরও হয়তো একই রকম লেগেছিলো সেদিন।

সেদিন দিদিমণিকে আলাদা করে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বকেছিলেন হেডমাস্টারমশাই, শিক্ষকদের সামনে কিন্তু কিছু বলেননি। এটা তোত্তো-চান কোনোদিন ভুলতে পারেনি। উনি যে একজন প্রকৃত শিক্ষাবিদ ছিলেন, এই ঘটনাটা তারই প্রমাণ। এই ব্যাপারটা বোঝার বয়স অবশ্য তোত্তো-চানের হয়নি। তবু হেডমাস্টারমশাইয়ের সেদিনকার গলার স্বর আর কথাগুলো ওর মনে গেঁথে গিয়েছিলো।

বসন্তকাল আসছিলো। তোমোইতে তোত্তো-চানের দ্বিতীয় বসন্ত। নতুন বছরে নতুন ক্লাস শুরু হবে এবার।

দ্বিতীয় বসন্ত

গাছে গাছে নতুন সবুজ পাতা আর স্কুলের মাঠে নতুন নতুন ফুল—ক্রোকাস, ড্যাফোডিল, প্যান্সি, সবাই যেন মাথা তুলে জিজ্ঞেস করছিলো, 'কেমন আছো?' ট্যুলিপ ফুলের ডাঁটাগুলো লম্বা হতে হতে আরমোড়া ভাঙছিলো যেন! চেরি গাছে মুকুলগুলো হালকা হাওয়ায় মাথা দোলাতে দোলাতে প্রতীক্ষা করছিলো সমস্ত প্রাণ উজাড় করে নিজেদের প্রকাশ করার সময়টার জন্য। স্যুইমিং পুলের পাশের ছোট চৌকো চৌবাচ্চাতে গোল্ডফিশ আর কালো পপাই মাছেরা মনের আনন্দে সাঁতার কেটে চলেছিলো।

'বসন্তকাল এসে গেছে!'—এমন কথা ঘোষণা করবার কিন্তু কোনোই প্রয়োজন ছিলো না। সবকিছু যখন নতুন মনে হয়, সব কিছু যখন ঝরঝরে, ঝকঝকে মনে হয়, তখন বসন্তের আগমন আপনা আপনিই অনুভব করা যায়!

ঠিক এক বছর আগে তোত্তো-চান তোমোই-গাকুয়েনে এসেছিলো মায়ের হাত ধরে। ডালপালা, লতাপাতা জড়ানো গেটটা দেখে ও কত অবাক হয়েছিলো। রেলগাড়ীর মধ্যে পড়াশুনো! কী মজা! আনন্দের চোটে ও লাফাতে শুরু করে দিয়েছিলো! আর, হেডমাস্টারমশাই সোসাকু কোবায়াশিকে দেখে ও কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলো যে উনি ওর বন্ধু হবেনই! সেই তোত্তো-চান এখন ক্লাস টু'র ছাত্রী, বেশ বড় বড়, বিজ্ঞ বিজ্ঞভাব, আর ক্লাস ওয়ানের নতুনরা ওরই মতন এদিক ওদিকে দেখছিলো—চোখে বিস্ময় মাখানো।

গত বছরটা ধরে কত কিছুই তো ঘটলো! তোত্তো-চান প্রতীক্ষা করে থাকতো এক একটা নতুন দিনের জন্য। রাস্তার বাজনদারদের ওর এখনো ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু এখন ও আরো অনেক কিছুকে ভালবাসতে শিখেছে। সকলকে বিরক্ত করতো বলে একদিন যাকে, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, আজ সে-ই তোমোইর উপযুক্ত ছাত্রী হয়ে উঠেছে।

তোমোইর লেখাপড়ার পদ্ধতিটাকে সমস্ত অভিভাবক কিন্তু সুনজরে দেখতে পারতেন না। এমন কি মা বাবাও কখনো কখনো ভাবতেন, তোত্তো-চানকে এই স্কুলে দিয়ে ঠিক করেছেন কি না। যে বাবা মায়েরা সোসাকু কোবায়াশির শিক্ষাপদ্ধতির ওপর আস্থা রাখতে পারতেন না, যাঁরা মনে করতেন যে ওই পদ্ধতির মধ্যে একটা অন্তঃসার শূন্যতা আছে, তাঁরা কেউ কেউ ভয় পেয়ে ছেলেমেয়েদের এই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করতেন। ছেলেমেয়েরা কিন্তু কেউ এই স্কুল ছেড়ে যেতে চাইতো না। ওরা তখন খুব কাঁদতো। ভাগ্য ভালো যে তোত্তো-চানের ক্লাসের কেউ চলে যাচ্ছিলো না, কিন্তু ওর ওপরের ক্লাসের একটি ছেলেকে তার বাবা মা ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বেচারার তখন কী যে কষ্ট! দুচোখ দিয়ে জল ঝরছে, মাটির মধ্যে আছাড়ে পড়ার ফলে পা ছড়ে গেছে; অভিমানে, দুঃখে ও সেদিন হেডমাস্টারমশাইয়ের পিঠে দুমদুম করে কিল মেরে চলেছিলো। হেডমাস্টারমশাইয়ের

চোখও কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গিয়েছিলো। ছেলেটিকে শেষমেষ ওর মা বাবা কোনো রকমে স্কুল থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। যেতে যেতে কেবলই সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিলো, আর হাত নেড়ে চলেছিলো। এরকম করুণ ঘটনা অবশ্য খুব বেশি ঘটতো না।

এদিকে, তোত্তো-চান এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, পিঠের ব্যাগটা এক বছর ধরে সঙ্গে চলে চলে ওর বন্ধু হয়ে গেছে। আরো কত মজা না জানি অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য!

সোয়ান লেক

তোত্তো-চান হিবিয়া হলে গিয়েছিলো 'সোয়ান লেক' ব্যালে নৃত্যনাট্য দেখতে। বাবা সেখানে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। একক অংশও ছিলো বাবার। আর ব্যালে দলটা খুবই প্রসিদ্ধ ছিলো। এই প্রথম তোত্তো-চানের ব্যালে দেখতে যাওয়া। রাজহাঁসদের রানী যে সেজেছিলো, সে মাথায় একটা ছোট্ট জ্বলজ্বলে মুকুট পরেছিলো আর এমন অনায়াসে হাওয়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলো, ঠিক যেন সত্যিকারের রাজহাঁস-রানী। অন্তত তোত্তো-চানের তো তা-ই মনে হচ্ছিলো। রাজপুত্র তো রাজহাঁস-রানীকে ভালবেসে ফেললো আর অন্য সকলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে লাগলো। শেষে দুজনে কী অপূর্ব সুন্দর করে নেচেছিলো! 'সোয়ান লেক'-এর সুরটাও তোত্তো-চানকে খুব মুগ্ধ করেছিলো। বাড়ি ফিরে ও কিছুতেই সেই সুর আর দৃশ্য ভুলতে পারছিলো না। পরদিন ঘুম থেকে উঠে, চুল না আঁচড়িয়েই তোত্তো-চান সোজা রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বললো, 'আমি ওই সব গুপ্তচরটর আর হতে চাই না, রাস্তার বাজনাওয়ালাও না। আমি ব্যালেরিনা হয়ে 'সোয়ান লেক'-এ নাচবো!'

'ও আচ্ছা।' মা যেন একটুও অবাক হলেন না।

এই প্রথম তোত্তো-চান ব্যালে দেখতে গিয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে আমেরিকার অসাধারণ নৃত্যশিল্পী, ইসাডোরা ডানকানের কথা ও আগে বহুবার শুনেছে। মিস্টার কোবায়াশির ওপর যেমন, ইসাডোরা ডানকানের ওপরেও তেমনি জাক্স্ ডালক্রোসের বিরাট প্রভাব পড়েছিলো। হেডমাস্টারমশাই ইসাডোরা ডানকানকে খুব পছন্দ করতেন। তোত্তো-চানের জন্য সেটাই যথেষ্ট ছিলো। ওর মনে হতো ও-ও বুঝি ইসাডোরা ডানকানকে খুব ভালো করে চেনে। অতএব বড় হয়ে ও যে নৃত্যশিল্পী হবে, এতে আর আশ্চর্যের কী থাকতে পারে?

এদিকে, মিস্টার কোবায়াশির এক বন্ধু, যিনি ওদের স্কুলে ইউরিদমিক্স শেখাতে আসতেন, তাঁর একটা নাচের স্টুডিও ছিলো তোত্তো-চানের বাড়ির কাছে। তোত্তো-চান যাতে সেখানে নাচ শিখতে পারে, মা তার ব্যবস্থা করলেন। মা কক্ষণো তোত্তো-চানকে কোনো কিছু করতে জোর করতেন না, আবার কোনো সখে বাধাও দিতেন

না—কিছু একটা করতে চাইলে তেমন কোনো প্রশ্ন না করেই ওকে তা করার সুযোগ করে দিতেন।

তোত্তো-চান নাচের ক্লাসে যেতে শুরু করলো। আর অপেক্ষা করে রইলো সেই দিনটার জন্য, যেদিন ও 'সোয়ান লেক' নাচতে পারবে। এই মাস্টারমশাইয়ের অবশ্য নাচ শেখাবার কিছু নিজস্ব পদ্ধতি ছিলো। তোমোই-তে যে ধরনের ইউরিদমিক্স করানো হতো, তার বাইরেও উনি নানান সুর বাজাতেন পিয়ানোতে। কখনো আবার রেকর্ড চালিয়ে দিতেন। ছোটদের সেইসব সুরের তালে তালে নাচতে বলতেন। সেই নাচের সঙ্গে ওদের আবার মনে মনে কিছু একটা ছড়া বা মন্ত্র উচ্চারণ করতে হতো। যেমন, ফুজি পাহাড়ে ওঠার সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা একটা স্তোত্র বলে থাকে, তা হলো : 'হৃদয় পবিত্র করো; পর্বত শিখরে তুমি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলো'। হয়তো সেই স্তোত্রের একটা অংশ নাচবার সময় ওদের মনে মনে বলতে বলতেন মাস্টারমশাই—'পর্বত শিখরে তুমি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলো', 'পর্বত শিখরে তুমি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলো'। এইভাবে নাচ চলছে, এমন সময় মাস্টারমশাই হঠাৎ করে নির্দেশ দিলেন, 'ব্যাস্, এবার সবাই স্থির হয়ে যাও!' অমনি সকলকে কিছু একটা বিশেষ ভঙ্গী করে মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হতো। মাস্টারমশাই নিজেও গম্ভীর গলায় 'আহা!' জাতীয় কিছু একটা বলে উঠতেন। আর, তক্ষুণি আকাশের দিকে চেয়ে থাকার ভঙ্গী করে, অথবা ব্যথায় কাতর কোনো মানুষের মতন দু হাত দিয়ে মাথাটাকে চেপে ধরে, শরীরটাকে কুঁকড়ে নিয়ে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন।

কিন্তু, এইসব 'পর্বত শিখর' আর 'আহা'-টাহায় মন ভরছিলো না তোত্তো-চানের। তার চোখের সামনে তখন একটাই ছবি ভাসতো—সোয়ান পাখি সেই রাজহাঁস রাণি সাদা কুচি কুচি জামা আর জ্বলজ্বলে মুকুট পরে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

একদিন খুব সাহস করে তোত্তো-চান মাস্টারমশাইয়ের দিকে এগিয়ে গেলো। পুরুষ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মাস্টারমশাইয়ের মাথা ভরা কোঁকড়ানো চুল ছিলো। এগিয়ে গিয়ে তোত্তো-চান ওর দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে রাজহাঁসের মতন ডানা ঝাপটাতে লাগলো। 'এরকম কি আমরা কোনোদিন করবো না?' ও জিজ্ঞেস করলো।

টিকোলো নাক, বড় বড় চোখ—মাস্টারমশাইকে দেখতে ভারি সুন্দর ছিলো। 'এখানে আমরা ওইরকম নাচ করি না,' উনি বললেন।

সেই থেকে তোত্তো-চান নাচের ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিলো। খালি পায়ে। ব্যালের জুতো না পরে হাওয়ার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠার ব্যাপারটা ওর বেশ ভালো লাগতো সত্যিই, মাঝে মাঝে হঠাৎ করে কিছু একটা পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেও ভালোই লাগতো। কিন্তু ওর যে আসল ইচ্ছে ছিলো ওরকম একটা জ্বলজ্বলে মুকুট পরে নাচার!

'সোয়ান লেক নিশ্চয় ভালো,' মাস্টারমশাই বলেছিলেন, 'কিন্তু তুমি যদি নিজের

খেয়ালখুশি মতন নাচার আনন্দটা অনুভব করতে পারতে, আমার তাহলে খুব ভালো লাগতো।'

অনেক অনেক বছর পর তোত্তো-চান জেনেছিলো যে ওর সেই মাস্টারমশাইয়ের নাম ছিলো বাকু ইশিই। বাকু ইশিই জাপানে আধুনিক ব্যালে নৃত্য নিয়ে এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, জিয়ুগায়োকা জায়গাটার নামকরণও উনিই করেছিলেন; জিয়ুগায়োকা, অর্থাৎ 'মুক্ত পাহাড়'। আরো বড় কথা হলো, সে সময় ইশিইর বয়স নাকি ছিলো পঞ্চাশ বছর! ভাবো একবার! পঞ্চাশ বছরের এক নৃত্যশিল্পী খুদে তোত্তো-চানকে নৃত্যে মুক্তচিন্তা কেমন করে আনতে হয়, তা শেখাতে চেয়েছিলেন।

কৃষিকাজের মাস্টারমশাই

'আজকের জন্য ইনি তোমাদের মাস্টারমশাই। তোমরা এঁর কাছে অনেক কাজ শিখবে।' হেডমাস্টারমশাই একজন নতুন শিক্ষকের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তোত্তো-চান ভালো করে তাকিয়ে দেখলো মানুষটাকে। প্রথমত, ওঁর পোশাক আশাক কিছুই অন্য শিক্ষকদের মতন ছিলো না—গেঞ্জির ওপরে একটা ছোট ডুরে কাটা জ্যাকেট পরা, গলায় কোনো নেকটাই নেই, তার বদলে একখানা গামছা ঝুলছে। নীল রং-এর চাপা প্যান্টটাতে অজস্র তালি। পায়ে জুতো নেই, একজোড়া আঙুল কাটা মোজা, নিচটাতে চামড়া দেওয়া। আর মাথায় একটা বেশ ভাঙাচোরা খড়ের টুপি।

কুহনবুৎসু মন্দিরের পুকুরটার পাশে ছেলেমেয়েরা সবাই জড়ো হয়েছিলো।

এই নতুন মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তোত্তো-চানের মনে হচ্ছিলো মুখটা যেন চেনা চেনা। কোথায় দেখেছি? ও মনে করার চেষ্টা করতে থাকলো। মুখটা রোদে পুড়ে পুড়ে গেছে, কুচকানো চামড়া। সব কিছুই চেনা চেনা, মায় কোমর থেকে ঝোলানো কালো সুতো আর তাতে বাঁধা ছোট সরু পাইপটা পর্যন্ত। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল!

'তুমিই রোজ নদীর ধারে মাঠটাতে কাজ করো না?' ও খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'ঠিক বলেছো,' দাঁত বার করে হেসে উত্তর দিলেন ওদের নতুন মাস্টারমশাই। হাসবার সময় ওঁর মুখটা যেন আরো কুঁচকে গেল। 'তোমরা তো সব সময় আমার মাঠের পাশ দিয়েই হাঁটতে যাও। ওই যে সর্ষের ক্ষেত্রটা দেখছো? ওইটা গো!'

'আরে! আজকে তুমি আমাদের মাস্টারমশাই?' সবাই হৈ হৈ করে উঠলো।

'না গো না,' খুব করে হাত নেড়ে আপত্তি জানালেন ওই মাস্টারমশাই। 'আমি মাস্টার টাস্টার নই। আমি তো শুধু ক্ষেতে কাজ করি। তোমাদের এই হেডস্যার বললেন, তাই আমি আসলাম আর কি!'

'অবশ্যই! অবশ্যই উনি তোমাদের আজকের মাস্টারমশাই ওঁর কাছে তোমরা

কৃষিকাজ শিখবে। উনি অনুগ্রহ করে আজ তোমাদের সঙ্গে এই সময়টা কাটাতে এসেছেন; আজ তোমরা শিখবে কেমন করে মাঠে গাছ বুনতে হয়। পাউরুটি যিনি বানান তাঁর কাছে যেমন তোমরা পাউরুটি বানাতে শিখতে পারো, ব্যাপারটা ঠিক তেমনি।' তারপর, নতুন মাস্টারমশাইয়ের দিকে ফিরে হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'এবার তাহলে আপনি কাজ শুরু করে দিন।'

অন্যান্য প্রাথমিক স্কুলে কেবলমাত্র বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরাই শিশুদের পড়াবার দায়িত্ব পেয়ে থাকেন। কিন্তু মিস্টার কোবায়াশি এইসব নিয়ম মানতেন না। উনি মনে করতেন যে বাচ্চাদের হাতে করে, প্রত্যক্ষভাবে কিছু শেখালে ওরা খুব ভাল করে তা শিখতে পারে।

'শুরু করি আমরা?' কৃষিকাজের মাস্টারমশাই বললেন।

যেখানে ওরা জড়ো হয়েছিলো, কুহনবুৎসু দীঘির ধারের সেই মাঠটা ছিলো শান্ত, স্তব্ধ, ছায়া ঘেরা। হেডমাস্টারমশাই আগে থেকেই একটা রেলগাড়ির ভাঙা কামরা ওখানে এনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। তার মধ্যে ছেলেমেয়েদের চাষের সব যন্ত্রপাতি—কোদাল, শাবল—রাখা ছিলো। সবকিছু সুন্দর করে সাজানো ছিলো ওই ভাঙা রেলগাড়িটার মধ্যে ওদের চাষের জমির মাঝখানে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো গাড়িটা।

প্রথম কাজ আগাছা তোলা। কৃষিকাজের মাস্টারমশাই ছেলেমেয়েদের আগাছার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন : কেমন করে একটা ফাঁকা জমি খুব সহজেই আগাছায় ভরে যায়, আগাছা নির্মূল করা কত কঠিন কাজ, আগাছার ভেতরে কেমন দুষ্টু পোকারা লুকিয়ে থাকে, আগাছারা কেমন ফসলের জমির সব রস শুষে নেয়, এইসব কথা। কথা বলতে বলতে উনি দু হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলে দিতে থাকলেন। এক মুহূর্তের জন্যেও ওঁর হাত থামছিলো না। ছেলেমেয়েরাও ওঁর দেখাদেখি আগাছা তুলতে থাকলো। তারপর ওদের মাটি কোপাতে শেখালেন মাস্টারমশাই, তারপর জমিটাকে ছোট ছোট অংশে কেমন করে আল দিয়ে ভাগ করতে হয়, সেই কাজটা, তারপর সার দিতে শিখলো ওরা। চাষের সমস্ত কাজই মাস্টারমশাই হাতে করে দেখিয়ে দেখিয়ে আর কথা বলে বলে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

একটা সাপ হঠাৎ মাথা তুলে তা-চানের হাতে প্রায় কামড়ে দিচ্ছিলো। তা-চান তোত্তো-চানের চেয়ে একটু উঁচু ক্লাসে পড়তো। মাস্টারমশাই ওকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'ও সাপ কামড়ায় না গো, ও সাপে বিষ নেই। তুমি ব্যথা না দিলে ও ব্যথা দেবে না।'

কৃষিকাজ শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাই ওদের পোকা-মাকড়, প্রজাপতি, পাখি, প্রকৃতির নানান রূপ—আরো কতসব কথা বুঝিয়ে বলছিলেন। ওঁর সুঠাম হাত দুটি দেখে বোঝা যাচ্ছিলো যে, এইসব কিছুই উনি অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছেন।

কৃষিকাজের মাস্টারমশাইয়ের সাহায্যে জমিটা চষে নিয়ে, ফসল লাগাতে লাগাতে ছেলেমেয়েরা সব ঘেমে চুপচুপে হয়ে গেলো। প্রায় গোটা মাঠটাই সমান ভাবে চাষ করা হয়েছিলো।

সেদিন থেকে সেই কুহনবুৎসুর কৃষকটি ছেলেমেয়েদের কাছে এক অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। দূর থেকে ওঁকে দেখতে পেলেই ওরা চেঁচিয়ে উঠতো—'ওই যে আমাদের কৃষিকাজের মাস্টারমশাই!' আর যখনই মাস্টারমশাইয়ের কাছে একটু বাড়তি সার থাকতো, তখনই সেটা এনে ছেলেমেয়েদের মাঠে বিছিয়ে দিতেন উনি। দিব্যি হচ্ছিলো ওদের ফসল! প্রতিদিন ছেলেমেয়েদের কেউ না কেউ মাঠে গিয়ে দেখে আসতো কতদূর কী হলো, এসে হেডমাস্টারমশাই আর অন্য সকলকে খবর জানাতো। নিজের হাতে লাগানো বীজের গাছ হয়ে ওঠা—প্রকৃতির এই বিস্ময় ওরা বেশ অনুভব করতে পারছিলো। যখনই ওরা দু তিনজন একসঙ্গে হতো, এ কথা সে কথায় অবশ্যম্ভাবীভাবে ফসলের মাঠের প্রসঙ্গ চলে আসতো। পৃথিবীর নানা প্রান্তে তখন নানান ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিলো। কিন্তু তারই মধ্যে তোমোইর শিশুরা যখন ওদের একটুখানি ফসল নিয়ে কথা বলতো, তখন সেই ছোট্ট মাঠের প্রশান্তি ওদের যেন ঘিরে রাখতো।

খোলা প্রান্তর-রন্ধনশালা

একদিন স্কুলের ছুটির পর কারো সঙ্গে একটাও কথা না বলে তোত্তো-চান সোজা জিয়ুগায়োকা স্টেশনে ছুটে গেল। যেতে যেতে ও কেবল একটাই কথা বিড়বিড় করে বলে চলেছিলো—'বজ্রপাথ জলপ্রপাত, খোলা প্রান্তর-রন্ধনশালা, বজ্রপাত জলপ্রপাত, খোলা প্রান্তর রন্ধনশালা...'

ভারি শক্ত শক্ত সব কথা, ছোট একটা মেয়ের জন্যে তো বটেই। 'রাকুগো' নাটকে (হাস্যকৌতুক) এই রকমই একটা ভয়ানক শক্ত কথা ছিলো। গল্পটা খুব মজার : একটি লোকের একটা খুব লম্বা নাম ছিলো। একবার সে খুব বিপদে পড়েছিলো। তখন শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে এসে উদ্ধারকারীরা তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করেছিলো। এমন লম্বা নাম যে, পুরোটা বলার আগেই উদ্ধারকারীরাই লোকটাকে কুয়োর জলে ফেলে দিয়েছিলো!

তোত্তো-চান বারবার মনে মনে 'বজ্রপাত জলপ্রপাত' 'বজ্রপাত জলপ্রপাত' বলে চলেছিলো, পাছে ভুল হয়ে যায়। এমন সময় কেউ যদি ওর কানের কাছে এসে সেই লোকটার ইয়া লম্বা নামটা বলতে শুরু করতো—'জুগেমু-জুগেমু...'—তাহলেই হয়েছিলো আর কি! নির্ঘাত 'বজ্রপাত জলপ্রপাতে'র সবটাই ওর গুবলেট হয়ে যেতো। অন্যদিন পথে জলকাদা থাকলে, তার ওপর দিয়ে লাফ দেওয়ার সময় তোত্তো-চান 'এ-এ-ই এক লাফ!' বলে একটা ডাক দিয়ে ওঠে। কিন্তু আজ সে একেবারে শান্ত হয়ে রইলো।

'বজ্রপাত জলপ্রপাত খোলাপ্রান্তর রন্ধনশালা'—নামতা পড়ার মতন বলে চলেছে তো চলেইছে। ভাগ্যে সেদিন ট্রেনে ওকে কেউ বিরক্ত করেনি! আর ও-ও এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ফেলেনি! নতুন কিছু একটা দেখে ফেললেই তো মুস্কিল হতো—তখন ওকে সেই জিনিসটা পরীক্ষা করতে হতো; 'আরে ওটা আবার কী!' বলে একবার ডেকেও উঠতে হতো।

স্টেশনে নেমে বেরোতে যাবে, এমন সময় রেলেরই এক পরিচিত কর্মী ওকে ডেকে বললেন, 'কী? হয়ে গেলো স্কুল?' একটু হলে ও উত্তর দিয়ে ফেলেছিলো আর কি! এমন সময় নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে, ভদ্রলোককে একটু হাত নেড়ে, ও বাড়ির দিকে এক ছুট দিলো।

বাড়ি দরজায় পৌঁছেই তোত্তো-চান চিৎকার করে মাকে জানালো, 'বজ্রপাত জলপ্রপাত খোলাপ্রান্তর রন্ধনশালা!' প্রথমটায় মা ভাবলেন মেয়ে বুঝি জুডো খেলার কোনো চাল শিখে এসেছে। কিংবা হয়তো সেই সাতচল্লিশজন রোনিন যোদ্ধা সংক্রান্ত কিছু একটা বলছে। তারপর, হঠাৎ কথাটার মানে স্পষ্ট হয়ে গেল মায়ের কাছে।

জিয়ুগায়োকার তিনটে স্টেশন পরে তোদোরোকি স্টেশন। তার কাছেই একটা খুব সুন্দর বেড়াবার জায়গা আছে, যার নাম 'তোদোরোকি কেইকোকু', অর্থাৎ 'বজ্রপাত জলপ্রপাত'—পুরনো তোকিও শহরের একটা বিখ্যাত জায়গা সেটা। একটা ঝর্ণা, একটা নদী আর খুব সুন্দর একটা বন। আর, 'খোলাপ্রান্তর রন্ধনশালা'? মানে নিশ্চয় তোমোই-র ছেলেমেয়েরা ওখানে গিয়ে রান্না করবে! ওরে বাবা! কী কঠিন কঠিন সব শব্দ! কিন্তু, দিব্যি পারে তো ছোটরা এইসব কথা শিখতে!

ওই 'বজ্রপাত জলপ্রপাত'-এর কবল থেকে বেরোতে পেরে তোত্তো-চান যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তখন ও মাকে গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো। আগামী শুক্রবার সকালবেলায় ওরা সবাই স্কুলে জড়ো হবে। একটা স্যুপ খাবার বাটি, এক জোড়া চপস্টিক আর এক কাপ চাল নিয়ে যেতে হবে সকলকে। 'হেডমাস্টারমশাই বলেছেন যে এক কাপ চাল থেকে দু বাটি ভাত হয়, তোত্তো-চান মনে করে বললো। ওরা শুয়োরের মাংস দিয়ে স্যুপ বানাবে, তাই একটু মাংস আর সবজিও নিয়ে যেতে হবে। আর, চাইলে বিকেলে খাবার জন্য টুকিটাকি যা হোক একটা কিছু নিয়ে যেতে পারে।

এরপর কয়েকটা দিন তোত্তো-চান খুব মায়ের গায়ে গায়ে লেগে থাকলো আর ভালো করে দেখে নিলো কেমন করে মা তরকারি কাটেন, কেমন করে গরম কোনো বাসন ধরেন, কেমন করে ভাত বাড়েন। এইসব দেখতে ওর দারুণ লাগতো, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগতো যখন গরম কোনো ঢাকনাতে মায়ের হাত পড়ে যেতো। অমনি মা 'উফ্, কী গরম!' বলে কানের লতিটা ধরে ফেলতেন! এটা দেখতে তোত্তো-চানের দারুণ লাগতো। 'কানের লতিগুলো অনেক ঠাণ্ডা থাকে,' মা বলেছিলেন।

তোত্তো-চানের মনে হয়েছিলো যে মা যেহেতু বয়সে অনেক বড় আর অনেক বেশি অভিজ্ঞ, তাই নিশ্চয় ওইভাবে কানটা ধরতে পারেন। নিজের মনে মনে ও ঠিক করলো যে 'বজ্রপাত জলপ্রপাত, খোলা প্রান্তর-রন্ধনশালা'তে গিয়ে ও-ও ওরকম করে গরম কিছু ধরে ফেলার পর কানের লতিতে হাত ঠেকাবে।

শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সকাল তো এলো। ট্রেন থেকে নেমে 'বজ্রপাত জলপ্রপাতে' পৌঁছে বনের ভেতরে ঢোকার পর হেডমাস্টারমশাই ওদের সকলকে ভালো করে দেখে নিলেন। উঁচু উঁচু গাছের পাতার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছিলো বনের মেঝের ওপরে। সেই আলোতে ছোটদের মুখগুলো খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো। ওদের পিঠের ব্যাগগুলোর পেট ফুলে গিয়েছিলো, হেডমাস্টারমশাই সেটা খেয়াল করলেন। ওরা অপেক্ষা করেছিলো উনি কী বলবেন তা শোনার জন্য, ওদিকে পেছনে ঝর্ণাটা ঝরঝর করে ঝরছিলো, আশ্চর্য সুন্দর তালে তালে।



'শোনো', হেডমাস্টারমশাই বলতে শুরু করলেন, 'প্রথমে আমরা কতগুলো ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাবো। তারপর মাস্টারমশাই আর দিদিমণিরা যে ইটগুলো সঙ্গে করে এনেছেন, তা দিয়ে কতগুলো উনুন বানাবো। তোমরা কয়েকজন চাল ধুয়ে ভাত চড়াতে পারো। ভাত হয়ে গেলে আমরা স্যুপটা বানাবো। ঠিক আছে? এবার শুরু করি?'

ছেলেমেয়েরা 'দশ কুড়ি নাড়িভুঁড়ি' গুণে দলে দলে ভাগ হয়ে গেলো। কেবল পঞ্চাশজন মতন ছিলো বলে ওরা সহজেই ছটা ছোট দল তৈরি করে ফেললো। তারপর মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ইট দিয়ে তার চারপাশে বেড়া দিয়ে দিলো। তার উপরে লোহার শিক সাজিয়ে দিলো যাতে রান্নার বাসনটা রাখা যায়। এবার কেউ কেউ গেলো বন থেকে জ্বালানি কাঠ কুড়োতে আর কেউ গেলো ছোট্ট নদীটাতে চাল ধুতে। ওরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সব কাজ ভাগাভাগি করে নিলো। তোত্তো-চান বললো যে ও স্যুপের দায়িত্বটা নিতে চায় এবং সবজি কাটতে চায়। ওর চেয়ে দু ক্লাস ওপরের একটি ছেলেও সবজি কাটার কাজটা পেলো। কিন্তু ছেলেটি হয় বেশি বড় বড় টুকরো করে ফেলছিলো, নয়তো বেশি ছোট করে সব হিজিবিজি করে দিচ্ছিলো। তাই বলে ওর উৎসাহে কোনো ঘাটতি ছিলো না—উত্তেজনায় ওর নাকের ডগাটা ঘাম-চকচকে হয়ে গিয়েছিলো! তোত্তো-চান তো মায়ের মতন করে সুন্দরভাবে সবার আনা বেগুন, আলু, পেঁয়াজ, বার্ডকের শিকড়, সব কেটে ফেললো। ওর কাটাটা ঠিক মাপ মতন হয়েছিলো। এমন কি ও বেগুন আর শশা খুব পাতলা পাতলা করে কেটে, তাতে নুন মাখিয়ে দিব্যি একটা আচারও তৈরি করে ফেললো। আবার ছেলেমেয়েরা যখন তাদের কাজ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলো, তখন ও তাদের উপদেশও দিতে লাগলো, এই করো ওই করো বলে। তোত্তো-চানের সত্যিই নিজেকে বেশ মা মা মনে হচ্ছিলো। ওর আচারটা দেখে তো সবাই বেশ অবাক হলো। ও তখন বিনয়ের সুরে বললো, 'এই ভাবলাম একটু চেষ্টা করে দেখি একটা আচার করতে পারি কি না!'

মাংসের সুরুয়াটা রান্না করার সময় সবাই নানা রকমের সব মতামত জানাতে শুরু করলো। এ বেলা 'আহ্!' ও বলে 'ওহ্!' হাহা হিহি হোহা—সবাই তো হেসে গড়িয়েই পড়ছিলো। বনের পাখিরাও কিচিরমিচির করে উৎসবের আনন্দে যোগ দিলো। ইতিমধ্যে নানান উনুন থেকে নানান রকমের চমৎকার লোভনীয় সব গন্ধ ভেসে আসছিলো। এর আগে কেউই তেমন করে কোনো কিছু রান্না হতে দ্যাখেনি, উনুনের আঁচ কমানো, বাড়ানো, এসবও কখনো করেনি। টেবিলের ওপর তৈরি খাবার দেখেছে। কেউ খাবার বেড়ে দিয়েছে, আর ওরা স্রেফ সেই খাবারটা খেয়েছে। রান্না করার যে তৃপ্তি, চোখের সামনে সব উপকরণের চেহারা পাল্টে পাল্টে যেতে দেখা—আনন্দ আর আশঙ্কা মিলে সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা ছিলো ওদের কাছে।

অবশেষে প্রত্যেক উনুনেরই আঁচ নেভানোর সময় এলো। হেডমাস্টারমশাই

বললেন যে এবার সবাই ঘাসের উপর জায়গা করে গোল হয়ে বসবে। প্রত্যেক দলের সামনে এক বাটি স্যুপ আর এক বাটি ভাত রাখা হলো। কিন্তু তোত্তো-চান তো কিছুতেই ওর দলের স্যুপের বাটিটাকে সরাতে দেবে না, মায়ের মতন করে কানের লতিতে হাত রাখতে হবে না ওর? তাই হাত দিয়ে স্যুপের ঢাকনাটা সারিয়ে, বেশ আত্মসচেতন ভাবে তোত্তো-চান বলে উঠলো, 'উফ্ কী গরম!' বলেই দুটো হাত দিয়ে দুই কানের লতি চেপে ধরলো। এটা করার পর ও স্যুপটা নিয়ে যাবার অনুমতি দিলো। বাকিরা সবাই ভাবছিলো, হচ্ছেটা কী? এই কান চেপে ধরা দেখে কেউই তেমন অভিভূত হলো না। তা, কেউ কিছু ভাবুক আর না ভাবুক, তোত্তো-চানের কিন্তু ব্যাপারটা খুবই ভালো লেগেছিলো।

সবার দৃষ্টি তখন ভাত আর স্যুপের বাটির ওপরে। খিদেও পেয়ে গিয়েছিলো খুব। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ তো ওদের নিজেদের রান্না করা খাবার! চিবিয়ে খাওয়ার গানটা গেয়ে, 'খেতে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি'-র প্রার্থনাটুকু সেরে নিয়ে ওরা খাওয়া শুরু করলো। খানিক বাদে সব চুপচাপ। কেবল দূর থেকে ঝর্ণার ঝরঝর শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

তুমি কিন্তু সত্যিই খুব ভালো মেয়ে!

'জানো, তুমি কিন্তু সত্যিই খুব ভালো মেয়ে!' যখনই তোত্তো-চানকে দেখতেন, তখনই কথাটা বলতেন হেডমাস্টারমশাই। আর কথাটা শোনামাত্র তোত্তো-চান খুশি হয়ে একটু লাফিয়ে, একটু হেসে বলতো, 'জানি। আমি সত্যিই খুব ভালো মেয়ে!' কথাটা ও মনে মনে বিশ্বাস করতো।

ভালো মেয়ে তো নিশ্চয়ই, অনেক দিক থেকেই ও খুব ভালো মেয়ে। সবার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতো, এগিয়ে গিয়ে সবাইকে সাহায্য করতো, বিশেষ করে ওর দুর্বল, প্রতিবন্ধী বন্ধুদের। সব সময় ওদের আগলে আগলে রাখতো। অন্য স্কুলের কেউ যদি ওদের কোনো খারাপ কথা বলতো বা ওদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করতো, অমনি ও ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের সঙ্গে ঝগড়া, মারপিট করে আসতো, যদিও তার জন্য অনেক সময়ই ওকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরতে হতো। তবু, এত সব ভালো ভালো কাজ করা সত্ত্বেও ও যে কতবার কত রকমের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তো, সেটা ভাবলে অবাক হতে হয়। ওর শিক্ষকরা সবাই তাই মনে করতেন। যখনই ও নিজের কৌতূহল মেটাতে যেতো, যখনই ও নতুন কিছু একটা দেখতো, তখনই ও কিছু না কিছু একটা গোলমাল করে ফেলতো।

বেণী দুটোকে বগলের তলায় ঢুকিয়ে, কেবল তার ডগাটুকু বার করে, ও স্কুলের সকালবেলার সভায় গিয়ে হাজির হতো। ভাবো একবার! একদিন, ওদের রেলগাড়ি-ক্লাসরুমটা ঝাঁট দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছে তোত্তো-চানের। ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেলে

পরে ও কামরার কোণায় যে একটা ঢাকনা মতন জিনিস ছিলো, সেটা তুলে নিচের গর্তটার মধ্যে সবটা ধুলো ঢুকিয়ে দিলো। পরে আর ঢাকনা বন্ধ করা যায় না। কী যে ঝামেলা হয়েছিলো সেদিন, কী বলবো!

আর একবার, কে যেন ওকে বলেছিলো যে কাঁচা মাংস নাকি আঁকসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। অমনি তোত্তো-চান ওদের ব্যায়ামের ঘরে গিয়ে উঁচু একটা শিক থেকে এক হাত দিয়ে ঝুলে পড়লো। ওইভাবে ও বহুক্ষণ ঝুলে রইলো। যতক্ষণ না একজন দিদিমণি ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে ব্যাপারটা কী হচ্ছে? 'আজকে আমি এক টুকরো কাঁচা মাংস হয়ে গেছি।' ঝুলন্ত অবস্থা থেকেই বলে উঠলো তোত্তো-চান। কিন্তু যেই না বলা, অমনি ও হাত ফসকে দুম করে নিচে পড়ে গেলো। এত জোরে পড়ে গিয়েছিলো ও সেদিন, আর বুকে এমন চোট পেয়েছিলো যে সারাদিন আর কথাই বলতে পারেনি। আর, সেই যে বাথরুমের ট্যাঙ্কে পড়ে যাওয়ার ঘটনাটা, সেটা তো আগেই বলেছি।

এভাবে প্রায়ই নানান গোলমাল বাঁধাতো তোত্তো-চান আর কেটে, ছড়ে একসা হতো, তবু হেডমাস্টারমশাই কিন্তু কোনোদিনই ওর বাবা মাকে তলব করেননি। অন্য বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম ছিলো। স্কুলের ব্যাপার সব সময় হেডমাস্টারমশাই স্কুলেই মিটিয়ে দিতেন। যেমন করে উনি সেই প্রথম দিন চার ঘণ্টা ধরে তোত্তো-চানের বকর বকর শুনেছিলেন, তেমনি করেই যে কোনো শিশুর বক্তব্য শুনতেন। কেউ কখনো ভুল করে ফেলে অজুহাত দিতে চাইতো যদি, সেটাও শুনতেন। যদি কেউ কোনো সত্যিকারের অন্যায় করে ফেলতো আর করে বুঝতো যে কাজটা করা ঠিক হয়নি, তখন উনি বলতেন, 'এবার তাহলে তোমার ক্ষমা চাইতে হবে।'

তোত্তো-চান সম্পর্কে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের নালিশ নিশ্চয় হেডমাস্টার-মশাইয়ের কানে গিয়ে পৌঁছুতো। সে জন্যই যখনই উনি সুযোগ পেতেন তখনই একবার তোত্তো-চানকে বলে দিতেন, 'জানো তো, তুমি কিন্তু সত্যিই খুব ভালো মেয়ে!' বড়রা কেউ যদি কথাটা শুনতো তাহলে ঠিকই বুঝতে পারতো 'সত্যি'র ওপর এই জোর দেওয়ার আসল অর্থটা কী।

হেডমাস্টারমশাই নিশ্চয় তোত্তো-চানকে এরকম একটা কিছু বলতে চাইতেন : 'কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারে যে, তুমি খুব একটা ভালো নও, কিন্তু তোমার মনের ভেতরটা মোটেও খারাপ নয়। তোমার মধ্যে অনেক ভালো গুণ আছে। সেটা আমি খুবই ভালো করে জানি।' হায় রে! এই আসল কথাটা তো তোত্তো-চান কত বড় হয়ে বুঝেছিলো। তবু কথাটার একটা কোনো অর্থ অবশ্যই ওর কাছে পৌঁছুতো। ওর মধ্যে একটা বোধ তৈরি হয়েছিলো যে ও 'ভালো মেয়ে'। যখন মনে মনে কিছু একটা দুষ্টুমির কথা ভাবতো, তখনও এই কথাটা ওর কানে বাজতো। মাঝে মাঝে নিজের নানান কীর্তির কথা ভাবতে গেলে ওর মনে হতো, 'হায় ঈশ্বর!'

সোসাকু কোবায়াশি বার বার তোত্তো-চানকে কথাটা বলতেন : 'জানো তো, তুমি কিন্তু সত্যিই খুব ভালো মেয়ে!' এই কথাটাই হয়তো ওর জীবনকে একটা দিশা দিয়েছিলো।

বউ

তোত্তো-চানের খুব মন খারাপ।

ও এখন ক্লাস থ্রির ছাত্রী আর তাই-চানকে ওর খুব পছন্দ হচ্ছিলো। তাই-চান ছিলো লেখাপড়ায় খুব ভালো, বিশেষ করে বিজ্ঞানে। ও ইংরেজি শিখতো, তোত্তো-চানকে শেয়াল শব্দের ইংরেজি তো ও-ই শিখিয়েছিলো। 'জানিস 'কিতসুনে'কে ইংরেজিতে কী বলে? বলে, 'ফক্স্'।'

'ফক্স্,' তোত্তো-চান বলার চেষ্টা করেছিলো। শব্দটা সারাদিন ধরে তোত্তো-চানকে মুগ্ধ করে রেখেছিলো। রেলগাড়ি-ক্লাসে ঢুকে তোত্তো-চানের প্রতিদিনকার প্রথম কাজ ছিলো তাই-চানের পেন্সিলগুলো যত্ন করে কেটে রাখা। নিজেরগুলো নিয়ে কিন্তু কোনো মাথাব্যথা ছিলো না ওর, কোনো রকমে দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে নিতো সেগুলো।

এত শত সত্ত্বেও তাই-চান ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলো। ঘটনাটা ঘটলো দুপুরের খাওয়ার সময়। হলঘরের পিছনের সেই বিখ্যাত ট্যাঙ্কের আশপাশ দিয়ে ও ঘুর ঘুর করছিলো। 'তোত্তো-চান'!' তাই-চানের গলার স্বরটা খুব রাগ রাগ শোনাচ্ছিলো।



একটু থেমে, একটু নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে তাই-চান বললো, 'বড় হয়ে আমি কিছুতেই তোকে বিয়ে করবো না, যতই তুই বিয়ে করতে বলিস না কেন।' এই বলে, মাটির দিকে চোখ রেখে, ও হেঁটে চলে গেলো।

তোত্তো-চান স্তম্ভিত হয়ে গেলো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও তাই-চানের চলে যাওয়াটা দেখতে লাগলো। ওর মস্ত বড় মাথাটা তোত্তো-চানের চোখের আড়ালে চলে গেলো। সেই মাথা, যার ভিতরে বুদ্ধি একেবারে গিজগিজ করছে। শরীরের তুলনায় অনেক বড় একটা মাথা, বন্ধুরা তাই ওর নাম দিয়েছিলো 'অসম ভগ্নাংশ'।

জামার পকেটের ভেতরে হাত দুটো ঢুকিয়ে তোত্তো-চান ভাবতে লাগলো : 'কিছু ভুল করে ফেলেছি কি? কই না তো?' কী করবে বুঝতে না পেরে ও মিয়ো-চানকে কথাটা বললো। সবটা শুনে মিয়ো-চান বড়দের মতন করে বললো, 'হবেই তো! তুই যে সেদিন 'সুমো' কুস্তি করার সময় তাই-চানকে পটকে দিয়েছিলি, তাই তো ও ক্ষেপে আগুন হয়ে গেছে। ওরকম একটা ভারি মাথা নিয়ে তাল সামলাতে না পারা তো স্বাভাবিক!'

তোত্তো-চানের খুব আফ্‌সোস হতে থাকলো। ইস্! কেন ও ওরকম করতে গেলো? ঠিকই কথা, সেদিন ওর প্রিয় তাই-চানকে ও কুস্তিতে হারিয়ে দিয়েছিলো। যার পেন্সিল ও অত যত্ন করে কেটে রাখে রোজ, তাকে কখনো পটকে দিতে আছে? এখন আর কী করা? তো কিছুই করা যাবে না। তোত্তো-চানের আর তাই-চানের সঙ্গে বিয়ে হবে না।

'তবু আমি রোজ ওর পেন্সিল কেটে দেবো,' তোত্তো-চান মনে মনে সংকল্প করলো। 'আমি তো ওকে ভালোবাসি!'

বিচ্ছিরি স্কুল

প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা ছড়ার গান খুব চলতো! তোত্তো-চানের আগের স্কুলে ওরা প্রায়ই গানটা গাইতো। স্কুল ছুটির পর বেরোবার সময়, গেটের বাইরে এসে পেছন ফিরেই ওরা বলতো :

আকমাতসু স্কুল, বিচ্ছিরি স্কুল;
ভিতরে অবশ্য খুব দারুণ ইস্কুল!

অন্য স্কুলের বাচ্চারা যখন ওদের স্কুলের সামনে দিয়ে যেতো তখন ওদের স্কুলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতো :

আকমাতসু স্কুল, দারুণ ইস্কুল;
ভিতরে অবশ্য খুব বিচ্ছিরি স্কুল!

তারপর মুখ দিয়ে একটা বিচ্ছিরি শব্দ করতো।

একটা স্কুল বিচ্ছিরি না দারুণ, সেটা নির্ভর করতো স্কুলের বাড়িটা পুরনো না

নতুন, তার ওপরে। কিন্তু আসল ছিলো ওই দ্বিতীয় লাইন। ওতে বলা হতো স্কুলটা আসলে কেমন—বাইরেটা ধ্যারধ্যারে, বিচ্ছিরি হলে ক্ষতি নেই, ভেতরটা কেমন, সেটাই আসল কথা। ছড়াটা জনা পাঁচ ছয় ছেলেমেয়ে মিলে এক সঙ্গে হয়ে বলতো।

একদিন দুপুরে রোজকার মতন তোমোইর ছাত্রছাত্রীরা সব বাইরের মাঠে খেলছিলো। শেষ ঘণ্টা বাজা পর্যন্ত ওরা যা খুশি করতে পারতো, তারপর ঘণ্টা বাজলে ওরা আর মাঠে থাকতে পারতো না। হেডমাস্টারমশাই মনে করতেন বাচ্চাদের এই একটু যা খুশি তাই করার সময় দেওয়াটা খুব জরুরি, তাই পড়াশুনোর পর এই খেলার ক্লাসটা ওদের একটু বেশি সময় ধরে চলতো। অন্য স্কুলে কেউ খেলার জন্য এতটা সময় পেতো না। সেদিনও কেউ কেউ বল খেলছিলো, কেউ কেউ ধুলোবালি মেখে ভূত সাজছিলো, কেউ কেউ ফুলগাছের পরিচর্যা করছিলো আর তাই-চানের মতন দু একজন ক্লাসেই থেকে গিয়ে টেস্টটিউব ইত্যাদি নিয়ে কীসব পরীক্ষা করছিলো। কেউ আবার গাছে চড়ে বসেছিলো। আর একটু বড় কয়েকটি মেয়ে সিঁড়িতে বসে গল্পো করছিলো। কেউ কেউ লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ছিলো। সবাই নিজের নিজের মতন করে আনন্দ করছিলো। যেমন, সেই যে আমাদেরা নামের ছেলেটি, যে পশু পাখিদের খুব ভালোবাসতো। সে ব্যস্ত ছিলো রাস্তার একটা বেড়ালের কান পরীক্ষা করা নিয়ে।

হঠাৎ একটা জোর আওয়াজ ভেসে এলো স্কুলের বাইরে থেকে :

তোমোই স্কুল, বিচ্ছিরি স্কুল।
ভিতরেও তেমনি খুব বিচ্ছিরি স্কুল!

একি? এ তো খুব বাজে ব্যাপার! ছড়াটা শোনামাত্র তোত্তো-চান ক্ষেপে উঠলো। ঠিক গেটের পাশেই ও—মানে, সেই ডালপালা লতাপাতা জড়ানো গেটের পাশে আর কি। যাই হোক, ও বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছিলো কথাগুলো। ভাবাই যায় না, ওর স্কুলকে কেউ বাইরে আর ভিতরে, দুদিক থেকেই বিচ্ছিরি বলছে! খুবই রাগ হলো ওর। অন্যেরাও ক্ষেপে গিয়ে গেটের দিকে ছুটে এলো। 'বিচ্ছিরি স্কুল!' বাইরের ছেলেগুলি আবার চেঁচিয়ে উঠলো, আর বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব আওয়াজ করতে করতে ছুটে পালালো।

রাগের চোটে তোত্তো-চান ছেলেগুলির পিছনে ধাওয়া করলো। একদম একলা একলা। কিন্তু ওরা নিমেষের মধ্যে পাশের গলির ভিতরে ঢুকে উধাও হয়ে গেলো। তোত্তো-চান খুব খাপ্পা হয়ে স্কুলের দিকে ফিরে এলো। ফেরার পথে ও গাইতে শুরু করলো :

তোমোই স্কুল, চমৎকার স্কুল;

কয়েক পা এগিয়ে ও আরো একটা লাইন জুড়ে দিলো :

ভিতরে আর বাইরে, খুবই চমৎকার স্কুল!

গানটা ওর বেশ মনে ধরলো; ওই লাইন দুটো গাইবার পর ওর মনটা একটু হালকা হয়ে গেলো যেন। তাই স্কুলের সামনে পৌঁছে ও জোরে জোরে গানটা গাইতে শুরু করলো যাতে সবাই শুনতে পারে। ঝোপের বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে ও এমন একটা ভাব করছিলো, যেন ও অন্য স্কুলের ছাত্রী।

তোমোই স্কুল, চমৎকার স্কুল
ভিতরে আর বাইরে, খুবই চমৎকার স্কুল!

খেলায় ব্যস্ত ছেলেমেয়েরা প্রথমটায় বুঝতে পারেনি গানটা কে গাইছে। যখন ওরা বুঝতে পারলো যে গলাটা তোত্তো-চানের, তখন সবাই রাস্তার ওপরে বেরিয়ে এলো। তারপর ওরা একে অন্যের হাত ধরে, ওই গানটা গাইতে গাইতে, স্কুলের চারপাশে ঘুরতে লাগলো। সেদিন কেবল ওদের গলাগুলোই এক হয়ে যায়নি, ওদের হৃদয়গুলোও এক হয়ে গিয়েছিলো। তবে সে তো ওরা তখন বুঝতে পারেনি। যতই ঘোরে ততই যেন গানটা ওদের পেয়ে বসে :

তোমোই স্কুল, চমৎকার স্কুল;
ভিতরে আর বাইরে খুবই চমৎকার স্কুল!

ওদের এই গান যে হেডমাস্টারমশাইকে কী আনন্দ দিচ্ছিলো, তা তো ওরা জানতো না। উনি অফিসঘরে বসে বসে সবটা শুনতে পাচ্ছিলেন।

যে কোনো শিক্ষাবিদেরই নিশ্চয় এমন লাগে; তবে যাঁরা শিশুদের কথা বেশি করে ভাবেন, তাঁরা একটা স্কুল চালাবার ব্যথা আর যন্ত্রণা, সবটাই একটু বেশি করে অনুভব করেন। তোমোইর মতন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার জন্য এই অনুভূতি নিশ্চয় তীব্রতর ছিলো, তার কারণ তোমোইতে সব কিছু এত অন্যরকমের ছিলো। যাঁরা সাধারণ, গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা তো তোমোইর নিন্দা করতে ছাড়তেন না। এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ছেলেমেয়েদের এই গান হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে একটা শ্রেষ্ঠ উপহার হয়ে উঠেছিলো।

তোমোই স্কুল, চমৎকার স্কুল;
ভিতরে আর বাইরে খুবই চমৎকার স্কুল!

সেদিন শেষের ঘণ্টাটা একটু দেরি করেই পড়েছিলো।

চুলের ফিতে

একদিন, দুপুরের খাওয়া তখন সবে শেষ হয়েছে, তোত্তো-চান হলঘরের মধ্যিখান দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিলো। এমন সময় ওর হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। 'দেখা হয়ে গেলো' বলাতে হয়তো একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে, কারণ হেডমাস্টারমশাই তো খাবার পুরো সময়টা ওদের সঙ্গেই ছিলেন। তবু, 'দেখা হয়ে গেলো' বলছি, কারণ হেডমাস্টারমশাই ওর ঠিক উল্টো দিক থেকে আসছিলেন।

'ও তুমি!' হেডমাস্টারমশাই বললেন। 'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম।'

'কী কথা?' ওর কাছেও হেডমাস্টারমশাইকে দেবার মতন কোনো খবর থাকতে পারে এ কথা ভেবে তোত্তো-চানের ভারি আনন্দ হলো।

'এই চুলের ফিতেটা তুমি কোথায় পেলে?' ওর চুলের ফুলটার দিকে তাকিয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন।

তোত্তো-চানের মুখের ভাবটা এর চেয়ে বুঝি খুশি খুশি হতে পারতো না। এই দুদিন হলো ও ওই ফিতেটো বেঁধে স্কুলে আসছিলো। ওটা ও নিজেই জোগাড় করেছিলো। ও আর একটু এগিয়ে দাঁড়ালো যাতে হেডমাস্টারমশাই ওর ফিতেটা আর একটু ভালো করে দেখতে পান।

'এটা আমার মাসির পুরনো স্কুলের জামায় লাগানো ছিলো,' ও বেশ গর্বের সঙ্গে বললো। 'মাসি জামাটা একটা বাক্সে তুলে রাখছিলেন, তখন আমি এই ফিতেটা দেখতে পেলাম। মাসি আমাকে বললেন যে আমার চোখটা নাকি খুব ভালো। আমাকে তখন ফিতেটা দিয়ে দিলেন।'

'ও আচ্ছা,' বলে হেডমাস্টারমশাই যেন চিন্তায় ডুবে গেলেন।

ফিতেটা নিয়ে তোত্তো-চানের খুব গর্ব ছিলো। কেমন করে এটা পেলো, সেই গল্প হেডমাস্টারমশাইকে শোনাতে শুরু করলো। হলো কী, সেদিন তো ওরা মাসির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো। গিয়ে দেখে মাসি অনেক পুরনো কাপড় জামা রোদে মেলে দিয়েছেন। তার মধ্যে বেগুনি রং-এর লম্বা, প্লিট দেয়া পুরনো আমলের একটা স্কার্টও ছিলো। ওটা পরে নাকি মাসি স্কুলে যেতেন। ওটা যখন তুলে রাখা হচ্ছিলো তখন তোত্তো-চানের চোখে পড়লো কী যেন একটা খুব সুন্দর জিনিস স্কার্টটার গায়ে লাগানো রয়েছে।

'ওটা কী?'

তোত্তো-চানের প্রশ্ন শুনে মাসি কাজ থামিয়ে তাকালেন। স্কার্টের কোমরের পট্টির পেছন দিকটাতে একটা ফিতে লাগানো ছিলো।

'এ দিয়ে ফুল বাঁধলে আমাদের পেছন থেকেও সুন্দর দেখাতো,' মাসি বুঝিয়ে বললেন। 'তখনকার দিনে আমরা স্কার্টের পেছনে হয় হাতে বোনা লেস নয়তো ফিতেয় বাঁধা ফুল, কিছু একটা লাগাতাম।'

ফিতেটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কথা বলছিলেন মাসি। আর, কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করছিলেন তোত্তো-চান কেমন জুলজুল করে চেয়ে আছে। 'নে, এটা তোকে দিয়ে দিলাম! আমি তো আর কোনোদিন এই স্কার্টটা পরবো না!' বলে, কোমরের পট্টি থেকে ফিতেটা আলগা করে খুলে, তোত্তো-চানকে দিয়ে দিলেন। এভাবেই ও ফিতেটা পেয়েছে।

খুবই সুন্দর একটা ফিতে—খুব চওড়া আর খুব দামী সিল্কের তৈরি, গায়ে গোলাপ আর অন্য অনেক নক্সা আঁকা। এত চওড়া যে তোত্তো-চানের মাথার চেয়েও বড় একটা ফুল বাঁধা গিয়েছিলো তা দিয়ে। মাসি বলেছেন, কাপড়টা নাকি বিদেশী।

কথা বলতে বলতে তোত্তো-চান ক্রমাগত ওর মাথাটা দোলাচ্ছিলো, যাতে হেডমাস্টারমশাই ফিতের মশমশ শব্দটা শুনতে পান। গল্পটা শোনার পরে মনে হলো হেডমাস্টারমশাই যেন কেমন বিচলিত হয়ে গেলেন।

'আচ্ছা' উনি বললেন। 'তাহলে, এই হলো গপ্পো? গতকাল মিয়ো-চান বায়না ধরেছিলো তোমার মতন একটা ফিতে চাই বলে। আমি তো জিয়ুগায়োকার সব ফিতের দোকান খুঁজে দেখলাম, কিন্তু এরকম কিছু তো ওদের কাছে ছিলো না। তো, কাপড়টা বিদেশী, তাই তো?'

ওঁর মুখটা তখন আর হেডমাস্টারমশাইয়ের মতন দেখাচ্ছিলো না; দেখাচ্ছিলো, বায়না করা মেয়ের দিশেহারা বাবার মতন।

'তোত্তো-চান, তুমি যদি এই ফিতেটা স্কুলে আর না বেঁধে আসো, তাহলে আমি তোমার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ থাকবো। আসলে কী জানো, মিয়ো-চান এত চাইছে এই রকম একটা ফিতে! এটা না পরলে তোমার কি খুব কষ্ট হবে?'

তোত্তো-চান হাত জড়ো করে একটু ভাবলো কথাটা। তারপর তাড়াতাড়ি বললো, 'না, ঠিক আছে। আমি আর এটা বেঁধে আসবো না।'

'ধন্যবাদ তোত্তো-চান,' হেডমাস্টারমশাই বললেন।

ফিতের ব্যাপারটাতে তোত্তো-চানের একটু মন খারাপ হচ্ছিলো, কিন্তু হেডমাস্টারমশাইয়ের অসুবিধের কথা ভেবে ও অনুরোধটা মেনে নিয়েছিলো। মেনে নেবার আরো একটা কারণ ছিলো, একজন বয়স্ক মানুষ, ওর প্রিয় হেডমাস্টারমশাই, তিনি দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটা ফিতের জন্য, এটা ভাবতে ওর খুব খারাপ লাগছিলো। তোমোইতে এরকমই হতো—নিজের অজান্তেই কখন যেন সবাই সবার সুবিধে অসুবিধে বুঝতে শিখে যেতো। বয়সে বড়, ছোট, সবাই। সবাই সবার পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করতো—সেটাই ছিলো তোমোইর স্বাভাবিক নিয়ম।

পরদিন, তোত্তো-চান স্কুলে চলে যাবার পর মা ওর ঘরটা গোছাতে গিয়ে দেখলেন যে তোত্তো-চান ওর ফিতেটা একটা খেলনা ভালুকের গলায় বেঁধে রেখে গেছে। হঠাৎ অত প্রিয় ফিতেটা চুলে বাঁধা বন্ধ করে দিলো কেন তোত্তো-চান? মা একটু অবাক হয়ে ভাবলেন। বেচারা ছাই রং-এর ভালুকটাকে দেখে মনে হচ্ছিলো। এতো সাজের চোটে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছে।

আহত সৈনিকদের জন্য

জীবনে প্রথম বার তোত্তো-চান হাসপাতালে আহত সৈনিকদের দেখতে গেলো। বিভিন্ন

প্রাথমিক স্কুল থেকে আসা জনা-তিরিশেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে গিয়েছিলো তোত্তো-চান, তাদের কাউকেই ও চিনতো না। সারা দেশের সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের জন্য সরকারের তরফ থেকে এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিলো। প্রত্যেক স্কুল থেকে দুই বা তিনজন ছাত্রছাত্রী পাঠানোর কথা ছিলো, তবে তোমোইর মতন ছোট স্কুল থেকে কেবল একজনই এসেছিলো, আর গোটা দলটার সঙ্গে অন্য একটি স্কুলের এক দিদিমণি ছিলেন। তোমোইর হয়ে তোত্তো-চান যাচ্ছিলো হাসপাতালে।

রোগা মতন এক দিদিমণি, চোখে চশমা, তার সঙ্গে ওরা হাসপাতালের ওয়ার্ডে গিয়ে ঢুকলো। জনা পনেরো আহত সৈনিকের ওয়ার্ড, কেউ শুয়ে, কেউ বসে, কেউ কেউ আবার হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিলেন। তোত্তো-চান একটু ভয় পেয়েছিলো, ও ভেবেছিলো, আহত সৈনিকদের না জানি কেমন হয় দেখতে? কিন্তু, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে সৈনিকরা সবাই এমন সুন্দর করে হাসলেন আর হাত নাড়তে লাগলেন যে, ব্যাণ্ডেজ থাকা সত্ত্বেও ওঁদের বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিলো। তোত্তো-চানের অস্বস্তি কেটে গেলো।

দিদিমণি ওদের ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে সৈনিকদের উদ্দেশে বললেন : 'আমরা আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' অমনি ছেলেমেয়েরা সবাই নিচু হয়ে ওঁদের অভিবাদন জানালো। দিদিমণি বলে চললেন, 'কাল যেহেতু মে মাসের পাঁচ তারিখ, বয়েজ ডে উদ্‌যাপনের দিন, তাই আমরা আপনাদের 'কার্প পতাকা' গানটা শোনাবো।'

দু হাত তুলে, অর্কেস্ট্রার কণ্ডাকটারের মতন ভঙ্গী করে, দিদিমণি বললেন : 'বাচ্চারা, শুরু করো। এক দুই তিন চার—' বলে তাল দিতে লাগলেন। অমনি ছেলেমেয়েরা যারা একে অন্যকে চিনতোই না, তারা সবাই এক সুরে, গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করলো :

মহাসমুদ্র মহানগর
মহাসমুদ্র মেঘ-সাগর...

এই গানটা তোত্তো-চানের জানা ছিলো না। ওই ধরনের গান তো তোমোইতে শেখানো হতো না। ও একজন ভালোমানুষ দেখতে সৈনিকের বিছানার কোণায় বসে ওদের গান শুনতে লাগলো—ভেতরে ভেতরে ওর তখন বেশ অস্বস্তি হচ্ছিলো। গানটা শেষ হবার পর পরিষ্কার গলায় দিদিমণি বললেন, 'এবার আমরা 'পুতুলের উৎসব' গানটা গাইবো।' তোত্তো-চান ছাড়া সবাই গানটা গাইতে শুরু করলো। ওরা সুন্দর করে গাইছিলো :

এসো প্রদীপগুলো জ্বালাই
এক এক করে...

চুপ করে থাকা ছাড়া তোত্তো-চানের কোনো উপায় ছিলো না। এই গানটা শেষ

হলে পরে সৈনিকরা সবাই হাততালি দিলেন। দিদিমণি মিষ্টি করে হেসে বললেন, "ছানা ঘোড়া, বাবা ঘোড়া" গানটা গাইলে কেমন হয়? চলো, সবাই মিলে—দুই, তিন, চার, আবার উনি তাল দিতে শুরু করলেন।

এটাও তোত্তো-চানের অজানা। গান শেষ হবার পর ওর খাটের অসুস্থ সৈনিক ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তুমি তো গাইলে না!'

তোত্তো-চানের খুব লজ্জা করতে লাগলো। সৈনিকদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। অথচ ওঁদের একটাও গান শোনাতে পারলো না। ও উঠে দাঁড়িয়ে, খাটের পাশ থেকে একটু সরে এসে বেশ সাহস সঞ্চয় করে বললো, 'এবার আমি আমার জানা একটা গান গাইবো!'

পূর্ব-পরিকল্পিত ছকের বাইরে কিছু একটা ঘটতে চলেছিলো, দিদিমণি তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী গাইবে?' ততক্ষণে অবশ্য তোত্তো-চান একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে গান শুরু করতে যাচ্ছিলো, তাই দিদিমণি তখনকার মতন আর কিছু বললেন না।

তোত্তো-চান যেহেতু তোমোই থেকে এসেছিলো তাই ও ভাবলো যে তোমোইর সবচেয়ে পরিচিত গানটাই গাওয়া ঠিক হবে। তাই, বড় করে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ও গাইতে শুরু করলো!

ভালো করে চিবোও তুমি
চিবিয়ে চিবিয়ে খাও...

কয়েকজন ছেলেমেয়ে হাসতে শুরু করলো। বাকিরা এ ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'গানটা কী রে?' দিদিমণি তাল দিতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে উনি থেমে যেতে বাধ্য হলেন। তোত্তো-চানের বেশ লজ্জা লাগছিলো, তবু ও প্রাণপন গাইতে থাকলো :

ভাত, মাছ, মাংস, ডিম
সবটা চিবিয়ে নাও!

গান শেষ হলে পরে ও মাথা নিচু করে সকলকে সম্মান জানালো। মুখ তুলতেই ও দ্যাখে কী, সেই সৈনিকের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ও খুব অবাক হয়ে গেলো। নিশ্চয় ও কোনো খারাপ কাজ করে ফেলেছে, ও ভাবলো। তারপর সেই সৈনিক—বাবার থেকে হয়তো সামান্য বয়সে বড়ই হবেন—তিনি আবার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন 'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!' উনি ওর মাথায় হাত বুলিয়েই চললেন আর ওঁর চোখ থেকে কেবলই জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সেই দিদিমণি তখন পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য হাসিখুশিভাবে বলে উঠলেন, 'এবার তাহলে আমরা আপনাদের জন্য যে রচনাগুলো নিয়ে এসেছি, সেগুলো পড়ে শোনাই।' বাচ্চারা সব একে একে, জোরে জোরে ওদের রচনাগুলো পড়ে শোনাতে লাগলো।

তোত্তো-চান ওর সৈনিকের দিকে তাকালো; কেঁদে কেঁদে ওঁর চোখ দুটো লাল

হয়ে গিয়েছিলো, তবু তারই মধ্যে উনি একটু হাসলেন। তোত্তো-চানও একটু হাসলো। আর মনে মনে ভাবলো, 'যাক, তাও তো উনি একটু হাসলেন!'

কেন যে সেই সৈনিক সেদিন কেঁদে ফেলেছিলেন, তা তিনিই কেবল জানতেন। হয়তো ওঁর বাড়িতে তোত্তো-চানের মতো একটা মেয়ে ছিলো। কিংবা হয়তো স্রেফ তোত্তো-চানের আন্তরিক গান গাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিংবা হয়তো আসন্ন যুদ্ধের কথা ভাবতে গিয়ে ওঁর চোখে জল এসে গিয়েছিলো। উনি হয়তো ভাবছিলেন যে, 'হায় রে! এই ছোট্ট মেয়েটা তো চিবিয়ে খাবার কথা বলছে, অথচ কদিন বাদে তো বোধহয় খাবার মতন কিছু থাকবেই না আর।' হয়তো উনি যুদ্ধের যে বিভৎসতা এই শিশুদের আক্রান্ত করতে চলেছিলো, সেই কথা ভাবছিলেন।

ছেলেমেয়েরা ওদের রচনা পড়ে শোনাতে ব্যস্ত ছিলো, ওরা হয়তো জানতোই না যে ততদিনে বিশ্বযুদ্ধ অনেকক্ষণ ছড়িয়ে পড়েছিলো।

সুস্বাস্থ্য আর গাছের বাকলের গল্প

গলা থেকে ঝোলানো ট্রেনের টিকিটটা গেটে দেখিয়ে তোত্তো-চান জিয়ুগায়োকা স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো। গেটের চেকার ভদ্রলোকের সঙ্গে এখন ওর খুবই ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বাইরে একটা ব্যাপার চলছিলো। একটি লোক রাস্তায় মাদুর পেতে, সামনে এক পাহাড় গাছের বাকলের মতন কী যেন নিয়ে বসেছিলো আর বলছিলো : 'দেখুন, এদিকে দেখুন!' চার পাঁচজন দর্শক লোকটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। তোত্তো-চান তাদের সঙ্গে যোগ দিলো। তোত্তো-চানকে দেখে সে বলতে শুরু করলো, 'স্বাস্থ্যই জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সকালে উঠে যদি জানতে চান যে আপনি ভালো আছেন কী না, তাহলে এই গাছের বাকলের সাহায্য নিন। একটুখানি বাকল চিবোলে যদি মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি সুস্থ নেই। যদি তেতো না লাগে, তার মানে আপনার শরীর ভালো আছে। তা, ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন, দাদা, হ্যাঁ আপনি একটু চিবিয়ে দেখবেন নাকি? একটুকরো বাকলের দাম মাত্র কুড়ি সেন।'

একজন বেশ রোগা মানুষের হাতে লোকটা একটুকরো বাকল তুলে দিলো। তিনি একটু দ্বিধা করে বাকলটায় দাঁত ঠেকালেন। তারপর মাথাটা হেলিয়ে উনি ভাবতে লাগলেন, 'তা...একটু তেতো বৈকি...।'

মাদুরে বসা লোকটি লাফিয়ে উঠে বললো, 'দাদা, আপনার নিশ্চয় কিছু একটা অসুখ করেছে। আপনাকে সাবধান হতেই হবে। কিন্তু চিন্তার কিছু নেই; সামান্য তেতো বললেন, তাই না?' আর দিদিমণি, আপনি? এই টুকরোটা কি অনুগ্রহ করে একটু চিবিয়ে দেখবেন?' বাজারের থলে হাতে ধরা মহিলা বেশ একটা বড়সড় টুকরো ধরে বড় একটা কামড় দিয়ে বললেন, 'কই, তেতো নয় তো?'

'দারুণ, দিদিমণি, দারুণ! আপনার তো দেখছি খুব ভালো স্বাস্থ্য!' লোকটি বললো। তারপর একটু গলা তুলে দর হাঁকতে লাগলো : 'মাত্র কুড়ি সেন, মাত্র কুড়ি সেন! কুড়ি সেনের বিনিময়ে আপনি সকালবেলায় জেনে যাচ্ছেন আপনার শরীর ভালো আছে, কি নেই। মাত্র কুড়ি সেন!'

তোত্তো-চানের খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো ওই ছাই রং-এর বাকল একটু চিবিয়ে দ্যাখে, কিন্তু লজ্জার চোটে চাইতে পারছিলো না। ও বরং বললো, 'আমার স্কুল যখন শেষ হবে, তখন তুমি থাকবে কি?' 'নিশ্চয়,' বলে লোকটা ছোট মেয়েটাকে একটু দেখে নিলো।

তোত্তো-চান এক ছুটে স্কুলে গিয়ে পৌঁছুলো। আজ দেরি করলে চলবে না। ঘণ্টা পড়ার আগেই ওকে পৌঁছে একটা কথা জানতে হবে। 'কেউ আমাকে কুড়ি সেন ধার দিতে পারিস?' কারো কাছেই অবশ্য কুড়ি সেন ছিলো না। তখনকার দিনে এক বাক্স ক্যারামেল লজেন্সের দাম ছিলো দশ সেন, অতএব কুড়ি সেন-এর তেমন কোনো মূল্য ছিলো না, তবু সেটাও ছিলো না কারো কাছে।

'আমি কি বাবা মা-কে বলবো?' মিয়ো-চান জিজ্ঞেস করলো। হেডমাস্টারমশাই স্বয়ং যে মিয়ো-চানের বাবা ছিলেন, এটা তোত্তো-চানদের জন্য খুব একটা সুবিধের ব্যাপার ছিলো। অন্তত, এরকম পরিস্থিতে তা-ই মনে হতো। মিয়ো-চানদের বাড়িটা ছিলো স্কুলের হলঘরের লাগোয়া, তাই মনে হতো যেন ওর মাও স্কুলেই থাকতেন।

'বাবা বলেছেন তোকে পয়সাটা দেবেন,' দুপুরের খাওয়ার সময় মিয়ো-চান তোত্তো-চানকে বললো। 'কিন্তু পয়সাটা তোর কী জন্যে দরকার, বাবা জানতে চেয়েছেন।'

তোত্তো-চান হেডমাস্টারমশাইয়ের অফিসে চলে গেলো।

'তোমার কুড়ি সেন-এর দরকার? কেন বলো তো?' চশমাটা খুলতে খুলতে জানতে চাইলেন হেডমাস্টারমশাই।

'আমি এক টুকরো গাছের বাকল কিনতে চাই। সেটা চিবোলে জানা যায় আমাদের শরীর ভালো আছে কি নেই,' তোত্তো-চান তাড়াতাড়ি করে উত্তর দিলো। হেডমাস্টারমশাইয়ের কৌতূহল যেন বেড়ে গেলো।

'কোথায় বিক্রি হচ্ছে?'

'স্টেশনের সামনে' তোত্তো-চান খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো।

'বেশ, তোমার ইচ্ছে হলে এক টুকরো কিনো, কিন্তু আমায় একটু চিবিয়ে দেখতে দেবে তো, তাই না?' উনি পকেট থেকে পয়সার থলেটা বার করে তোত্তো-চানকে কুড়ি সেন দিলেন।

'ওহ্! অনেক অনেক ধন্যবাদ! আমি মায়ের থেকে পয়সাটা এনে ফেরত দিয়ে দেবো। মা আমায় বইয়ের জন্য অনেক সময় পয়সা দেন। অন্য কিছু কিনতে চাইলে আমাকে বলতে হয় কেন। কিন্তু শরীর ভালোর জন্য গাছের বাকল তো সবার দরকার! আমার মনে হয় না যে মা কিছু মনে করবেন।'

স্কুল ছুটির পর তোত্তো-চান হাতের মুঠোয় পয়সাটা ধরে সোজা চললো স্টেশনের দিকে। সেই লোকটি তখনো ছিলো, আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওর বাকল ফিরি করছিলো। তোত্তো-চানের হাতে কুড়ি সেন দেখে সে দাঁত বার করে হাসলো।

'লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার মা বাবা নিশ্চয় খুব খুশি হবেন।'

'হ্যাঁ। আর রকিও!'

'রকি কে?' তোত্তো-চানের জন্য এক টুকরো বাকল বেছে তুলতে তুলতে লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

'রকি আমাদের জার্মান শেপার্ড কুকুর।'

'কুকুর?' এ মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সে বললো, 'হ্যাঁ, কুকুরের জন্যেও এই বাকলটা কাজে লাগবে বলে মনে হয়। ওর যদি বাকলটা তেতো লাগে আর বাকলটা খেতে না চায়, তার মানে ওর শরীরটা ভালো নেই।'

লোকটি এক ইঞ্চি চওড়া আর ছয় ইঞ্চি লম্বা মতন একটা বাকল তুলে তোত্তো-চানকে দিলো। 'নাও। রোজ সকালে একটু করে এটা কামড়ে নিও। তেতো



লাগলে বুঝো যে তোমার শরীরটা ভালো নেই। তেতো না লাগার মানে হলো তোমার শরীর খুব ভালো আছে!'

কাগজে মোড়ানো মূল্যবান বাকলটা সাবধানে ধরে তোত্তো-চান বাড়ি ফিরে চললো। বাড়ি পৌঁছেই ও বাকলটা থেকে একটা টুকরো কামড়ে চেখে দেখলো। না, ঠিক তেতো লাগলো না, কেবল একটু খড়খড়ে মতন। ও আসলে কোনো স্বাদই পাচ্ছিলো না।

'হুর্‌রে! আমার শরীর তাহলে খুব ভালো আছে!'

'তা তো বটেই!' মা মৃদু হেসে বললেন। 'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

তোত্তো-চান ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো। মাও এক কামড় খেয়ে দেখলেন। 'না তেতো নয়,' মা বললেন।

'তার মানে, মা, তোমার স্বাস্থ্যও খুব ভালো!'

এরপর তোত্তো-চান রকির কাছে গিয়ে বাকলটা ওর মুখের সামনে ধরলো। রকি প্রথমটায় বাকলটার গন্ধ নিলো, তারপরে সেটা একটু চেটেও দেখলো। 'তোকে এটা কামড়াতেই হবে, তাহলেই বোঝা যাবে তুই ঠিক আছিস কি না,' তোত্তো-চান বললো।

কিন্তু রকি ওই বাকলটা কামড়ানোর কোনো চেষ্টাই করলো না। ও কেবল পা দিয়ে কানের পেছনটা চুলকোতে লাগলো। তোত্তো-চান বাকলটা ওর মুখের আরো কাছে নিয়ে গেলো। 'আরে বাবা, কামড়া না! যদি তোর শরীর খারাপ থাকে, তাহলে তো বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে!'

রকি খুবই আপত্তির সঙ্গে একটা ছোট্ট কামড় দিলো ওই বাকলটাতে। তারপর ও আবার একটু গন্ধ শুঁকলো—বাকলটা যে ওর বিশেষ অপছন্দ হয়েছে, তা কিন্তু মনে হলো না। ও কেবল মস্ত একটা হাই তুললো। 'হুর্‌রে, হুর্‌রে, রকির স্বাস্থ্য খুব ভালো!'

পরদিন সকালে মা তোত্তো-চানের হাতে কুড়ি সেন দিয়ে দিলেন। ও সোজা হেডমাস্টারমশাইয়ের অফিসে গিয়ে বাকলটা বার করে সামনে রাখলো। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো হেডমাস্টারমশাই যেন বলতে চাইছেন যে, 'এটা কী?' তারপর ওর হাতে কুড়ি সেন দেখে ওঁর ঘটনাটা মনে পড়ে গেলো।

'কামড়ে দ্যাখো। যদি তেতো লাগে, তার মানে তোমার শরীর ভালো নেই।'

হেডমাস্টারমশাই একটা ছোট্ট কামড় দিলেন। তারপর বাকলটা উল্টে পাল্টে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

'তেতো লাগছে কি?' তোত্তো-চান চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করলো।

'এর তো কোনো স্বাদই নেই।'

তারপর বাকলটা তোত্তো-চানকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি ঠিকই আছি। চিন্তা নেই।'

সেদিন তোত্তো-চান স্কুলের সকলকে একটু করে বাকল খাওয়ালো। কারোই

তেতো লাগলো না, মানে সবার স্বাস্থ্যই খুব ভালো ছিলো। তোত্তো-চানের খুব আনন্দ হলো। ছেলেমেয়েরা সবাই হেডমাস্টারমশাইকে গিয়ে খবরটা জানালো। প্রত্যেককে উনি বললেন, 'ভালো!'

ব্যাপারটা নিশ্চয় ওঁর প্রথম থেকেই জানা ছিলো। উনি জন্মেছিলেন গুম্পা এলাকায়, আর সেখানেই বড় হয়েছিলেন। সেখানে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালে হারুনা পাহাড়ের চূড়ো দেখতে পাওয়া যেতো। তাই গাছপালার খবর উনি ভালো করেই জানতেন—ওই গাছের বাকলটা যে তেতো লাগতে পারে না, সে তো জানা কথা। তবু, যে ব্যাপারটা হেডমাস্টারমশাইয়ের খুব ভালো লেগেছিলো তা হলো, তোত্তো-চানের এই উৎসাহ। স্বাচ্ছন্দ্য শরীর ভালো আছে, এ কথা জেনে ওর যে আনন্দ হয়েছিলো, তা দেখতে হেডমাস্টারমশাইয়েরও ভালো লাগছিলো। তোত্তো-চান এমনভাবে বড় হয়েছিলো যে, কারো যদি ওই বাকলটা খেয়ে তেতো লাগতো, তাহলে কিন্তু ও চিন্তিত হয়ে পড়তো।

রাস্তার একটা নেড়ি কুকুরের মুখেও ওই বাকলটা একবার ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলো তোত্তো-চান। সে তো আর একটু হলে ওকে কামড়েই দিতো, তবু তোত্তো-চান তো ভয় পাবার মেয়ে নয়! 'তোমার শরীরটা ঠিকঠাক আছে কিনা, জানতে হবে তো?' ও কুকুরটাকে বলতে লাগলো। 'এসো এসো। আয় আয় আয়!' শেষ পর্যন্ত অচেনা কুকুরটাকেও একটু বাকল খাইয়ে ছাড়লো তোত্তো-চান 'হুর্‌রে, তোমার শরীরও ঠিক আছে!' বলে ও চিৎকার করে উঠলো।

কুকুরটা মাথা নিচু করলো এমনভাবে, দেখে মনে হলো যেন ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

তবে, হেডমাস্টারমশাই যেমনটা ভেবেছিলেন, তেমনই হলো। সেই বাকলওয়ালা আর কোনোদিন জিয়ুগায়োকা স্টেশনের কাছে এলো না।

প্রতিদিন সকালে তোত্তো-চান বাকলটা বার করে একটু করে কামড়ে দেখে নিতো। বাকলটা দেখে মনে হতো যেন একটা ইঁদুর ওতে দাঁত বসিয়েছে। 'আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো!' রোজ এই বলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো। আর, সত্যিই ওর স্বাস্থ্য বেশ ভালোই ছিলো!

ইংরেজি বলা ছাত্র

স্কুলে একটা নতুন ছেলে এসেছিলো—প্রাথমিক স্কুলের তুলনায় বেশ লম্বা চওড়া ছেলেটি। দেখে মনে হচ্ছিলো হয়তো ক্লাস সেভেন-টেভেনে পড়ে। ওর পোশাকটাও ছিলো বেশ অন্যরকম, বেশ বড়দের মতন।

সেদিন স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে হেডমাস্টারমশাই ওর সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিলেন : 'এ হলো মিয়াজাকি। ওর জন্ম আমেরিকাতে, সেখানেই এতোদিন থেকেছে। ও খুব একটা ভালো জাপানী বলতে পারে না। সে জনাই ও তোমোইতে এসেছে,

যাতে সহজে বন্ধু পেতে পারে আর ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে, পড়াশুনো করতে পারে। এখন ও তোমাদেরই একজন। ওকে কোন ক্লাসে দিই বলো তো? ফাইভে, তা-চানদের ক্লাসে, কী বলো?'

'তাহলে তো বেশ হয়,' বিজ্ঞ বিজ্ঞ একটা হাসি হেসে তা-চান বললো। তা-চান খুব ভালো ছবি আঁকতো।

একটু হেসে হেডমাস্টারমশাই আবার বললেন, 'ও জাপানী ভালো জানে না বলেছি, তবে ইংরেজিটা কিন্তু খুব ভালো পারে। দেখো, ওর থেকে একটু ইংরেজি শিখে নিও তোমরা। ও তো কখনো ঠিক জাপানে থাকেনি, এখানকার হালচাল ও ভালো করে জানে না। ওকে তোমরা একটু সাহায্য করবে তো, তাই না? ওকে আমেরিকার কথা জিজ্ঞেস কোরো—অনেক মজার মজার কথা বলতে পারবে ও তোমাদের। ঠিক আছে? এবার তাহলে ও রইলো তোমাদের কাছে।'

মিয়াজাকি মাথা নিচু করে সকলকে ওর অভিবাদন জানালো, তা-চানের ক্লাসের বন্ধুরাও ওকে অভিবাদন জানালো। চেহারায় সবাই ওর চেয়ে ছোট ছিলো।

দুপুরের খাওয়ার সময় মিয়াজাকি হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে চলে গেলো, বাকিরাও ওর পেছন পেছন গেলো। কিন্তু ও করলো কী, জুতো সমেত ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো! সবাই তো হাঁই হাঁই করে উঠলো : 'জুতো খুলে! জুতো খুলে!' মিয়াজাকি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললো, 'ওহ্, ভুল হয়ে গেছে।' বলে জুতোটা খুলে ফেললো। সবাই ওকে এবার একসঙ্গে অনেক কিছু শেখাতে শুরু করলো। "তাতামি" মাদুর পাতা ঘরগুলোতে আর আমাদের হলঘরে কখনো জুতো পরে ঢুকো না। ক্লাসে আর লাইব্রেরিতে অবশ্য জুতো পরেই ঢোকা যায়।'

'কুহনবুৎসু মন্দিরে যখন যাবে তখন চাতাল পর্যন্ত জুতো পায়ে যেতে পারো। কিন্তু মন্দিরের ভেতরে সব সময় খালি পায়ে ঢুকতে হয়।'

দেশে থাকা আর বিদেশে থাকার মধ্যে যে কত পার্থক্য, তা জানতে আর জানাতে ওদের খুব মজা লাগছিলো।

পরদিন মিয়াজাকি একটা বড় ছবির বই নিয়ে এলো স্কুলে। দুপুর বেলায় সবাই ঘিরে ধরলো ওকে। এত সুন্দর বই! ওরকম বই ওরা কখনো দ্যাখেনি। ওদের ছবির বইগুলোতে কেবল তিনটে রং হয়—লাল, সবুজ, হলুদ। এটাতে এমন কি চামড়ার রং পর্যন্ত ছিলো, আর কত রকমের নীল! সাদা, ছাই, নানা রং-এর সঙ্গে মেশানো। এমন রং যা মোম রং-এর বাক্সেও পাওয়া যায় না। সাধারণ চব্বিশটি রং-এর বাক্সে যা থাকে তার বাইরে তো বটেই, তাই-চানের আটচল্লিশটি রং-এর বাক্সেও এই বই-এর কিছু রং পাওয়া যাবে না। সবাই খুব মুগ্ধ হলো। আর ছবিগুলো ছিলো এরকম—প্রথমটাতে একটা কুকুর একটা ছোট্ট বাচ্চার ছোট প্যাণ্টটা ধরে টানছিলো। বাচ্চাটার ফর্সা গায়ের রং এমনভাবে ফুটে উঠেছিলো যে দেখে আঁকা ছবি বলে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না। এত

সুন্দর, চকচকে কাগজের ছবির বই ওরা আগে কখনো দ্যাখেনি। মিশুকে তোত্তো-চান মিয়াজাকি এবং ওর বইয়ের খুব কাছে গিয়ে বসলো।

মিয়াজাকি ওদের ইংরেজি লেখাটা পড়ে শোনালো। ইংরেজি ভাষাটা এতো সহজ লাগছিলো ওদের কাজে যে ওরা মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলো এরপর মিয়াজাকি একটু কষ্ট করে জাপানী বলতে শুরু করলো।

"আফাচান' মানে 'বেবি' বা ছোট্ট বাচ্চা,' ও বলতে শুরু করলো।

"আফচান' হলো 'বেবি',' সবাই মিলে বললো।

"উৎসুকুউউশি' হলো 'বিউটিফুল', বা সুন্দর,' মিয়াজাকি বললো, 'কু'র ওপর বাড়তি জোর দিলো ও।

"উৎসুকুশিইই' হলো 'বিউটিফুল',' সবাই মিলে বললো।

মিয়াজাকি বুঝতে পারলো ওর জাপানী উচ্চারণটা ঠিক হচ্ছিলো না। ও আবার বলার চেষ্টা করলো, 'কথাটা উৎসুকুশিইই', তাই না?'

কদিনের মধ্যেই মিয়াজাকি সবার বন্ধু হয়ে গেলো। রোজ ও স্কুলে নতুন নতুন বই নিয়ে আসতো আর দুপুরবেলায় বন্ধুদের পড়ে শোনাতো। মনে হতো যেন মিয়াজাকি ওদের ইংরেজির মাস্টারমশাই। মিয়াজাকিও একটু একটু করে ভালো জাপানী শিখে যাচ্ছিলো। আর, ওর ভুলভাল কাজ করে ফেলাটাও কমে গেলো; যেমন, 'তোকোনামা' ছবির পট আর গয়না রাখার বিশেষ জায়গাতে যে, কখনো বসে পড়তে নেই, এই ধরনের রীতি ও রপ্ত করে ফেললো।

তোত্তো-চান আর ওর বন্ধুরা আমেরিকা সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেলো। তোমাইর ভিতরে জাপান আর আমেরিকা বন্ধু হয়ে উঠছিলো। অথচ বাইরে তখন আমেরিকা জাপানের চরম শত্রু, তাই ইংরেজিও হয়ে গেছে শত্রুর ভাষা। সমস্ত স্কুলে তখন ইংরেজি পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে। সরকার ঘোষণা করেছে, 'আমেরিকানরা শয়তানের জাত', অথচ তোমোইতে ছেলেমেয়েরা সুরে সুরে গেয়ে চলেছে, 'উৎসকুশিইই' হলো 'বিউটিফুল'!

মৃদু মন্দ হাওয়া বয়ে যাচ্ছিলো তোমোই গাকুয়েনের বুকের উপর দিয়ে। তোমোই-এর শিশুরাও সবাই বড় সুন্দর, সবাই 'বিউটিফুল'!

ছোটদের নাটক

'আমরা একটা নাটক করবো!'

তোমোই-র ইতিহাসে সে-ই প্রথম। দুপুরে খাবার সময় কারো না কারো বক্তৃতা দেবার ব্যাপারটা তো চলছিলোই, তার উপর আবার নাটক! কী দারুণ ব্যাপার! যে হলঘরে পিয়ানোটা থাকে আর যেখানে ইউরিদমিক্সের ক্লাস হয়, সেখানেই স্টেজের ওপর নাটক হবে, নিমন্ত্রিত দর্শকের সামনে। ছেলেমেয়েরা তো কেউই কোনোদিন

কোনো নাটক দেখেনি, এমন-কি তোত্তো-চানও না। ও কেবল সেই একবার 'সোয়ান লেক' ব্যালে দেখতে গিয়েছিলো বড় একটা থিয়েটার হলে। তবু, অভিজ্ঞতা ছাড়াই ওরা ওদের বছর-শেষের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে লাগলো।

ঠিক হলো তোত্তো-চানের ক্লাস 'কানজিচো' নামে বিখ্যাত একটা 'কাবুকি' নাটক করবে। 'কানজিচো' অর্থাৎ 'তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহ'। তোমোইতে এই ধরনের একটা নাটক করা হবে, এটা সত্যিই কেউ ঠিক ভাবেনি, তবু নাটকটা যেহেতু তোত্তো-চানদের পড়ানো হচ্ছিলো, তাই ওটাই অভিনয় হবে বলে ঠিক হলো। দায়িত্বে থাকবেন মিস্টার মারুইয়ামা। আইকো সাইশো বেশ বড়সড় চেহারার মেয়ে, তাই ওকে পালোয়ান বেঙ্কেইয়ের রোলটা দেওয়া হলো। আমাদেরা হবে সেনাপতি তোগাশি, কারণ ওর গলাটা বেশ চড়া আর চেহারায় বেশ একটা রাগ রাগ ভাব আছে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো যে তোত্তো-চান ইয়োশিৎসুনে হবে। ইয়োশিৎসুনে হলো একজন বড়লোক, যাকে কুলির ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। বাকি সকলে হবে ভ্রাম্যমান ভিক্ষু।

রিহার্সাল শুরু হবার আগে প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট মুখস্থ করার কথা। তোত্তো-চান আর ভিক্ষুদের সুবিধে ছিলো, ওদের কোনো কথা ছিলো না। ভিক্ষুরা কেবল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তোত্তো-চানকে মুখটা একটা মস্ত খড়ের টুপির আড়ালে লুকিয়ে রেখে হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে হবে। আসলে, বেঙ্কেই হলো ইয়োশিৎসুনের চাকর। কিন্তু সেই বেঙ্কেই-ই কুলির ছদ্মবেশ ধরা মনিবকে পেটানোর ছল করে কোনো রকমে ভিক্ষুদের আতাকা চেকপোস্ট পার করিয়ে দেবে—এই হলো গিয়ে গল্প। এইসবই করতে হচ্ছে তোদাজি মন্দিরের তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়োজনে। ওদিকে, আতাকা চেকপোস্টের গার্ড তোগাশি। তোগাশি আর বেঙ্কেইয়ের মধ্যে একটা মৌখিক সমঝোতা আছে, তবু একটা সময় বেঙ্কেইকে তোগাশির হুকুম মেনে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনাটা পড়ে শোনাবার ভান করতে হবে। তখন সে তার হাতে ধরা চিঠিটা খুলে—যাতে আসলে কিছুই লেখা নেই—খুব ভালো ভাষায় বানিয়ে বানিয়ে বলবে : 'প্রথমত, তোদাজি নামক মন্দির সংরক্ষণ প্রকল্পে...'। এই 'প্রথমত' ভাষণটা আইকো সাইশো প্রতিদিন মুখস্থ করতো। তোগাশিরও অনেক বড় পার্ট, বেঙ্কেইয়ের সঙ্গে তার বিস্তর তর্কবিতর্ক রয়েছে, ফলে আমাদেরাও খুব চেষ্টা করতে লাগলো ওর পার্টটা মুখস্থ করার।

অবশেষে রিহার্সাল শুরু হলো। তোগাশি আর বেঙ্কেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ভিক্ষুরা সব বেঙ্কেইয়ের পেছনে সার বেঁধে দাঁড়ানো, আর ইয়োশিৎসুনের সাজে তোত্তো-চান সামনে হাঁটু মুড়ে বসা। তোত্তো-চান কিন্তু ওর রোলটা কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না। ফলে, বেঙ্কেই যখন ইয়োশিৎসুনেকে লাঠি দিয়ে মারতে এলো, তোত্তো-চান তখন ক্ষেপে গিয়ে আইকো সাইশোকে লাথি মেরে, খিমচে একেবারে যা তা করে দিলো।

আইকো তো কাঁদতে লাগলো আর ভিক্ষুরা সবাই হাসতে শুরু করলো। অথচ, ইয়োশিৎসুনের শান্ত হয়ে, মাথা নিচু করে মার খাবার কথা ছিলো; বেঙ্কেই ওকে যতই মারুক না কেন, ওর কোনোই প্রতিবাদ করার কথা ছিলো না। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটবার কথা ছিলো : তোগাশি দেখবে যে বেঙ্কেই ইয়োশিৎসুনেকে খুব মারছে। এমনিতে তো ও বুঝেই গেছে যে ইয়োশিৎসুনে আসলে বেঙ্কেইয়ের মণিব। তাই বেঙ্কেইয়ের এই ক্ষিপ্রভাব দেখে তোগাশির ওর জন্য মায়া হবে, ও বুঝতে পারবে যে মণিবকে ওইভাবে মারতে বেঙ্কেইয়ের নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছে। তখন তোগাশি ভিক্ষুদের আতাকা চেকপোস্ট পার করিয়ে দেবে। এমন অবস্থায় হঠাৎ যদি ইয়োশিৎসুনে বাধা দিয়ে বসে তাহলে তো সব গোলমাল হয়ে যায়। মিস্টার মারুইয়ামা তোত্তো-চানকে অনেক করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু তোত্তো-চান একই জেদ ধরে বসে আছে : আইকো সাইশো যদি আমাকে মারে আমিও ওকে মারবো। কিছুতেই ওরা কোথাও পৌঁছতে পারছিলো না। যতবারই দৃশ্যটা রিহার্সাল দেয়, ততবারই মারপিট লেগে যায়।

শেষে মিস্টার মারুইয়ামা বলতে বাধ্য হলেন, 'আমার কিচ্ছু করার নেই। মনে হচ্ছে তাই-চানকেই বলতে হবে ইয়োশিৎসুনের পার্টটা করতে।'

তোত্তো-চান বেঁচে গেলো। একলা একলা মার খেতে ওর মোটেও ভালো লাগছিলো না।

'তোত্তো-চান, তুমি কি ভিক্ষু হতে চাও?' মিস্টার মারুইয়ামা জিজ্ঞেস করলেন। তোত্তো-চান বাকিদের সঙ্গে গিয়ে লাইনে দাঁড়ালো, তবে একদম পিছনের সারিতে।

সবাই ভাবলো এবার বুঝি সব ঠিক মতন চলবে। কিন্তু কোথায় কি? তোত্তো-চানের হাতে ভিক্ষুর লাঠিটা ধরিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। একটু পরেই তোত্তো-চান একঘেঁয়েমির চোটে ওর লাঠিটা দিয়ে পাশের ভিক্ষুকে খোঁচাতে শুরু করলো আর ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভিক্ষুর বগলের তলায় কাতুকুতু দিতে লাগলো। তারপর লাঠিটাকে অর্কেস্ট্রার কণ্ডাকটরের মতন করে ঘোরাতে শুরু করলো ও, যেটা শুধুমাত্র বিপদজনকই ছিলো না, বেঙ্কেই আর তোগাশির গোটা তর্কবিতর্কের দৃশ্যটাই বানচাল করে দিচ্ছিলো। অতএব তোত্তো-চান ভিক্ষুর পার্ট থেকেও বাদ পড়ে গেলো।

ইয়োশিৎসুনের ভূমিকায় তাই-চান চমৎকার ভাবে দাঁত চেপে সব অত্যাচার সহ্য করে গেলো। ওকে দেখে দর্শকদের মায়াই হচ্ছিলো। তোত্তো-চানকে বাদ দেবার পর রিহার্সাল দিব্যি নির্বিঘ্নে চলতে লাগলো।

মাঠের মধ্যে তোত্তো-চান একলা একলা ঘুরে বেড়ায়। জুতো খুলে ফেলে ওর নিজস্ব কোনো ব্যালে নাচতে থাকে। নিজের মতন করে নাচতে ওর খুব ভালো লাগে। কখনো পাখি হয়ে যায়, কখনো হাওয়া, কখনো ভয়ানক বিচ্ছিরি একটা লোক, কখনো বা একটা গাছ। ফাঁকা স্কুল চত্বরে ও একলা একলা নেচে চলে।

মাঠের ওপর, একলা একলা—তোত্তো-চানের মনের মধ্যে কোথাও একটা ইয়োশিৎসুনে হবার ইচ্ছেটা রয়ে গিয়েছিলো। তবে, ওকে যদি ইয়োশিৎসুনে করা হতো, তাহলে ও নির্ঘাত আইকো সাইশোকে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিতো। তাই তোত্তো-চান বেচারার আর তোমোইর একমাত্র নাটকে অংশ নেওয়া হলো না।

চক

তোমোইর ছেলেমেয়েরা কক্ষনো অন্য লোকের বাড়ির দেওয়ালে, বা রাস্তার ওপরে কিচ্ছু লিখতো না। কারণ, ওরা স্কুলেই এই আশটা মিটিয়ে নিতো।

গানের ক্লাসের সময় হেডমাস্টারমশাই সবার হাতে এক টুকরো করে চক দিয়ে দিতেন। ওরা চক হাতে নিয়ে মাটিতে শুয়ে, বসে, যেমন করে খুশি অপেক্ষা করতে থাকতো। তারপর হেডমাস্টারমশাই পিয়ানো বাজাতে শুরু করতেন। উনি যে সুরটা বাজাতেন, তারই ছন্দ ওরা সঙ্গীতের ভাষায় চক দিয়ে মেঝেতে লিখতে শুরু করতো—হালকা খয়েরি মেঝেতে সাদা চকের রেখা, দেখতে ভারি ভালো লাগতো। তোত্তো-চানের ক্লাসে দশজন মতন ছিলো, তাই মোটে ওই দশজন যখন মস্ত হলঘরটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে বড় বড় হরফে ছন্দের ছবি আঁকতো, তখন সবাই নিজের মতন একটু জায়গা পেয়ে যেতো কেউ কারো ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়তো না। ছন্দ লেখার জন্য স্বরলিপির মতন সমান্তরাল পাঁচটি রেখার প্রয়োজন হয় না। তোমোইতে প্রতিটি ছন্দের একটা করে নাম দেওয়া হয়েছিলো; হেডমাস্টারমশাই আর ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে এই নামগুলি ঠিক হয়েছিলো।

 ছিলো লম্ফঝম্প, কারণ ওই ছন্দে দিব্যি লাফানো যায়।

 পতাকা, পতাকার মতন দেখতে বলে

 পতাকা-পতাকা

 ডবল-পতাকা

 কালো

 সাদা

 সাদা-আর-ফুটকি

 ফুটো

এরকম মজা করতে করতেই ওরা ছন্দ লিখতে শিখে গিয়েছিলো; এই ক্লাসটা ছিলো ওদের প্রিয় ক্লাস।

মেঝেতে চক দিয়ে লেখার আইডিয়াটা ছিলো হেডমাস্টারমশাইয়ের। কাগজ হলে তো এতটা জায়গা পাওয়া যেতো না, আর স্কুলে অতগুলো ব্ল্যাকবোর্ডও ছিলো না। তাই, হলঘরের মেঝেটাকে একটা মস্ত ব্ল্যাকবোর্ড ভেবে নিয়ে ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে, আরাম করে, যত খুশি বড় ছন্দের ছবি আঁকতে পারতো। আর, সবচেয়ে বড় কথা হলো, এইভাবে ওরা গানবাজনা জিনিসটাকে ভালোবাসতে শিখে যাচ্ছিলো।

গানের ক্লাসের শেষে হাতে যদি একটু সময় থাকতো, তাহলে ওরা ইচ্ছে মতন মেঝেতে পুতুল বা প্লেনের ছবি আঁকতে পারতো। কখনো কখনো ওরা সব্বার ছবি একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে মস্ত একটা ছবি বানিয়ে ফেলতো। বাজনার ফাঁকে ফাঁকে হেডমাস্টারমশাই নেমে এসে ওদের ছবিগুলো দেখে যেতেন। 'বাঃ, বেশ হয়েছে!' অথবা, 'ওটা পতাকা-পতাকা ছিলো না তো, ওটা তো লম্ফঝম্প ছিলো!'

হেডমাস্টারমশাই একবার ওদের ছবিগুলো দেখে দিয়ে যাবার পর আবার সেই একই সুর বাজাতেন, যাতে ওরা ওদের ছন্দের ছবির সঙ্গে সুরটাকে ভালো করে মিলিয়ে নিতে পারে। যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, হেডমাস্টারমশাই কক্ষনো আর কাউকে এই ক্লাসটা নিতে দিতেন না। আর, এই ক্লাসটা যদি মিস্টার কোবায়াশি না নিয়ে আর কেউ নিতেন, তাহলে ছেলেমেয়েরাও এত আনন্দ পেতো না।

ক্লাস শেষে মেঝেটা পরিষ্কার করা ছিলো বেশ একটা ঝকমারি ব্যাপার। প্রথমে ব্ল্যাকবোর্ড মোছার ব্রাশ দিয়ে মেঝেটা মুছতে হতো, তারপর সবাই মিলে ঘর মোছার ন্যাকড়া দিয়ে মুছে মুছে মেঝেটাকে আবার চকচকে করে তুলতো। মস্ত একটা কর্মযজ্ঞ ছিলো সেটা।

এইভাবে তোমোইর ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখে গিয়েছিলো যে মেঝেতে কিছু লিখলে সেটা পরিষ্কার করা কতো কঠিন কাজ। তাছাড়া, এই ক্লাসটা সপ্তাহে দুদিন করে হতো, তাই ওরা প্রাণভরে মেঝেতে আঁকিবুকি কেটে নিতো। হলঘরের মেঝে ছাড়া আর কোথাও কখনো দাগ কাটতো না ওরা।

তোমোইর ছেলেমেয়েরা সবাই চকের ব্যাপারে বিরাট পণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলো— কোন্ চক কেমন করে ধরতে হয়, কোন্ চক অন্য চকের চাইতে বেশি ভালো, কীভাবে চক দিয়ে সবচেয়ে সুন্দর করে লেখা যায়—চক-বিশেষজ্ঞের দল সব জানতো।

ইয়াসুয়াকি-চান মারা গেছে

বসন্তের ছুটির পর সবে সেদিন স্কুল খুলেছিলো। সবাই স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে। হেডমাস্টারমশাই রোজকার মতন পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কিন্তু, অনেকক্ষণ পর্যন্ত উনি কোনো কথা বললেন না। পকেট থেকে তারপর হাতদুটো বার করে উনি ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেন। দেখে মনে হলো, উনি কাঁদছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'ইয়াসুয়াকি-চান মারা গেছে। আজকে আমরা সবাই ওর অন্ত্যেষ্টিতে যাবো।' হেডমাস্টারমশাই বলে চললেন, 'আমি জানি তোমরা সবাই ইয়াসুয়াকি-চানকে ভালোবাসতে। কী অন্যায়, কী অসম্ভব অন্যায়! আমার এত কষ্ট হচ্ছে—' এইটুকু বলে উনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ছেলেমেয়েরা স্তব্ধ হয়ে রইলো। এমন ঘন বিষণ্ণতা আগে কখনো ঘিরে ধরেনি ওদের। ওরা সবাই ইয়াসুয়াকি-চানের কথাই ভাবছিলো।

'এত তাড়াতাড়ি মারা গেলো?' তোত্তো-চান ভাবছিলো। 'আমার তো 'আঙ্কল টম'স্ ক্যাবিন' বইটা এখনো পড়াই শেষ হলো না। ইয়াসুয়াকি-চান যে ওটা আমায় ছুটির আগে পড়তে দিয়েছিলো!' ছুটির আগে ওর হাতে বইটা দেবার সময় ইয়াসুয়াকি-চানের আঙুলগুলো কেমন অসম্ভব বাঁকা দেখাচ্ছিলো, তোত্তো-চানের মনে পড়ে গেলো। যেদিন প্রথম ওদের দেখা হয়েছিলো সেদিন ও জিজ্ঞেস করেছিলো, 'তুমি ওইভাবে হাঁটো কেন?' আর ইয়াসুয়াকি-চান বলেছিলো, 'আমার পোলিও হয়েছিলো।' ওর গলার স্বর আর মিষ্টি হাসির কথা মনে পড়ছিলো তোত্তো-চানের। সেই যে ওরা গাছে চড়েছিলো দুজনে মিলে! কেমন ভারি ছিলো ইয়াসুয়াকি-চানের শরীরটা, অথচ কেমন আশ্চর্য বিশ্বাস নিয়ে সেই শরীরটাকে ও তোত্তো-চানের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলো, যদিও তোত্তো-চানের চাইতে ও লম্বা আর বয়সে বড় ছিলো। ইয়াসুয়াকি-চানই তো ওকে আমেরিকাতে যে টেলিভিশন বলে একটা জিনিস পাওয়া যায়, সেই কথাটা বলেছিলো। তোত্তো-চান ইয়াসুয়াকি-চানকে খুব ভালোবাসতো। ওরা একসঙ্গে টিফিন খেতো, খেলার সময় একসঙ্গে থাকতো, একসঙ্গে স্কুল ছুটির পর স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে যেতো। ওর জন্যে তোত্তো-চানের তো খুব কষ্ট হবে, সব সময় ওর কথা মনে পড়বে। ও বুঝতে পারছিলো যে, মারা গেছে মানে ইয়াসুয়াকি-চান আর কোনোদিন স্কুলে আসবে না। সেই মুরগির ছানাগুলোর মতন। ওরা যখন মরে গেলো, তখন ও কতবার ওদের ডাকলো, তবু ওরা সাড়া দিলো না। একটুও নড়লো না।

দেনেনচোফুতে ইয়াসুয়াকি-চানের বাড়ি। তার উল্টোদিকের একটা গির্জায় ওর জন্য প্রার্থনা হবে আর তারপর ওকে সমাধীস্থ করা হবে। তোমোইর ছেলেমেয়েরা সার বেঁধে, খুব নিঃশব্দে হেঁটে চললো জিয়ুগায়োকা থেকে। তোত্তো-চান একবারও এদিক ওদিকে তাকাচ্ছিলো না, ওর চোখ মাটির দিকে নামানো ছিলো। হেডমাস্টারমশাই যখন ওদের দুঃসংবাদটা দিলেন, তখন ওর যেমন লাগছিলো, এখন তার চেয়ে অন্যরকম লাগছে, ও খুব বুঝতে পারছিলো সেটা। প্রথমে ও কথাটা বিশ্বাসই করতে পারেনি, তারপর ওর খুব কষ্ট হতে লাগলো। কিন্তু এখন ওর একটাই ইচ্ছে হচ্ছিলো : একবার ইয়াসুয়াকি-চান বেঁচে উঠুক, শুধু একবার; একবার ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো

তোত্তো-চানের, খুব ইচ্ছে করছিলো। এত তীব্রভাবে ইচ্ছে করছিলো, যে মনে হচ্ছিলো ওর ভেতরটা যেন ভেঙে ভেঙে যাবে।

গির্জার মাঠটা সাদা লিলি ফুলে ভরে ছিলো। ইয়াসুয়াকি-চানের মিষ্টি দেখতে মা আর দিদি আর বাকি আত্মীয়রা সবাই কালো পোশাক পরে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। তোত্তো-চানকে দেখে ওরা সবাই আরো কাঁদতে লাগলেন। ওদের হাতের মুঠোয় সাদা রুমাল ধরা ছিলো। এই প্রথম তোত্তো-চানের কারো অন্ত্যেষ্টিতে আসা, ও বুঝতে পারছিলো এইসব জায়গায় এলে কী কষ্ট হয়। কেউ কোনো কথা বলছিলো না। অর্গানে গম্ভীর প্রার্থনা সঙ্গীত বাজছিলো। বাইরে আকাশে সূর্যটা জ্বলজ্বল করছিলো, সেই আলো গির্জার ভেতরেও ছড়িয়ে পড়েছিলো, তবু তার মধ্যে কোনো আনন্দ ছিলো না। হাতে কালো পট্টি বাঁধা এক ভদ্রলোক বাচ্চাদের সবার হাতে একটা করে সাদা ফুল দিয়ে ওদের একে একে গিয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের কফিনের ওপর ফুলটা রেখে আসতে বললেন।

কফিনের মধ্যে চোখ বুজে শুয়েছিলো ইয়াসুয়াকি-চান। ওর চারদিকে ফুল। যদিও ও বেঁচে ছিলো না, তবু ওকে দেখে আগের মতনই বুদ্ধিমান আর ভালো মানুষ মনে হচ্ছিলো। তোত্তো-চান নিচু হয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের হাতে ফুলটা রেখে, আলতো করে সেই হাতটা ছুঁলো। এই হাতটাকে ও কতবার ভালোবেসে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়েছে। ওর চেয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের হাতটা কত সাদা, কত পরিষ্কার, ওর আঙুলগুলো কত লম্বা, ঠিক যেন একজন বয়স্ক মানুষের মতন।

'আমি আসছি,' ফিসফিস করে ইয়াসুয়াকি-চানকে বললো তোত্তো-চান। 'আবার হয়তো আমাদের দেখা হবে, কোনোদিন, কোথাও, আমরা যখন বড় হয়ে যাবো—হয়তো তখন তোমার পোলিও সেরে যাবে।'

ও উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার ইয়াসুয়াকি-চানের দিকে তাকালো। 'ও হ্যাঁ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম 'আঙ্কল টম্‌স্ ক্যাবিন'! বইটা তো এখন আর তোমাকে ফেরত দিতে পারবো না, তাই না? আমার কাছেই রেখে দেবো যতদিন না আমাদের আবার দেখা হচ্ছে, কেমন?'

হাঁটতে শুরু করার পর ওর মনে হলো যেন ইয়াসুয়াকি-চান ওকে পেছন থেকে বলছে, 'তোত্তো-চান, আমরা দুজনে মিলে অনেক আনন্দ করেছিলাম, তাই না? আমি কোনোদিন তোমাকে ভুলবো না। কক্ষনো না।' গির্জার দরজায় পৌঁছে তোত্তো-চান ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমিও তোমাকে কোনোদিন ভুলবো না।'

বসন্তের আলো নরম হয়ে এসে পড়েছিলো ওদের সবার উপরে। এমনই আলো ছিলো সেদিন, যেদিন রেলগাড়ি ক্লাসরুমের ভেতরে তোত্তো-চানের সঙ্গে ইয়াসুয়াকি-চানের প্রথম দেখা হয়েছিলো। একই রকম আলো, কেবল আজ তোত্তো-চানের মুখ কান্নায় ভিজে গিয়েছিলো।

গুপ্তচর

অনেকদিন পর্যন্ত তোমোইর ছেলেমেয়েদের ইয়াসুয়াকি-চানের জন্য খুব মন খারাপ হতো। বিশেষ করে সকালবেলায়, ক্লাস শুরু হবার সময়। ইয়াসুয়াকি-চানের যে আসতে দেরি হচ্ছে না, ও যে আর কোনোদিন স্কুলে আসবে না, এটা মেনে নিতে ওদের বহুদিন লেগে গিয়েছিলো। ক্লাসে কম ছাত্রছাত্রী থাকাটা যেমন একদিক থেকে ভালো, তেমনি এরকম অবস্থায় কষ্টটাও বেশি হয়। ইয়াসুয়াকি-চানের না থাকাটা যেন বেশি করে চোখে পড়তো। ভাগ্যে তোমাইতে প্রত্যেকের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আসন ছিলো না। যদি ইয়াসুয়াকি-চানের কোনো একটা বিশেষ বসবার জায়গা থাকতো, তাহলে সেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যেতো আর তখন তো ওদের আরো অনেক বেশি কষ্ট হতো।

ইদানিং তোত্তো-চান বড় হয়ে কী হবে, তা নিয়ে খুব ভাবনা চিন্তা করছিলো। আরো যখন ছোট ছিলো তখন ভাবতো যে রাস্তার বাজনদার হবে, কিংবা ব্যালে নৃত্যশিল্পী। তারপর, যেদিনও তোমোইতে ভর্তি হতে এসেছিলো, সেদিন ভেবেছিলো ট্রেনের টিকিট বিক্রি করলে বেশ হয়। এখন ভাবছিলো, একটা অন্যরকমের কিছু হতে হবে, এমন একটা কিছু যেটা আবার মেয়েদের মানিয়েও যায়। মেয়েদের জন্য মানানসই কাজ? কথাটা ভাবতেই তোত্তো-চানের সেদিনকার হাসপাতালে যাবার কথাটা মনে পড়ে গেলো! সেই যে নার্সরা আহত সৈনিকদের ইঞ্জেকশন দিচ্ছিলেন, সেই কাজটা তো বেশ শক্ত। তাহলে ও কী করবে?

হঠাৎ ওর খুব আনন্দ হলো। 'তাই তো! আমি কী হতে চাই, তা তো কবেই ঠিক করা হয়ে গেছে!'

তখনই তাই-চান ওর বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বার্ণারটা জ্বালাচ্ছিলো। ওর কাছে গিয়ে তোত্তো-চান বললো, 'আমি ভাবছি বড় হয়ে গুপ্তচর হবো।' বেশ গর্বের সঙ্গে কথাটা বললো ও। তাই-চান আগুন থেকে চোখ সরিয়ে খানিকক্ষণ তোত্তো-চানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর খানিকক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলো। একটু ভেবে নিয়ে ও তোত্তো-চানকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বললো, 'গুপ্তচর হতে হলে তো বুদ্ধিমতি হতে হয়। তাছাড়া, গুপ্তচরদের অনেক ভাষাও জানতে হয়।' তাই-চান একটু দম নিলো। তারপর তোত্তো-চানের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে অকপটে বলে দিলো, 'সবচেয়ে বড় কথা মেয়ে গুপ্তচরদের খুব সুন্দর হতে হয় দেখতে।'

তোত্তো-চান ধীরে ধীরে তাই-চানের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মাটির দিকে তাকালো। একটু থেমে, তোত্তো-চানের দিকে না তাকিয়ে তাই-চান নিচু স্বরে গম্ভীরভাবে বললো, 'আমার মনে হয় গুপ্তচরেরা এত বাচাল হতে পারে না।'

তোত্তো-চান কী বলবে বুঝে পেলো না। তাই-চান ওর গুপ্তচর হওয়ার পরিকল্পনাটা

সমর্থন করলো না বলে নয়, তাই-চান ওর সম্পর্কে বলেছিলো প্রতিটা কথাই এত সত্যি যে তোত্তো-চান চুপ করে রইলো। মনে মনে ও এমনটাই সন্দেহ করেছিলো। ও বুঝতে পারলো যে গুপ্তচর হবার জন্য যা যা গুণের প্রয়োজন হয়, তার কোনোটাই ওর ছিলো না। তবে, তাই-চান ওকে কষ্ট দেবার জন্য যে এই কথাগুলো বলেনি, তা তোত্তো-চান জানতো। কী আর করা? গুপ্তচর হবার চিন্তাটা বাতিল করতে হবে। ভালোই হলো যে ও আগেই তাই-চানের সঙ্গে কথাটা আলোচনা করে নিয়েছিলো। তোত্তো-চান মনে মনে ভাবলো, 'বাব্বা! আমারই বয়সী একটা ছেলে, অথচ কত কীই না জানে!' তাই-চান যদি ওকে বলতো যে ও বিজ্ঞানী হতে চায়? তাহলে ও কী বলতো? বলতো, 'তুমি তো কী সুন্দর দেশলাই দিয়ে বার্ণার জ্বালাতে পারো!' নাঃ, সেটা খুবই বোকা বোকা শোনাতো। বলতো যে, 'তুমি তো জানো কিৎসুনের ইংরিজি হলো 'ফক্স' আর কুৎসু হলো 'সু'জ', তাই আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয় বিজ্ঞানী হতে পারবে।' না না, সেটা বলাও ঠিক হতো না।



তবে, এ বিষয়ে ও নিশ্চিত ছিলো যে তাই-চান দারুণ একটা কিছু করবে বড় হয়ে। তাই-চান ততক্ষণে ওর ফ্লাস্কের ওপর মনোনিবেশ করে ফেলেছে। তোত্তো-চান ওকে মিষ্টি করে বললো, 'ঠিক আছে, আমি তাহলে আর গুপ্তচর হবো না। কথাটা আমাকে বুঝিয়ে বলার জন্য ধন্যবাদ। আমি কিন্তু জানি যে একদিন তুমি খুব বিখ্যাত একজন কেউ হবে।'

তাই-চান মাথা চুলকে, বিড়বিড় করে কী যেন একটা বললো, তারপর সামনের খোলা বইটাতে ডুব দিলো। গুপ্তচর যখন হওয়া যাবে না, তাহলে ও কী হবে বড় হয়ে? তাই-চানের আগুনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তোত্তো-চান সেকথাই ভাবতে লাগলো।

বাবার বেহালা

কিছু বোঝার আগেই তোত্তো-চান আর ওর বাড়ির সবার ওপরে যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে এলো। প্রতিদিন পাড়ার বাচ্চা বাচ্চা ছেলে আর বড়দের 'বানজাই!' বলে, পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো। দোকান থেকে খাবার দাবার উধাও হয়ে যাচ্ছিলো। তোমোইর নিয়ম মেনে প্রতিদিন 'সাগর থেকে আর পাহাড় থেকে' কিছু কিছু দেওয়াও শক্ত হয়ে পড়ছিলো; মা কোনো রকমে সমুদ্রের আগাছা আর প্লামের আচার দিয়ে কাজ চালাচ্ছিলেন। প্রায় সব কিছুরই রেশন চলছিলো—যত খুশি কেনার উপায় ছিলো না। মিষ্টি তো পাওয়াই যাচ্ছিলো না, যতই খোঁজো না কেন।

তোত্তো-চানদের স্টেশনের আগের স্টেশন উইকাইয়ামা। সেখানে একটা মিষ্টির মেশিন ছিলো, পয়সা ফেললে তার থেকে এক প্যাকেট ক্যারামেল লজেন্স বেরিয়ে আসতো। তোত্তো-চান তার খবর জানতো। মেশিনটার ওপরে একটা ভারি লোভনীয় ছবি ছিলো। পাঁচ সেন দিলে একটা ছোট প্যাকেট পাওয়া যায়, দশ সেন দিলে বড় প্যাকেট। কিন্তু, অনেকদিন ধরে মেশিনটা ফাঁকা পড়ে ছিলো। যতই পয়সা ফেলো না কেন, কিছুতেই কিছু বেরোচ্ছিলো না। পয়সা ফেলে ধাক্কা মারলেও না। তোত্তো-চান হাল ছাড়বার মেয়ে নয়, তাই ও চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছিলো। 'হয়তো একটা প্যাকেট কোথাও আটকে আছে, ভেতরে কোথাও একটা প্যাকেট রয়েছে নিশ্চয়,' ও ভাবছিলো। প্রতিদিন ও স্কুল থেকে ফেরার পথে আগের স্টেশনে নেমে গিয়ে, মেশিনে পয়সা ফেলে ক্যারামেল পাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু প্রতিদিনই ঝনঝন শব্দে পয়সাটা ফেরত চলে আসছিলো।

এমন সময় বাবাকে একজন একটা কথা বললেন। বাবা যদি অস্ত্রের কারখানায় গিয়ে যুদ্ধের নানান সুর বাজিয়ে শোনান, তাহলে বিনে পয়সায় চিনি, চাল আর আরো অনেক কিছু পাওয়া যাবে। কিছুদিন আগেই বাবাকে খুব ভালো বেহালা বাজানোর

জন্য একটা বড় পুরস্কার দেওয়া হয়েছিলো, ফলে বাবাকে নিশ্চয় ওরা আরো অনেক বাড়তি জিনিস দেবে, সেই ভদ্রলোক বললেন। এমন প্রস্তাব অন্য কেউ শুনলে হয়তো লুফে নিতো।

মা বললেন, 'কী করবে? যাবে?'

যুদ্ধের সময় অনুষ্ঠান করার সুযোগ খুব কমে আসছিলো। সঙ্গীত শিল্পীদের অনেককে যুদ্ধে যোগ দিতে হচ্ছিলো, ফলে অর্কেস্ট্রায় শিল্পীর অভাব ছিলো। রেডিওতেও বেশির ভাগ যুদ্ধ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান হচ্ছিলো। তাই বাবা আর বাবার সহকর্মীদের বিশেষ কাজ ছিলো না। এমন সময় এ ধরনের একটা সুযোগ---বাবা খানিক ভেবে বললেন, 'ওরকম সুর আমি আমার বেহালায় বাজাতে চাই না।'

মা বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছো। আমি হলেও রাজি হতাম না। খাবার আমাদের ঠিকই জোগাড় হয়ে যাবে।'

বাবা জানতেন যে তোত্তো-চানকে যথেষ্ট খাবার দেওয়া যাচ্ছিলো না। বেচারা যে রোজ ওই উইকাইয়ামা স্টেশনের ক্যারামেলের মেশিনে গিয়ে পয়সা ফেলে, বাবা তা-ও জানতেন। এ সময় একটু বাড়তি খাবার দাবার পেলে খুবই সুবিধে হতো, তবু বাবার কাছে সঙ্গীতের অন্য মূল্য ছিলো। মা সেকথা জানতেন বলে কখনো জোর করেননি। বাবা বললেন, 'আমায় ক্ষমা করিস, তত্সকি।'

তখনো শিল্প আর শিল্পীর আদর্শ সম্পর্কে বোঝার মতন বড় হয়নি তোত্তো-চান। কিন্তু ও সেকথা জানতো যে বেহালা বাজাতে বাবা এতই ভালোবাসতেন যে ওদের বৃহত্তর পরিবার থেকে বাবাকে একঘরে করে দেওয়া হয়েছিলো। অনেকে অনেক কষ্ট দিয়েছিলো, তবু বাবা বেহালাটা ছাড়তে পারেননি। তাই তোত্তো-চান বুঝেছিলো যে বাবা যে সুর বাজাতে চান না, তা ওঁর বাজানোর কোনো দরকার নেই। বাবাকে ঘিরে লাফাতে লাফাতে ও বললো, 'আমার কোনোই আপত্তি নেই বাবা। আমি তোমার বেহালা খুব ভালোবাসি।'

পরদিন আবার তোত্তো-চান উইকাইয়ামা স্টেশনে নেমে গিয়ে লজেন্সের মেশিনটার ভেতরে একবার উঁকি মেরে দেখলো। মিষ্টি বেরিয়ে আসবার সম্ভাবনা ছিলো না যদিও, তবু ও আশা করে রইলো, হয়তো কিছু একটা পেয়ে যাবে!

প্রতিশ্রুতি

দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর গোল করে সাজানো টেবিল চেয়ারগুলো সরিয়ে রেখে দিতো ওরা, তখন হলঘরটা বেশ বড় হয়ে যেতো।

'আজকে আমিই প্রথম হেডমাস্টারমশাইয়ের পিঠে চড়বো,' তোত্তো-চান ঠিক করলো। রোজই ও এটা করতে চাইতো, কিন্তু এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেই আর কেউ গিয়ে ওঁর কোলে চেপে বসতো, অন্য দুজন হয়তো ততক্ষণে ওঁর পিঠ বেয়ে উঠছে

একটু পাত্তা পাবার জন্য। হেডমাস্টারমশাই তখন আসন করে বসে থাকতেন মেঝের উপরে, হলঘরের মাঝখানটাতে।

'নাম, নাম তোরা।' হাসতে হাসতে হেডমাস্টারমশাইয়ের মুখটা লাল হয়ে যেতো। তবু ছেলেমেয়েরা ঘাড় পিঠ থেকে নামতে চাইতো না।

তাই একটু দেরি হলেই হেডমাস্টারমশাইয়ের পিঠটা দখল হয়ে যাবার ভয় থাকতো। কিন্তু আজ তোত্তো-চান ঠিক করে রেখেছিলো যে ওকে প্রথম হতেই হবে। তাই ও হলঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। হেডমাস্টারমশাইকে ঢুকতে দেখেই ও চেঁচিয়ে উঠলো, 'মাস্টারমশাই, তোমাকে আমার একটা কথা বলার আছে!'

'কী কথা?' মাটিতে আসন করে বসতে বসতে উনি জিজ্ঞেস করলেন।

কদিন ধরে ভাবার পর যে কথাটা ও মনে মনে ঠিক করেছিলো, সেটাই আজ জানাতে চাইছিলো হেডমাস্টারমশাইকে। হঠাৎ ওর মনে হলো, এখন পিঠে চড়াটা ঠিক হবে না। তাই ও মাস্টারমশাইয়ের খুব কাছাকাছি, মুখোমুখি বসে ঘাড় কাত করে অল্প একটু হাসলো। ছোট্টবেলা থেকেই মা এই হাসিটাকে 'লক্ষ্মী-মেয়ে হাসি' বলেন। এই হাসিটাই ওর শ্রেষ্ঠ ভঙ্গী। ও নিজেও বিশ্বাস করতো যে ওইভাবে ঠোঁটটা একটু ফাঁক করে হাসবার সময় ও খুব ভালো মেয়ে হয়ে যায়।

হেডমাস্টারমশাই ওর দিকে উৎসুক চোখে তাকালেন। 'কী হয়েছে?' উনি একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন।

তোত্তো-চান মিষ্টি করে, ধীরে ধীরে, বেশ মা মা বা দিদি দিদি ভাব করে বললো, 'বড় হয়ে আমি আমাদের এই স্কুলে পড়াতে চাই। সত্যি বলছি।'

তোত্তো-চান ভেবেছিলো হেডমাস্টারমশাই বুঝি ওর কথাটা শুনে হাসবেন। কিন্তু উনি খুব গম্ভীরভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কথা দিচ্ছো?' যেন ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস।

তোত্তো-চান খুব জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'কথা দিচ্ছি।' বুকের ভেতর থেকে ওর এই ইচ্ছেটা উঠে আসছিলো—বড় হয়ে ও তোমোইতে পড়াবে।

প্রথম যেদিন তোমোইতে এসেছিলো সেই দিনটার কথা ভাবছিলো তোত্তো-চান। কতদিন আগের কথা যেন! কত কী বক বক করেছিলো ও হেডমাস্টারমশাইয়ের অফিসে বসে আর উনি কত ধৈর্য্য ধরে ওর কথা শুনেছিলেন। কথা শেষ হবার পর কী সুন্দর করে উনি বলেছিলেন, 'আজ থেকে তুমি এখানকার ছাত্রী হয়ে গেলে।' সেদিন যতটা ভালো লেগেছিলো আজ তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসে ও হেডমাস্টারমশাইকে। তাই ও সংকল্প করেছিলো যে, হেডমাস্টারমশাইয়ের জন্য কিছু একটা করবেই করবে।

তোত্তো-চানের প্রতিশ্রুতি হেডমাস্টারমশাই একগাল হাসলেন, আর ওঁর ফোকলা দাঁত সব বেরিয়ে এলো। তাতে অবশ্য কখনোই ওঁর কিছু এসে যেতো না। তোত্তো-

চান ওর কড়ে আঙুলটা এগিয়ে দিলো। হেডমাস্টারমশাইও তাই করলেন। ওঁর কড়ে আঙুলটাতে এমন একটা শক্তি ছিলো যা দেখে বেশ ভরসা করা যেতো। তোত্তো-চান আর হেডমাস্টারমশাই কড়ে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে, প্রাচীন জাপানী রীতিতে শপথ নিলো। হেডমাস্টারমশাইয়ের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠেছিলো, তাই দেখে তোত্তো-চান আশ্বস্ত হয়ে হাসলো। ও তোমোইতে পড়াবে! কী চমৎকার ভাবনা!

'আমি যখন তোমোইর দিদিমণি হবো...' ও বলতে শুরু করলো। ওর চিন্তাটা ছিলো এইরকম : কম পড়া; বেশি বেশি স্পোর্ট্স; বেশি বেশি চড়ুইভাতি; বেশি করে ক্যাম্প আর হাঁটতে যাওয়া!

শুনে হেডমাস্টারমশাই ভারি পুলকিত হলেন। তোত্তো-চান একদিন বড় হয়ে যাবে, এটা ভাবা খুব সহজ ছিলো না, তবে উনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে ও তোমোইতে পড়াতে পারবে। ওঁর মনে হচ্ছিলো, তোমোইর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই ভালো শিক্ষক হতে পারবে, কারণ ওরা বোধহয় ওদের শৈশব কখনো ভুলে যাবে না।

তোমোইতে সেদিন হেডমাস্টারমশাই এবং তাঁর এক ছাত্রী দশ বছর কিংবা তার চেয়েও পরের কোনো একটি দিন সম্পর্কে গভীর এক শপথ নিচ্ছিলো। অথচ সবাই তখন বলছিলো যে, কদিনের মধ্যেই নাকি আমেরিকার বোমারু বিমান জাপানের আকাশে দেখা যাবে।

রকি হারিয়ে গেলো

অনেক সৈন্যের মৃত্যু, চরম খাদ্যাভাব আর মানুষের মনের ভয়কে উপেক্ষা করে গ্রীষ্মকাল এসে হাজির হলো। যে দেশ যুদ্ধ জয় করছিলো আর যে সব দেশ পরাজিত হচ্ছিলো—সূর্যদেব সকলকেই তাপ দিচ্ছিলেন।

তোত্তো-চান কামাকুরাতে ওর জেঠুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলো, সেখান থেকে এই সবে তোকিওতে ফিরে এসেছে। এখন আর তোমোইতে আগের মতন ক্যাম্প করা হয় না, আর ওরা গরম জলের কুণ্ডতে বেড়াতে যেতে পারে না। আগে যেমন ছুটিতে মজা হতো, তেমন যেন আর কোনোদিন হবে না মনে হয়।

তোত্তো-চান আগে আগে কতবার তো ওর দাদা দিদিদের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়েছে ওদের কামাকুরার বাড়িতে, কিন্তু এবার সেটাও অন্যরকম ছিলো। একটা দাদা ছিলো যে খুব ভালো ভূতের গল্প বলতে পারতো, তাকে যুদ্ধে চলে যেতে হয়েছে। ওর যে জেঠু আমেরিকা সম্পর্কে মজার মজার সব গল্প বলতেন—কে জানে সেগুলো সত্যি কিনা—তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেছেন। জেঠুর নাম সুজি তাগুচি, তিনি খুব বিখ্যাত একজন আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন। জেঠু অনেক দিন নিউ ইয়র্কে নিহন নিউজ সংবাদ সংস্থা অফিসের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছিলেন, তারপর আবার আমেরিকান মেট্রো নিউজ সংবাদ সংস্থার সুদূর প্রাচ্যের সংবাদদাতা

হিসেবেও কাজ করেছিলেন; তাই ওঁর নামটা ছোট করে হয়ে গিয়েছিলো সু তাগুচি। বাবার দাদা হওয়া সত্ত্বেও ওদের নাম আলাদা আলাদা ছিলো, কারণ বাবা ঠাকুমার পারিবারিক নামটাকে চালু রাখার জন্য সেই নামটাকে পদবি হিসেবে নিয়ে নিয়েছিলেন। নয়তো বাবার পদবিও তাগুচি হবার কথা ছিলো।

সুজি জ্যেঠুর তোলা 'রাবাউল যুদ্ধ' ছবিটা তখন সব সিনেমা হলে দেখানো হচ্ছিলো। সেই ছবি দেখে জ্যেঠিমা আর দাদা দিদিদের খুব চিন্তা হচ্ছিলো। যুদ্ধের সিনেমাতে সব সময় সৈন্যদের অগ্রসর হবার ছবি দেখাতে হয়, ফলে যিনি সেই ছবি তোলেন, তাঁকে সৈন্যদের থেকেও এগিয়ে থাকতে হয়। এইসব দুর্ভাবনার কথাই তখন বড়রা আলোচনা করছিলেন।

কামাকুরার সমুদ্রতীরটাও কেমন যেন নিঃসঙ্গ লেগেছিলো সেবার গ্রীষ্মে। তবে সুজি জ্যেঠুর যে বড় ছেলে, ইয়াত-চান, সে খুবই মজা করেছিলো। ইয়াত-চান তোত্তো-চানের চেয়ে এক বছরের ছোট। ওরা সব ভাই-বোন একটাই মশারির তলায় শুতো। ঠিক ঘুমোতে যাবার আগে ইয়াত-চান 'মহারাজ দীর্ঘজীবি হোন!' বলে মৃত সৈনিকের মতন কাত হয়ে পড়ে যেতো। বারবার একই খেলা দেখাতো ও। মজার ব্যাপার ছিলো, যেদিনই ও এই খেলাটা দেখাতো, সেদিনই ও ঘুমের মধ্যে হাঁটতে শুরু করতো, আর হাঁটতে হাঁটতে বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে বিরাট গোলমাল পাকিয়ে ফেলতো।

বাবার তোকিওতে কাজ ছিলো বলে এবার মাও তোকিওতে রয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটির শেষে সেই ভূতের গল্প বলা দাদার এক বোন তোত্তো-চানকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলো।

বাড়ি ফিরেই তোত্তো-চান রকিকে খুঁজতে গেলো। সব সময়ই ও তাই করে। কিন্তু রকিকে কোথাও পাওয়া গেলো না। বাড়ির ভেতরেও নেই, বাগানেও না। বাবার অর্কিড হতো যে বিশেষ ঠাণ্ডা ঘরে, সেখানেও রকিকে পেলো না ও। তোত্তো-চান ভয় পেয়ে গেলো। সাধারণত তোত্তো-চান বাড়িতে ঢোকার আগেই রকি বেরিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতো, তোত্তো-চান তাই বাইরে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রকিকে ডাকতে লাগলো। কিন্তু ওর সুন্দর চোখ, কান, ল্যাজ—কিছুই দেখতে পেলো না। হয়তো রকি বাড়িতে ফিরে গেছে, এই ভেবে ও ছুটে ঘরে ফিরে এলো। কিন্তু ঘরে কোথায়? নেই তো!

'রকি কোথায়?' ও মাকে জিজ্ঞেস করলো।

মা নিশ্চয় জানতেন যে তোত্তো-চান রকির খোঁজে ঘর-বার করছে, তবু কিছু বললেন না।

'রকি কোথায়?' তোত্তো-চান মায়ের জামা ধরে টানতে লাগলো।

মায়ের কষ্ট হচ্ছিলো উত্তর দিতে। 'ও হারিয়ে গেছে,' মা বললেন।

তোত্তো-চান বিশ্বাস করতে রাজি ছিলো না। রকি হারিয়ে যাবে কি করে? 'কবে?' ও মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

মা যেন কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। 'তুমি কামাকুরা চলে যাবার ঠিক পরেই,' মা কষ্ট করে বলতে শুরু করলেন। তারপর তাড়াহুড়ো করে বলতে লাগলেন, 'আমরা ওকে খুঁজেছিলাম। অনেক খুঁজেছিলাম। সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না। তোমাকে কেমন করে কথাটা বলবো ভাবছিলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, জানো।'

তোত্তো-চান এবার আসল কথাটা বুঝে ফেললো। রকি নিশ্চয় মরে গেছে। 'মা চান না যে আমি কষ্ট পাই, কিন্তু আমি জানি, রকি মরে গেছে,' ও ভাবলো। ব্যাপারটা ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো। এতদিন পর্যন্ত যখনই তোত্তো-চান কোথাও গেছে, তা সে যত দূরেই হোক না কেন, রকি কক্ষনো বাড়ি থেকে বেশি দূরে কোথাও যায়নি। তোত্তো-চান যে ফিরে আসবেই, রকি তা জানতো। 'আমাকে না বলে রকি কখনো কোথাও চলে যেতে পারে? কক্ষনো না,' ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভাবলো।

কিন্তু মাকে ও এইসব ভাবনার কথা বললো না। ও বুঝতে পারছিলো যে মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে। ও শুধু বললো, 'কী জানি কোথায় গেলো?' বলে ও মাথা নিচু করে রইলো।



এর বেশি কিছু ও বলতে পারলো না। ও ছুটে দোতলায় ওর ঘরে চলে গেলো। রকিকে ছাড়া বাড়িটা তো আর বাড়িই রইলো না। ও না কাঁদবার চেষ্টা করতে লাগলো। আর একবার গোটা ঘটনাটা ভেবেও দেখলো। এমন কিছু করেছিলো কি তোত্তো-চান, কোনো ভাবে রকিকে দুঃখ দিয়েছিলো কি, যার জন্যে রকি ওকে ছেড়ে চলে গেলো?

হেডমাস্টারমশাই বলতেন, 'পশুদের কক্ষনো ক্ষেপাবে না, কষ্ট দেবে না। যে জন্তুরা তোমার ওপর ভরসা করে, তাদের কষ্ট দেওয়া খুব অন্যায়। একটা কুকুরকে যদি তুমি কিছু দিয়ে লোভ দেখিয়ে শেষে সেই জিনিসটা না দাও, সেটা খুবই নিষ্ঠুর কাজ হবে। তখন কুকুরটারও স্বভাব খারাপ হয়ে যেতে পারে।'

তোত্তো-চান তো সব সময় এই নিয়ম মেনে চলেছে। ও কোনোদিন রকিকে ঠকায়নি, কক্ষনো ওর প্রতি অন্যায় করেনি।

হঠাৎ ওর টেডি পুতুলটার দিকে চোখ পড়লো। এতক্ষণ পর্যন্ত ও নিজেকে সামলে রেখেছিলো, কিন্তু এবার আর পারলো না। ও কেঁদে ফেললো। পুতুলটার গায়ে রকির গায়ের এক গোছা হালকা খয়েরি রং-এর চুল লেগেছিলো। যেদিন ও কামাকুরাতে চলে গেলো, সেদিন সকালে দুজনে মিলে হুটোপুটি করবার সময় হয়তো ওই চুলটা খশে পড়েছিলো। সেই এক গোছা চুল হাতের মুঠোয় ধরে ও কাঁদতে লাগলো আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চললো। ও যেন আর থামতে পারছিলো না।

প্রথমে ইয়াসুয়াকি-চান, তারপর রকি—তোত্তো-চানের আর একজন বন্ধু ওকে ছেড়ে চলে গেলো।

টি পার্টি

শেষে রিয়ো-চানের যুদ্ধে যাবার ডাক এলো। বাচ্চারা সবাই স্কুলের এই দারোয়ানজিকে ভারি ভালোবাসতো। রিয়ো-চান এমনিতে বয়সে যথেষ্ট বড় ছিলো, তবু ছেলেমেয়েরা ওকে ভালোবেসে ওর ছেলেমানুষ নামটা ধরেই ডাকতো। যে কোনো বিপদে রিয়ো-চানই সহায়, তোমোই-র মুস্কিল-আসান। বেশি কথার মানুষ ছিলো না, সব সময় মুখে একটা হাসি লেগে থাকতো, আর যে কোনো সমস্যার সহজে সমাধান করে দিতে পারতো। যেদিন তোত্তো-চান বাথরুমের নোংরার ট্যাঙ্কে পড়ে গিয়েছিলো, সেদিন রিয়ো-চানই তো ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে, ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিলো। ওর মুখে কিন্তু একটুও বিরক্তির ভাব ছিলো না।

'আমরা সবাই মিলে রিয়ো-চানকে বরং একটা জমজমাট 'টি পার্টি'তে নেমন্তন্ন করি, কি বলো?' হেডমাস্টারমশাই বললেন।

'টি পার্টি?'

'গ্রিন টি'—এক ধরনের চা—বার বার খাওয়াটা একটা জাপানী রীতি, তার সঙ্গে অনুষ্ঠান বা উৎসবের কোনো সম্পর্ক নেই। উৎসবের জন্য একটা বিশেষ গুঁড়ো চা তৈরি হয়। কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার। তোমোইতে এই চায়ের আসর বা টি পার্টি আগে কখনো হয়নি, অতএব এটা বেশ একটা নতুন ব্যাপার হবে। আইডিয়াটা ছোটদের দিব্যি পছন্দ হলো। নতুন নতুন জিনিস করতে ওদের খুব ভালোলাগতো। ছোটরা তো বুঝতে পারেনি, কিন্তু হেডমাস্টারমশাই আসলে 'সাওয়াবাই' (টি পার্টি বা চায়ের আসর) নামে একটা নতুন শব্দ আবিষ্কার করেছিলেন। উনি 'সোবেৎসুকাই' (বিদায় সভা) শব্দটা ব্যবহার করতে চাননি। বিদায় সভা বললে খুব মন খারাপ হয়ে যায়; আর, একটু উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা হয়তো বুঝেও যাবে যে রিয়ো-চান যেহেতু যুদ্ধে যাচ্ছে এবং যুদ্ধ থেকে ও আর নাও ফিরে আসতে পারে, অতএব বিদায় মানে চিরকালের জন্য বিদায়ও হতে পারে। কিন্তু 'টি পার্টি' ব্যাপারটা নতুন, তাই তার মধ্যে একটা উত্তেজনাও ছিলো।

স্কুল ছুটির পর মিস্টার কোবায়াশি ছেলেমেয়েদের হলঘরে গোল করে টেবিল চেয়ারগুলো সাজাতে বললেন। যেমন ওরা দুপুরে খাবার সময় সাজিয়ে থাকে। সবাই যখন গোল হয়ে বসলো তখন উনি ওদের একটুকরো করে শুকনো, শ্যাঁকা সামুদ্রিক স্কুইড দিলেন গ্রিন টির সঙ্গে খেতে। যুদ্ধের সময় এটুকুই বিরাট বিলাসিতার ব্যাপার ছিলো। তারপর উনি রিয়ো-চানের পাশে বসে ওকে একটা গ্লাসে একটুখানি 'সাকে' খেতে দিলেন। সে সময় যারা যুদ্ধে চলে যাচ্ছিলো, তাদের জন্য সরকার থেকে ওইটুকু সাকে দেওয়া হচ্ছিলো।

'তোমোইতে এই প্রথম আমরা একটা টি পার্টি করছি,' হেডমাস্টারমশাই বললেন। 'তো, চলো, আমরা সবাই মিলে আনন্দ করি। তোমাদের যদি রিয়ো-চানকে কিছু বলার থাকে, তাহলে তা বলতে পারো। শুধু রিয়ো-চানকেই নয়, তোমরা একে অন্যকেও কিছু বলতে পারো। উঠে এসে, মাঝখানে দাঁড়িয়ে, একজন একজন করে বলো।'

কেবল যে শুকনো, শ্যাঁকা স্কুইডই প্রথম খাচ্ছিলো ওরা তোমোইতে, তা নয়। এই প্রথম রিয়ো-চান ওদের সঙ্গে বসে খাচ্ছিলো, আর এই প্রথম ওরা রিয়ো-চানকে সাকে খেতে দেখছিলো।

ওরা একজন করে উঠে দাঁড়িয়ে, রিয়ো-চানের দিকে তাকিয়ে, একটা কিছু বলতে লাগলো। প্রথম কয়েকজন রিয়ো-চানকে তার শরীরের যত্ন নিতে বললো, বললো সে যেন সাবধানে থাকে। তারপর তোত্তো-চানের ক্লাসের একটি ছেলে, মিগিতা, সে বললো, 'পরের বার বাড়ি যাবো যখন, তখন আমি অন্ত্যেষ্টির পিঠে নিয়ে আসবো।'

সবাই খুব হাসলো। বছর খানেক আগে একবার মিগিতা ওদের বলেছিলো যে

কার একজনের অন্ত্যেষ্টিতে গিয়ে ও নাকি খুব ভালো পিঠে খেয়েছিলো। যখনই কথা উঠতো ও বলতো যে ওদের জন্যেও সেই পিঠে নিয়ে আসবে একদিন।

অন্ত্যেষ্টির কথা শুনে হেডমাস্টারমশাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। এমন দিনে মৃত্যুর প্রসঙ্গ তোলাটা হয়তো ঠিক নয়, অন্ত্যেষ্টির পিঠে বলতে অশুভ কিছুও মনে হতে পারে। কিন্তু মিগিতার বলার ধরনে এমন একটা সহজ সরল ভাব ছিলো—যেন ভালো একটা কিছু খেয়েছিলো, সেটাই বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছে—যে, হেডমাস্টারমশাইও হেসে ফেললেন। রিয়ো-চানও খুব হাঃ হাঃ করে হাসলো। আসলে, মিগিতা তো কবে থেকে ওদের ওই পিঠের গল্প শোনাচ্ছে!

ওয়ি উঠে দাঁড়িয়ে রিয়ো-চানকে বললো যে ও নাকি জাপানের সবচেয়ে ভালো উদ্যানবিদ হবে একদিন। আসলে, ওয়ির বাবার একটা বিশাল বড় চারা গাছের নার্সারি ছিলো তোদোরোকিতে। কেইকো আয়োকি দাঁড়িয়ে কেবল লজ্জা পেয়ে হাসলো, তারপর কিছু না বলে বসে পড়লো। এই না দেখে তোত্তো-চান লাফিয়ে উঠে ওর হয়ে বললো, 'কেইকো-চানের বাড়ির মুর্গিগুলো উড়তে পারে! আমি দেখেছি সেদিন!'

তারপর আমাদেরা বললো, 'যদি কেউ কোনো আহত বেড়াল বা কুকুর দেখতে পাও, আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি ওদের সারিয়ে তুলবো।'

তাকাহাশি এতই বেঁটে ছিলো যে, ও মুহূর্তের মধ্যে টেবিলের তলা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এসে মাঝখানটাতে দাঁড়ালো। তারপর হাসিখুশি গলায় বললো, 'ধন্যবাদ রিয়ো-চান। অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমাদের জন্য যা করেছ, তার জন্য ধন্যবাদ।'

এরপর আইকো সাইশো উঠে দাঁড়ালো। 'রিয়ো-চান, তুমি যে আমার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলে যেদিন আমি পড়ে গিয়েছিলাম, সে কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না।' আইকো সাইশোর দাদুর ভাই ছিলেন রুশ-জাপান যুদ্ধের বিখ্যাত নৌ সেনাপতি, অ্যাডমিরাল তোগো ওর আর এক আত্মীয়া, আতসুকো সাইশো, মেইজি রাজ দরবারের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। আইকো কিন্তু কখনোই এঁদের নাম উল্লেখ করতো না।

হেডমাস্টারমশাইয়ের মেয়ে মিয়ো-চান রিয়ো-চানকে সবচেয়ে ভালো করে চিনতো। ওর চোখ জলে ভরে উঠলো। 'নিজের যত্ন নিও, কেমন? আর, আমরা দুজন দুজনকে চিঠি লিখবো, ঠিক আছে?'

তোত্তো-চানের এত কিছু বলার ছিলো যে ও কোথা থেকে শুরু করবে, তা-ই ঠিক করতে পারছিলো না। তখন ও শুধু বললো, 'যদিও তুমি চলে যাবে, রিয়ো-চান, আমাদের রোজই এই রকম একটা টি পার্টি হবে।'

হেডমাস্টারমশাই হাসলেন, রিয়ো-চানও। সব ছেলেমেয়েরা হাসতে লাগলো আর তোত্তো-চান নিজেও খুব হাসলো। কিন্তু তোত্তো-চানের কথাটাই কিন্তু ফলে গেলো। এরপর থেকে যখনই ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে হতো, তখনই ওরা 'টি পার্টি',

'টি পার্টি' খেলতো। শুকনো, শ্যাঁকা স্কুইডের বদলে গাছের বাকল, আর চায়ের বদলে জল; মাঝে মাঝে জলটাকে ওরা সাকেও মনে করতো। কেউ একজন উঠে বলতো, 'আমি তোমাদের জন্য অন্ত্যেষ্টির পিঠে নিয়ে আসবো,' আর ওরা সবাই হেসে উঠতো। তারপর ওরা যে যার মনের কথা বলতো। খাবার কিছুই থাকতো না, তবু ওরা ওদের 'টি পার্টি' গুলো খুব উপভোগ করতো।

রিয়ো-চান ছেলেমেয়েদের জন্য এই চমৎকার 'টি পার্টি' খেলাটা রেখে গিয়েছিলো। আর, যদিও ওরা সে সময় ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি, ওটাই ছিলো তোমোইতে ওদের শেষ খেলা। এরপর ওদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়ে যার যার মতন করে নিজের নিজের পথে চলতে হয়েছিলো।

রিয়ো-চান তোয়োকোর ট্রেনে করে চলে গেলো। ওর চলে যাওয়া আর আমেরিকার বোমারু বিমানের জাপানে পৌঁছনো একই সময়ে ঘটেছিলো। তোকিওর আকাশে আমেরিকার প্লেন দেখা গেলো। প্রতিদিন প্লেন থেকে গোলাবর্ষণ হতে লাগলো।

সায়োনারা, সায়োনারা! বিদায়!

তোমোই গাকুয়েন আগুনে ধ্বংস হয়ে গেলো। মাঝরাতে ঘটলো ঘটনাটা। মিয়ো-চান, ওর বোন মিসা-চান আর ওদের মা কোনো রকমে কুহনবুৎসু পুকুরের ধারের তোমোইর ক্ষেতে চলে গিয়ে নিজেদের বাঁচাতে পারলো। ওদের বাড়ি তো স্কুলের লাগোয়া ছিলো।

বি ২৯ বোমারু বিমান থেকে গোলা এসে পড়ে রেলগাড়ি স্কুল বাড়িটাকে পুড়িয়ে শেষ করে দিলো।

হেডমাস্টারমশাইয়ের স্বপ্নের স্কুলটাকে আগুন গ্রাস করে নিলো। তখন কোথায় ছিলো শিশুদের হাসি, গল্প আর গান? এক ভয়াবহ শব্দে স্কুলটা মরমর করে ভেঙে পড়ে গেলো। ওই বীভৎস আগুনের শিখা নিভবে কেমন করে? সমস্ত জিয়ুগায়োকা জুড়ে আগুন জ্বলতে লাগলো। তোমোই পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেডমাস্টারমশাই আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। গায়ে সেই প্রতিদিনকার ম্যাড়ম্যাড়ে তিন-পিস স্যুট, দু হাত জ্যাকেটের পকেটে ঢোকানো।

'এরপর আমরা কেমন স্কুল তৈরি করবো?' হেডমাস্টারমশাই ওঁর বড় ছেলে, যে তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তো, তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সেই ছেলের নামও ছিলো তোমোই। তোমোই কোনো কথা বলতে পারলো না।

সোসাকু কোবায়াশির মনে স্কুলের প্রতি আর স্কুলের শিশুদের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ছিলো, আগুন সেই ভালোবাসাকে পোড়াতে পারেনি। হেডমাস্টারমশাইয়ের মন তখনো আনন্দে ভরাট ছিলো।

শহর ছেড়ে যাবার ট্রেনের ভেতরে, বড়দের সঙ্গে গাদাগাদি হয়ে তোত্তো-চান চলছিলো। ট্রেনটা উত্তরপূর্ব দিকে যাচ্ছিলো। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ওর হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা মনে পড়ছিলো। উনি বলেছিলেন, 'আমাদের আবার দেখা হবে!' উনি ওকে দেখলেই বলতেন, 'তুমি কিন্তু সত্যিই খুব ভালো মেয়ে, জানো তো সে কথা?' এই কথাগুলো ও ভুলতে চাইছিলো না। হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ওর আবার দেখা হবে, এই আশ্বাসটুকু বুকে নিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়লো।

ভীত, সন্ত্রস্ত যাত্রী বোঝাই হয়ে অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চললো ট্রেন।

পুনশ্চ

অনেকদিন ধরে আমার খুব ইচ্ছে ছিলো তোমোই নামে আমাদের সেই স্কুল আর তোমোইর প্রতিষ্ঠাতা, সোসাকু কোবায়াশির কথা লিখবো।

এই বইয়ের একটি ঘটনাও আমি আমার খেয়ালখুশি মতন বানিয়ে লিখিনি। এ সবই ঘটেছিলো আর ভাগ্য ভালো যে অনেক কথাই আমার মনে থেকে গেছে। এই সব গল্প লেখার ইচ্ছে ছাড়াও আমার একটা দীর্ঘদিনের শপথের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। সেই কোন শিশুকালে একদিন আমি মিস্টার কোবায়াশিকে কথা দিয়েছিলাম বড় হয়ে তোমোইতে পড়াবো, সে কথা আমি আগেই বলেছি। সেদিনের সেই প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পারিনি। তার বদলে তাই চেষ্টা করেছি মিস্টার কোবায়াশি কেমন মানুষ ছিলেন, কেমন করে ছোটদের শিক্ষা দিতে চাইতেন তিনি, ছোটদের কী অসম্ভব ভালোবাসতেন, সেই গল্প যতজনকে পারি শোনাবার।

সোসাকু কোবায়াশি মারা যান ১৯৬৩-তে। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমাকে আরো কত কথা বলতে পারতেন। এখন লিখতে গিয়ে বুঝতে পারি কত কত সব ঘটনা, যেগুলোকে আমার নিছক ছেলেবেলার সুখস্মৃতি বলে মনে হয়, তার পেছনে হেডমাস্টারমশাইয়ের কী গভীর চিন্তা কাজ করেছিলো। 'ও আচ্ছা, মিস্টার কোবায়াশির মাথায় তাহলে এই ছিলো তখন!' এখন ভাবি। কিংবা, কখনো মনে হয়, 'কী আশ্চর্য! এরকম করে ডাকতেন উনি!' যত ভাবি, যত বুঝি, ততই অবাক হয়ে যাই।

আমার নিজের কথাই ভাবি; তোমোইতে ভর্তি না হলে আমি হয়তো খুব জটিল একটা মানুষ থেকে যেতাম, হয়তো আমায় সবাই 'বাজে মেয়ে' বলেই জানতো। কিন্তু ওই যে মিস্টার কোবায়াশি আমাকে বার বার বলতেন যে 'তুমি কিন্তু সত্যিই খুব ভালো মেয়ে', এই কথাটা আমায় গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো।

১৯৪৫ সালে, তোকিওর ওপর যখন ক্রমাগত গোলাবর্ষণ হচ্ছিলো, তখনই আগুনে পুড়ে যায় তোমোই। মিস্টার কোবায়াশি নিজের অর্থ দিয়ে এই স্কুলটি গড়েছিলেন, ফলে নতুন করে আবার শুরু করাটা সহজ ছিলো না। যুদ্ধের পর পুরনো স্কুলের জমিতেই উনি নতুন করে একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুল শুরু করেন। একই সঙ্গে উনি কুনিতাচি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের একটি শিশু শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন। সেখানে উনি ইউরিদমিক্সের ক্লাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুনিতাচি প্রাথমিক

বিদ্যালয়টিও স্থাপন করার উদ্যোগ নেন। ৬৯ বছর বয়সে যখন সোসাকু কোবায়াশি মারা যান, তখনও তিনি তাঁর আদর্শ স্কুল নতুন করে শুরু করতে পারেননি।

তোকিও শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, জিয়ুগায়োকা স্টেশন থেকে তিন মিনিটের হাঁটা পথের দূরত্বে তোমোই গাকুয়েন স্কুলটা ছিলো। সেখানে এখন একটি বিশাল বাজার, 'পিকক সুপারমার্কেট' নাম, আর 'কার পার্ক', অথবা গাড়ি রাখবার জায়গা, দেখতে পাওয়া যায়। সেদিন কেবল স্মৃতির টানে আমি আমার গাড়ি নিয়ে ওই দিকটাতে গিয়েছিলাম। গাড়ি রাখবার জায়গাটাতে এক সময় আমাদের রেলগাড়ি ক্লাসরুমগুলো দাঁড়িয়ে থাকতো, তার পাশেই আমাদের খেলার মাঠ ছিলো। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় কার পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যে লোকটি ছিলো, সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জায়গা নেই, জায়গা নেই!'

আমার বলতে ইচ্ছে করছিলো, 'তোমার কাছে আসিনি ভাই, আমি কেবল আমার স্মৃতির কাছে এসেছি। আমার গাড়ি রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।' কিন্তু সে তো আমার এই কথার মানে বুঝতোই না। তাই আমি এগিয়ে গেলাম। এক গভীর বিষণ্ণতা আমাকে ঘিরে ধরলো আর আমার চোখ থেকে জল ঝরতে লাগলো।

আমি জানি, গোটা বিশ্বজুড়েই নিশ্চয় এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, আদর্শ স্কুল স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্ন সফল করা কত কঠিন কাজ, আমি জানি। মিস্টার কোবায়াশি দীর্ঘদিন পড়াশুনো করে, নিজেকে প্রস্তুত করে, তবেই ১৯৩৭ সালে ওঁর স্কুল শুরু করেছিলেন। আর ১৯৪৫ এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এত ছোট্ট ছিলো তোমোইর জীবন!

আমার বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে, তোমোইতে আমি যে সময়টাতে গিয়েছিলাম, সেটা ছিলো মিস্টার কোবায়াশির পূর্ণ বিকাশের সময়। যখন ভাবি যে যুদ্ধ না হলে আরো কত কত ছোট ছেলেমেয়ে ওঁর ছায়ায় বড় হতে পারতো, তখন এই চরম অপচয়ের জন্য আমার খুব আক্ষেপ হয়।

এখানে আমি মিস্টার কোবায়াশির শিক্ষাপদ্ধতির একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছি। তিনি মনে করতেন যে প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই একটা সুন্দর মন থাকে। অনেক সময় বড়দের চাপে পড়ে বা প্রতিকূল পরিবেশের জন্য শিশুরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে না। সোসাকু কোবায়াশি চাইতেন শিশুদের মনের এই সৌন্দর্যকে বিকশিত হবার সুযোগ করে দিতে, যাতে ওরা পূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে।

মিস্টার কোবায়াশি মানুষের সহজাত গুণের বিকাশে বিশ্বাসী ছিলেন। এমনিতে উনি প্রকৃতিকে খুব ভালোবাসতেন। ওঁর ছোট মেয়ে, মিয়ো-চান, আমাকে বলেছিলো যে ওর বাবা নাকি ওকে অনেক দূরে দূরে হাঁটতে নিয়ে যেতেন আর বলতেন, 'চল্ গিয়ে প্রকৃতির ছন্দটাকে ধরার চেষ্টা করি।' একটা মস্ত গাছের কাছে গিয়ে ওরা গাছের

ছন্দটাকে বোঝার চেষ্টা করতো—কেমন করে হাওয়ার তালে তালে ডালপালা, সবুজ পাতা, সব দোলে আর কাঁপে। গাছের কাণ্ডর সঙ্গে ডালের সম্পর্ক, ডালের সঙ্গে পাতার, পাতার সঙ্গে হাওয়ার—বেশি হাওয়ায় পাতাগুলো কেমন বেশি তিরতির করে কাঁপে—এইসব কথা বলতেন মিস্টার কোবায়াশি। কোনো কোনোদিন যদি একটুও হাওয়া না থাকতো, তখন ওরা স্তব্ধ গাছের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতো, কখন সামান্য একটু মৃদু বাতাস পাতার ভিতর দিয়ে খেলে যাবে, তার জন্য।

ওরা কেবল হাওয়ার চলন দেখতেই যেতো না; কাছেই তামা নদী ছিলো, তার পাড়ে গিয়ে ওরা নদীর জলের বয়ে চলার দিকে তাকিয়ে থাকতো। মিয়ো-চান আমাকে বলেছিলো যে এতে ওরা কক্ষনো ক্লান্তি বোধ করতো না।

পাঠক হয়তো ভাবছেন, যুদ্ধের সেই সময়টাতে এমন একটা বেনিয়মের স্কুল কেমন করে চলতে পেরেছিলো জাপানে? এমন একটা স্কুল যেখানে ছোটরা মুক্তচিন্তার পরিবেশে বড় হচ্ছিলো? আসল কথা হলো, মিস্টার কোবায়াশি একেবারেই প্রচার ভালোবাসতেন না। যুদ্ধের আগেও কক্ষনো তিনি তাঁর স্কুলের ছবি ছাপতে দিতেন না কোথাও, তোমোইর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি কোনো প্রচার চাইতেন না। হয়তো সে জন্যই জনা পঞ্চাশেকের ওই স্কুলটা সবার দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে পেরেছিলো। আরো একটা ব্যাপার ছিলো : মিস্টার কোবায়াশিকে একজন প্রসিদ্ধ শিশুশিক্ষাবিদ হিসেবে শিক্ষামন্ত্রক খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতো।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের তিন তারিখে আমরা তোমোইর সব ছাত্রছাত্রী কুহনবুৎসু মন্দিরের একটা ঘরে মিলিত হই। ছেলেবেলায় ওই দিনটাতে আমাদের সেই অসাধারণ স্পোর্টসের উৎসব হতো স্কুলে। তারই স্মৃতিতে আমরা সবাই একজোট হই, আমাদের জীবনে মিস্টার কোবায়াশির এই মস্ত অবদান। এখন আমাদের সবারই তো কত বয়স হয়ে গেছে, কারো চল্লিশ, কারো পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই, আমাদের ছেলেমেয়েরাই তো কত বড় হয়ে গেলো, তবু আজও আমরা একে অন্যকে ডাক নামেই ডাকি।

আমাকে কিন্তু সত্যিই আমার প্রথম স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আমার ঠিক মনে নেই স্কুলটার কথা, কিন্তু আমার মা আমাকে রাস্তার বাজনদার আর সেই ডেস্ক খোলা-বন্ধের গল্পটা বলেছিলেন। আমি এত দুষ্টু ছিলাম যে আমাকে স্কুল থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিতে হয়েছিলো? আমার যেন বিশ্বাসই হতে চাইতো না। তবে, পাঁচ বছর আগে, টেলিভিশনের এক প্রভাতী অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যিনি নাকি আমাকে সেই সময় চিনতেন। আমার সেই প্রথম স্কুলে, আমার পাশের ক্লাসের দিদিমণি ছিলেন তিনি। সেদিন তাঁর কথা শুনে আমি তো হতবাক : 'তুমি ঠিক আমার পাশের ক্লাসরুমে ছিলে। আমি যখনই টিচার্স রুমের দিকে যেতাম, তখনই দেখতাম যে তোমাকে কোনো না কোনো দুষ্টুমির জন্য ক্লাসের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। আমি পাশ দিয়ে যাবার সময় তুমি

আমাকে জিজ্ঞেস করতে, 'আমি কী দোষ করেছি? আমাকে কেন এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে?' একবার তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, 'তোমার রাস্তার বাজনাদারদের ভালো লাগে না?' আমি কক্ষনো বুঝতে পারতাম না তোমাকে কী বলবো। তাই, পরে যখন আমার অফিসঘরে যাবার প্রয়োজন হতো, আমি আগে একটু উঁকি মেরে দেখে নিতাম তুমি দাঁড়িয়ে আছো কি না। যদি থাকতে, তাহলে আমি আর যেতাম না। তোমার ক্লাসের দিদিমণি প্রায়ই বলতেন, 'কে জানে মেয়েটা ওরকম অদ্ভুত কেন?' সেইজন্য, যখন তুমি টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করতে শুরু করলে, অমনি তোমার নামটা দেখেই আমি চিনতে পারলাম। কতদিন আগের কথা দ্যাখো, তবু তোমার সেই ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময়টা আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

আমাকে ক্লাসের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো? এটা আমার মনে ছিলো না, কিন্তু কথাটা শুনে খুব অবাক হলাম। ভালো মানুষ চেহারার ওই মহিলা, মুখের ভাবটা বেশ ছেলেমানুষের মতন, মাথায় সাদা চুল, তিনি কত কষ্ট করে আমার সকালবেলার অনুষ্ঠানে এসেছিলেন আর এসে আমাকে বুঝিয়ে গিয়েছিলেন যে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়ার ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিলো।

এখানে আমার মায়ের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। মা আমার কুড়ি বছরের জন্মদিনে কথাটা প্রথম বলেছিলেন : 'ছোটবেলায় তোমাকে কেন স্কুল পাল্টাতে হয়েছিলো জানো?' আমি 'না' বলাতে মা বেশ সহজভাবে বলেছিলেন, 'তোমাকে তোমার প্রথম স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো।'

অথচ, মা তো সেই সময়ই বলতে পারতেন, 'কী করবো তোমাকে নিয়ে আমি? কোথায় যাবো? একটা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আবার যদি তাড়িয়ে দেয়?' মা যদি ওভাবে বলতেন তাহলে আমি কতই না জানি ঘাবড়ে যেতাম আর তোমোই গাকুয়েনের রেলগাড়ির কামরা আর লতাপাতা গেটের আনন্দটাই উপভোগ করতে পারতাম না। ওরকম একজন মা পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা!

তখন যুদ্ধ চলছিলো বলে তোমোইতে খুব বেশি ছবি তোলা হতো না। যে ক্লাস স্কুল শেষ করে অন্য স্কুলে চলে যাচ্ছিলো, হলঘরের সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে তাদের একটা বিদায়ী ছবি তোলার রীতি ছিলো। সেই ছবিগুলো দারুণ হতো। মজার ব্যাপার ছিলো, ছবি তোলার জন্য সেই ক্লাসের ছেলেমেয়েরা যখন সিঁড়ির ওপরে জড়ো হতো, তখন অন্য ক্লাসের ছেলেমেয়েরাও ছবিতে থাকার জন্য বায়না করতো। মিস্টার কোবায়াশি এতে কিচ্ছু বলতেন না; হয়তো ওঁর মনে হতো যে সবাই মিলে হৈচৈ করে তোলা একটা ছবির মূল্য আনুষ্ঠানিক বিদায়ী ছবির চাইতে অনেক বেশি। এর ফলে কে যে আসলে স্কুল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো আর কে যে ফাউ-এর মতন ছবিতে ঢুকে পড়েছিলো, এখন আমরা সেটা আর বুঝতে পারি না। এখন দেখলে মনে হয়, তোমোইর মেজাজটা খুব চমৎকারভাবে ধরা আছে ওই ছবিগুলোতে।

তোমোই সম্পর্কে আমি আরো অনেক কিছু লিখতে পারতাম। কিন্তু, আমি যদি পাঠককে এইটুকু বোঝাতে পেরে থাকি যে তোত্তো-চানের মতন একটি মেয়েও তোমোইর পরিবেশে গিয়ে সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে শিখে গিয়েছিলো, তাতেই আমি খুশি।

আমার খুব মনে হয় যে আজ যদি তোমোইর মতন কিছু স্কুল থাকতো, তাহলে নিশ্চই এই ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক সব ঘটনা—মারপিট, খুনোখুনি, আর ছেলেমেয়েদের মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দেওয়া—এইসব অনেক কমে যেতো। তোমোইতে স্কুল ছুটির পর আমরা কেউ বাড়ি যেতে চাইতাম না আর সকালবেলায় স্কুলে পৌঁছনোর জন্য ছটফট করতে থাকতাম। ওরকমই ছিলো তোমোই।

যে মানুষটার মধ্যে অমন অফুরন্ত অনুপ্রেরণা ছিলো আর যিনি ওইভাবে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারতেন, সেই সোসাকু কোবায়াশির জন্ম হয়েছিলো ১৮৯৩ সালের ১৪ই জুন, তোকিওর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। প্রকৃতি আর সঙ্গীত ছিলো তাঁর প্রথম প্রেম। খুব ছোট ছিলেন যখন তখন বাড়ির কাছের নদীর পারে দাঁড়িয়ে দূরের হারুণা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতেন সোসাকু কোবায়াশি আর কল্পনা করতেন যেন বয়ে চলা নদীর জল ওঁর অর্কেস্ট্রার সব শিল্পী [illegible] ওঁকে কণ্ডাকটরের মতন পরিচালনা করতে হবে।

সাধারণ কৃষক পরিবারের ছেলে [illegible] সোসাকু কোবায়াশি। বাড়িতে ছয় ভাই, তিনি সবার ছোট। প্রাথমিক শিক্ষার পর একটি স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ওই অল্প বয়সে ওরকম একটি কাজের যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্য সামান্য কথা ছিলো না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তোকিওর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। এই সময় তিনি শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজে সঙ্গীত শিক্ষা নিতে শুরু করেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হয়; সোসাকু কোবায়াশি জাপানের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত কনজার্ভেটরি—এখন তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা এবং সঙ্গীত বিভাগ—সেখানে যোগ দিতে পারেন। সঙ্গীতে স্নাতক হবার পর সোসাকু কোবায়াশি জাপানের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, হারুজি নাকামুরার প্রাথমিক স্কুলে সঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। হারুজি নাকামুরা খুব চমৎকার একটি মানুষ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। নাকামুরার স্কুলের প্রতি ক্লাসে খুব অল্প সংখ্যক ছেলেমেয়ে পড়তো এবং পড়াশুনোর ক্ষেত্রে শিশুদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। এইভাবে পড়ালে শিশুরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের নিজস্বতা প্রকাশ করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। এই স্কুলে ছোটদের সকালবেলাটায় পড়াশুনো, লেখালেখি, সব হয়ে যেতো আর ওদের দুপুরগুলো হেঁটে চলে, গাছের পাতা কুড়িয়ে, ছবি এঁকে, গান গেয়ে, হেডমাস্টারমশাই নাকামুরার কাছ থেকে নানা বিষয়ে নানা কথা

শুনে শুনে কাটতো। মিস্টার কোবায়াশির ওপর এই শিক্ষাপদ্ধতি বিস্তর প্রভাব ফেলেছিলো, আর তোমোই গঠনের সময় সেই প্রভাব প্রকাশ পেয়েছিলো।

নাকামুরার স্কুলে সঙ্গীতশিক্ষা দেবার সময় সোসাকু কোবায়াশি ছোটদের জন্য একটি ছোট্ট অপেরা বা গীতিনাট্য লিখেছিলেন। এই নাটক দেখে জাপানের বিখ্যাত পুঁজিপতি, ইওয়াসাকি, এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, যে তিনি মিস্টার কোবায়াশিকে ইওরোপে গিয়ে শিক্ষা বিষয়ে আরো পঠন-পাঠনের জন্য আর্থিক অনুদান দিতে চান। ইওয়াসাকির পরিবারই মিৎসুবিসি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলো। ইওয়াসাকি নিজে শিল্প সংস্কৃতির বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন, তিনি জাপানের বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা, কোসচাক ইয়ামাদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৯২২ থেকে '২৪—এই দুটি বছর মিস্টার কোবায়াশি ইওরোপে কাটান। সেখানে প্যারিসে তিনি এমিল জাক্‌স্-ডালক্রোসের স্কুলে ইউরিদমিক্স বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনো করেন। ফিরে এসে প্রথমে তিনি আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে 'সেইজো কিণ্ডারগার্টেন' নামে একটি শিশুদের স্কুল স্থাপনা করেন। মিস্টার কোবায়াশি সমস্ত শিক্ষকদের বলতেন যে, শিশুদের কখনো বাঁধা ছকের মধ্যে আটকে দেবার চেষ্টা করতে নেই। 'ওদের নিজেদের মতন করে বড় হতে দিন, ওদের ইচ্ছেগুলোর ডানা কেটে ফেলবেন না। ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখতে জানে।' জাপানে এর আগে কখনো এমন কোনো কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ছিলো না।

১৯৩০ সালে সোসাকু কোবায়াশি আর একবার ইওরোপে যান ডালক্রোসের কাছে কাজ শেখার জন্য; তিনি নানা দেশে ঘুরে নানান জিনিস দেখার, বোঝার চেষ্টা করেন। ওঁর পরিকল্পনা ছিলো যে ফিরে এসে জাপানে নিজস্ব একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন।

১৯৩৭ সালে তোমোই গাকুয়েন প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও সোসাকু কোবায়াশি 'জাপান ইউরিদমিক্স অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বেশির ভাগ মানুষই তাঁকে জাপানে ইউরিদমিক্সের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মনে রেখেছে; তাছাড়া যুদ্ধের পর কুনিতাচি সঙ্গীত বিদ্যালয়ে তাঁর অবদানও সবার স্মৃতিতে রয়ে গেছে। সরাসরিভাবে তাঁর ছায়ায় বড় হয়েছিলাম আমরা—আমরা তো মোটে অল্প কজন রয়ে গেছি। তিনি যে তোমোইর মতন আর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার আগেই মারা গেলেন, এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। তোমোইকে যখন আগুন গ্রাস করে নিচ্ছিলো, তখন সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়েও তিনি আরো ভালো একটি স্কুল গড়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। একটুও ভেঙে না পড়ে তিনি বলেছিলেন, 'এরপর আমরা কেমন স্কুল তৈরি করবো?'

এই বই লিখতে শুরু করার পর আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমার যে প্রতিদিনকার টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, 'তেতসুকোর ঘর', তার যিনি প্রযোজক, যাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের কাজের সম্পর্ক, তিনি নাকি প্রায় দশ বছর ধরে সোসাকু

কোবায়াশির ওপর গবেষণা করছেন। শুনে আমি খুব বিস্মিত হয়েছিলাম। আমার সেই প্রযোজক বন্ধু, কাজুহিকো সানোর সঙ্গে কিন্তু কখনো মিস্টার কোবায়াশির দেখা হয়নি। একবার এক মহিলা পিয়ানোবাদকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো কাজুহিকোর, তাঁর কাছেই তিনি মিস্টার কোবায়াশির গল্প শুনেছিলেন। ছোটদের একটি ইউরিদমিক্সের ক্লাসে মিস্টার কোবায়াশি নাকি সেই মহিলাকে বলেছিলেন, 'ছোটরা কিন্তু ওইভাবে হাঁটে না।' এমন একজন মানুষ যিনি ছোটরা কেমন করে হাঁটে, চলে, নিঃশ্বাস নেয়—সব জানতেন। আমি আশা করে আছি যে কাজুহিকো সানো, খুব শিগগিরই ওঁর বইটি শেষ করতে পারবেন, যাতে সোসাকু কোবায়াশি সম্পর্কে সবাই আরো অনেক কিছু জানতে পারে।

কুড়ি বছর আগে কোদানশা প্রকাশনা সংস্থার এক যুবক সম্পাদক আমার একটি লেখা পড়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি একটি মহিলাদের পত্রিকাতে তোমোই সম্পর্কে একটা লেখা লিখেছিলাম। তিনি আমাকে অনেক অনেক লেখার কাগজ দিয়ে গিয়ে বলেছিলেন আরো বড় করে লেখাটা লিখতে। আমি অন্যায়ভাবে সেই কাগজ অন্য কাজে ব্যবহার করে ফেলি। তারপর সেই সম্পাদক একদিন কোদানশার পরিচালক হয়ে গেলেন। তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করবার জন্য অতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। তবে সেদিনকার সেই সম্পাদক, বাৎসুহিসা কাতো, উৎসাহ না দিলে আর সাহস না যোগালে, আমি এই বই লিখতে পারতাম না। আমি তো এর আগে কখনো তেমন কিছু লিখিনি, তাই আমার বেশ ভয় ভয় করছিলো। শেষে আমি কোদানশার মহিলাদের পত্রিকায় এক এক কিস্তি করে লেখা ছাপাতে শুরু করি। ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ থেকে ডিসেম্বর ১৯৮০ পর্যন্ত এই লেখা চলেছিলো।

প্রত্যেক মাসে আমি তোকিওর শিমো-শাকুজি অঞ্চলে চিহিরো ইওয়াসাকির নামে ছবির বইয়ের যে যাদুঘর আছে, সেখানে গিয়ে একটি করে ছবি বেছে নিয়ে আসতাম। চিহিরো ইওয়াসাকি এত সুন্দর করে ছোটদের ছবি আঁকতেন—ওরকম আর কেউ কখনো এঁকেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি শিশুদের নানান মেজাজ, নানা ধরনের চলন, সব তাঁর কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। একটি ছ মাস আর একটি ন মাসের শিশুর ভঙ্গীর তফাত প্রকাশ করতে পারতেন তিনি। চিহিরো ইওয়াসাকির ছবি দিয়ে এই বইটি সাজাতে পেরে আমি যে কী আনন্দ পেয়েছি, বলে বোঝাতে পারবো না। তিনি তো ১৯৭৪-এ মারা গিয়েছিলেন, অথচ সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করেন তিনি এই ছবিগুলি বিশেষ করে আমার গল্পের জন্যেই এঁকেছিলেন কি না। এভাবে আমার লেখার সঙ্গে ইওয়াসাকির ছবির মিলে যাওয়াটা সত্যি বিস্ময়কর একটা ঘটনা। আসলে, এতে ইওয়াসাকির শিল্পশৈলীর জোরই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

চিহিরো ইওয়াসাকি প্রায় সাত হাজার ছবি রেখে গেছেন। আমার খুব সৌভাগ্য

যে আমি তাঁর ছেলে এবং পুত্রবধূর অনুকূল্যে তাঁর অনেক ছবি দেখতে পেয়েছি। ইওয়াসাকির ছেলে ওই যাদুঘরের সহকারী পরিচালক। আমি ইওয়াসাকির স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই ছবিগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দেবার জন্য। আর নাট্যকার তাদাসু ঈজাওয়া, যিনি ওই যাদুঘরের কিউরেটর, তিনিও আমায় এই বইটি লিখতে উৎসাহ দিয়েছিলেন, বিশেষ করে আমি যখন কিছুতেই এগোতে পারছিলাম না। আমি নিজেও এখন ওই যাদুঘরের একজন বিশেষ সদস্য হয়ে গেছি।

মিয়ো-চান এবং আমার তোমোইর অন্য বন্ধুরা সবাই আমায় দারুণভাবে সাহায্য করেছে। এই বইয়ের জাপানী সংস্করণের সম্পাদক, কেইকো ইওয়ামোতো, বার বার বলেছিলেন, 'আমাদের একটা চমৎকার বই তৈরি করতে হবে।' তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

'জানালায় ছোট্ট মেয়ে'—এই নামটা আমি একটা বিশেষ কারণে রেখেছিলাম। জাপানী ভাষায় যদি বলা হয় কেউ একজন 'জানালায় দাঁড়িয়ে আছে', তার মানে হলো, তাকে সমাজের এক প্রান্তে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, নয়তো তাকে একলা একলা শীতের মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। আমি যদিও নিজের ইচ্ছেতেই জানলায় গিয়ে দাঁড়াতাম, রাস্তার বাজনদারদের দেখবো বলে, তবু ওই স্কুলে আমার অবস্থান কিন্তু 'জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা' মানুষের মতনই ছিলো। আমায়ও সেখানে একলা করে দেওয়া হয়েছিলো। এছাড়াও জানলায় দাঁড়ানোর আরো একটা মানে আছে আমার কাছে—সেই থেকে আমার একটা অন্য জানলাও তো খুলে গিয়েছিলো! সেই জানলাটা খুলে গিয়েছিলো বলেই আমি তোমোইর আনন্দমেলায় যোগ দিতে পেরেছিলাম!

তোমোই আর নেই। কিন্তু পাঠকের কল্পনায় আমার সেই স্কুল যদি খানিকক্ষণের জন্যেও জেগে ওঠে, তাহলেই আমি আমার এই লেখাকে সার্থক বলে মনে করবো।

জাপানী ভাষায় তোত্তো-চান লেখার পর বইটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ হওয়া—এর মধ্যে বিস্তর ঘটনা ঘটে গেছে। ছোট্ট তোত্তো-চান জাপানের প্রকাশনার ইতিহাসে মস্ত হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলো—এক বছরের মধ্যে বইটির ৪৫ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো।

এরপর আমি অবাক হয়ে দেখলাম 'তোত্তো-চান' একটি পাঠ্যপুস্তক হয়ে গেলো। আমি ভেবেছিলাম এই বই থেকে হয়তো স্কুলের শিক্ষকরা এবং ছোট বাচ্চাদের মায়েরা কিছু শিখতে পারবেন। কিন্তু এমন যে ব্যাপক কোনো প্রভাব বিস্তার করবে আমার বই, আমার জানা ছিলো না। হয়তো এর থেকেই বোঝা যায়, জাপানের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষ কতখানি চিন্তিত।

ছোটদের কাছে এটা একটা গল্পের বই। বারবার পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে সাত বছরের শিশুরাও নাকি এই বইটি অভিধানের সাহায্য নিয়ে পড়ে। এতে

আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়। একশো তিন বছরের এক সাহিত্য বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, 'বইটি পড়ে আমার এত ভালো লেগেছে!' কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ছোটদের অভিধান খুলে বইটি পড়া। এটা ঘটছে এমন একটা সময়ে, যখন কমিক আর ছবির বইয়ের প্রতিপত্তির চোটে ছাপা অক্ষরের প্রতি শিশুরা আর তেমন আকর্ষণ বোধ করছে না।

বইটা প্রকাশিত হবার পর আমাকে অনেক চিত্রপরিচালক, অনেক টেলিভিশন কোম্পানি—অনেকে এসে বলেছেন, তোত্তো-চানের গল্পের ওপর ছবি করতে চায়। আমি ভেবেছি, বইটা পড়েই তো সবার মনে একটা ছবি তৈরি হয়ে গেছে। কী আর নতুন ছবি তৈরি হবে তোত্তো-চানের ওপর? তাই আমি কাউকেই ছবি করার অনুমতি দিইনি।

তবে আমি একটি অর্কেস্ট্রার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছিলাম। 'তোত্তো-চান : জানলায় ছোট্ট মেয়ে' নামে একটি গীতিনাট্য লেখেন আকিহিরো কোমোরি, আমি তার জন্য ধারাভাষ্য পাঠ করে দিই। খুবই সুন্দর হয়েছিলো কোমোরির রচনা; অনুষ্ঠান চলার সময় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ হেসে, কেঁদে আকুল হয়ে গিয়েছিলো। 'তোত্তো-চান'-এর একটা রেকর্ডও প্রকাশিত হয়েছে।

এখন সরকারের তরফ থেকে 'তোত্তো-চান'-কে পাঠ্যসূচির অন্তর্গত করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রক 'কৃষিকাজের মাস্টারমশাই' অধ্যায়টি তৃতীয় শ্রেণীর জাপানী ভাষাশিক্ষার সূচির অন্তর্গত করেছে; 'বিচ্ছিরি স্কুল' অধ্যায়টি চতুর্থ শ্রেণীর এথিক্‌সের (আচার আচরণ) ক্লাসে পড়ানো হয়ে থাকে। শুনেছি, অনেক শিক্ষক বইটিকে তাদের নিজেদের মতন করে ব্যবহার করেন। অনেকে নাকি ছবি আঁকার ক্লাসে 'তোত্তো-চানে'র কোনো একটা অধ্যায় পড়ে শুনিয়ে ছেলেমেয়েদের বলেন তাদের মনে যে ছবি তৈরি হলো, সেটা আঁকতে।

আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিলো জাপানে মূক বধিরদের জন্য একটি পেশাদারি নাট্যগোষ্ঠি গড়ে তোলার। 'তোত্তো-চান' থেকে আমি যে রয়ালটি পেয়েছি, সেই টাকা আমার এই কাজে আমি ব্যবহার করতে পেরেছি। তাছাড়া বইটি একাধিক পুরস্কারও পেয়েছে। কিছুদিন আগে আমার সামাজিক ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে আমাকে আমাদের মহারাজের বসন্তকালীন প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিলো। সেখানে নোবেল বিজয়ী রসায়ন বিজ্ঞানী কেনইচি ফুকুইও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন মহারাজের সঙ্গে আমার খুব মধুর কিছু আলোচনা হয়। প্রতিবন্ধী-বর্ষতে আমার কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে সম্মানিত করেছেন। এ সবই আজ সম্ভব হয়েছে আমার ছোট্ট তোত্তো-চানের জন্য।

শেষে আমি ডরথি ব্রিটনের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এমন অসাধারণ একজন অনুবাদক আমার বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, আমার সৌভাগ্য।

তিনি একধারে কবি এবং সঙ্গীতশিল্পী, তাই তাঁর ভাষার সুর ও ছন্দ আমাদের মুগ্ধ করে।

আর একটি কথা। ব্রডওয়ের সঙ্গীত রচয়িতা হ্যারল্ড রোম এবং তাঁর স্ত্রী ফ্লরেন্সকে আমি আমার ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি যখন সবে একটি মাত্র অধ্যায় লিখে শেষ করেছি, তখন থেকেই ওঁরা বইটি ইংরেজিতে প্রকাশ করার জন্য আমায় উৎসাহ দিতে শুরু করেন।

তেৎসুকো কুরোয়ানাগি

যাত্রীদের কথা

যে বন্ধুদের সঙ্গে আমি আমার 'ট্রেন' সফর শুরু করেছিলাম, তারা আজ কী করছে?

আকিরা তাকাহাশি

তাকাহাশি, স্পোর্টস-এ যে সব সময় সব কটা পুরস্কার জিতে যেতো, সে কিন্তু আর একটুও লম্বা হতে পারেনি। কিন্তু তাকাহাশি দারুণ সাফল্যের সঙ্গে একটি খুব ভালো স্কুলে ভর্তি হয়, যেখানে খুব ভালো একটা রাগবি খেলার দল ছিলো। পরে তাকাহাশি মেইজি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হয়। এখন সে লেক হামানার পাশের একটি বড় ইলেকট্রনিক কোম্পানির পারসোনেল ম্যানেজার হিসেবে চাকরী করে। তার কাজ হলো কর্মীদের নানান সমস্যা, নিজেদের ভিতরকার নানা অশান্তি মিটিয়ে দেওয়া।

তাকাহাশিকে এত সব নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সারা জীবন ধরে যে হয়তো সে জন্যেই সে অন্যদের সমস্যা, অসুবিধে খুব সহজেই বুঝতে পারে। তাছাড়া, ও এমন হাসিখুশি, এমন ঝকঝকে স্বভাবের একজন মানুষ যে ওকে সহজেই সবার ভালো লেগে যায়। কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাকাহাশি অল্পবয়সী কর্মীদের বড় বড় মেশিনের ভিতরকার জটিলতা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আমি তাকাহাশির আর ওর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হামামাৎসুতে গিয়েছিলাম। ওর স্ত্রীও বেশ—খুব চমৎকারভাবে বুঝতে পারে ওকে। এত শুনেছে ও তোমোইর গল্প যে ওর নাকি মনে হয় যে ও নিজেই তোমোইর ছাত্রী ছিলো। ও আমাকে আশ্বস্ত করে বললো যে বামন হবার জন্য তাকাহাশির মনের মধ্যে কোনোই আড়ষ্টতা নেই। আমিও সে ব্যাপারে নিশ্চিত। আড়ষ্টতা থাকলে অত ভালো একটা স্কুলে ও পড়তে পারতো না, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়াও ওর পক্ষে কঠিন কাজ হতো, এবং আজ ও যে কাজ করে, তাও করতে পারতো না।

তোমোইতে ওর প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ও বললো যে, স্কুলে আরো কয়েকজন প্রতিবন্ধীকে দেখে ও সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলো। সেই মুহূর্ত থেকে প্রত্যেকটা দিন ওর কাছে খুব সুন্দর হয়ে উঠেছিলো, ওর এক ফোঁটাও কোনো ভয় ছিলো না, গ্লানি ছিলো না, প্রতিদিন তাকাহাশি স্কুলে যাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকতো। কোনো জামা কাপড় না পরে সাঁতার কাটতে ওর প্রথমে একটু লজ্জা

লেগেছিলো। কিন্তু তারপর ও যখন একটা একটা করে জামা খুলে ফেলতে লাগলো, তখন একটু একটু করে ওর লজ্জাও কেটে গেলো যেন। এরপর থেকে দুপুরবেলায় উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেও ওর আর কোনো অসুবিধে হতো না।

মিস্টার কোবায়াশি নাকি ওকে ভ্যল্টিং হর্স খেলাটায় যোগ দিতে খুব করে উৎসাহ দিতেন; বারবার বলতেন যে, আরো উঁচুতে লাফাও, কিচ্ছু হবে না, দ্যাখো তুমি ঠিক পারবে। এখন তাকাহাশির সন্দেহ হয় যে, হয়তো শেষ পর্যন্ত হেডমাস্টারমশাই নিজেই ওকে ওই ভ্যল্টিং হর্সের ওপর দিয়ে তুলে দিতেন, তবু ও কিন্তু বিশ্বাস করতো যে ও নিজেই ওটা লাফিয়ে পার করেছে। মিস্টার কোবায়াশি ওকে এই আত্মবিশ্বাসটুকু এনে দিয়েছিলেন। তোমোইতে তাকাহাশি সাফল্যের আনন্দ উপভোগ করেছিলো। যখনই ও সবার আড়ালে গিয়ে লুকোনোর চেষ্টা করতো, তখনই হেডমাস্টারমশাই ওকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিতেন। এভাবেই ও জীবনের সুন্দর, সহজ দিকগুলো দেখতে শিখেছিলো। এখনো তাকাহাশির স্পোর্টসে সব পুরস্কার জেতার আনন্দটা মনে পড়ে।

তোমোইর কথা বলতে বলতে ওর চোখ দুটো চকচক করছিলো। তাকাহাশি যে এমন সুন্দর একজন মানুষে পরিণত হয়েছে, তার পেছনে ওর পরিবারেরও নিশ্চয় মস্ত ভূমিকা ছিলো। তবু মিস্টার কোবায়াশির দূরদৃষ্টি আমাদের সবার জীবনকেই অন্যভাবে প্রভাবিত করেছিলো। উনি যে আমাকে বারবার বলতেন, 'তুমি কিন্তু সত্যিই খুব ভালো মেয়ে', কিংবা তাকাহাশিকে বলতেন, 'দেখো, তুমি পারবেই পারবে'—এইভাবেই উনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

হামামাৎসু থেকে চলে আসবার সময় তাকাহাশি আমাকে এমন একটা কথা বললো, যা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। অনেক দিন স্কুলে আসবার পথে ওকে নাকি অন্য স্কুলের ছেলেমেয়েরা খুব ক্ষেপাতো আর ও খুব মনমরা হয়ে স্কুলে এসে ঢুকতো। আমি তখন জানতে চাইতাম যে কী হয়েছে। তারপরই ছুট্টে স্কুলের বাইরে বেরিয়ে যেতাম আর খানিক বাদে ফিরে এসে তাকাহাশিকে বলতাম যে সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে, ওরকম আর কখনো হবে না।

'তুমি আমাকে এত আনন্দ দিয়েছিলে!' তাকাহাশি বললো। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, তাকাহাশি! তুমি মনে রেখেছো, সেজন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ!

মিয়ো-চান (মিয়ো কানেকো)

মিস্টার কোবায়াশির তিন নম্বর মেয়ে, মিয়ো-চান, কুনিতাটে সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর এখন কুনিতাচিরই প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকতা করে। বাবার মতন ওরও ছোটদের পড়াতে খুব ভালো লাগে। মিয়ো-চানের যখন সবে তিন বছর, তখন থেকেই ওর বাবা ওকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন : কেমন করে হাঁটে ও,

কেমন করে কথা বলে, কেমন করে সুর আর তালের সঙ্গে শরীরটাকে দোলায়। মিয়ো-চানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই হেডমাস্টারমশাইয়ের শিশুদের সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছিলো।

সাক্কো মাৎসুইয়ামা (এখন মিসেস সাইতো)

সাক্কো-চান, সেই যে মেয়েটির মস্ত বড় চোখ ছিলো, আর আমি যেদিন তোমোইতে প্রথম গেলাম সেদিন যার জামায় একটা খরগোশের ছবি আঁকা ছিলো, সেই সাক্কো-চান এমন একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলো, যেখানে মেয়েদের ভর্তি হওয়া খুব কঠিন ছিলো। স্কুলটার নাম মিতা হাই স্কুল। তারপর তোকিও উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান ইউনিভাসিটির ইংরেজি বিভাগে পড়া শেষ করে ও ওয়াই.ডাব্লু.সি.এ-তে ইংরেজির শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করে। এখনো ও সেখানেই পড়ায়। তোমোইর অভিজ্ঞতা এখনো কাজে লাগে সাক্কো-চানের, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে যখন ওরা ক্যাম্প করতে যায়।

একবার সাক্কো-চান হোতাকা পাহাড়ে চড়তে গিয়েছিলো, সেখানে ওর একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়, যাকে ও পরে বিয়ে করে। ওদের ছেলের নাম ওরা 'ইয়াসুতাকা' রেখেছে—ইয়াসুতাকা সেই পাহাড়টার শেষ ধাপের নাম। সেখানেই ওর স্বামীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিলো।

তাই জি ইয়ামানোউচি

তাই-চান, যে বলেছিলো যে আমাকে কিছুতেই বিয়ে করবে না, আজ সে জাপানের অন্যতম প্রধান পদার্থ বিজ্ঞানী। তাই-চান এখন আমেরিকায় থাকে আমাদের 'ব্রেন ড্রেনের' এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পাস করার পর ফুলব্রাইট স্কলারশিপ পেয়ে তাই-চান আমেরিকায় চলে যায় এবং সেখানকার রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচ বছর পর ডক্টরেট হয়। তারপর সেখানেই থেকে গিয়ে হাই এনার্জি ফিজিক্সে গবেষণা করতে থাকে। এখন তাই-চান ইলিনোইয়ের ফার্মি ন্যাশনাল অ্যাক্সিলারেটর ল্যাবরেটরির উপ-পরিচালক। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম গবেষণাগার, এখানে আমেরিকার ৫৩টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবচেয়ে মেধাবী বিজ্ঞানীরা এসে কাজ করেন; মোট ১৪৫ জন বিজ্ঞানী এবং ১,৪০০ জন অন্যান্য যন্ত্র কারিগর মিলে এই গবেষণাগারটি চালান। ফলে, বোঝাই যাচ্ছে, তাই-চান ঠিক কতখানি মেধাবী। পাঁচ বছর আগে এখানকার বিজ্ঞানীরা ৫০০ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের একটি হাই এনার্জি রশ্মি আবিষ্কার করে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কিছুদিন আগে কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে যৌথভাবে

কাজ করে তাই-চান 'উপসাইলন' নামে একটি পদার্থ আবিষ্কার করেছে। তাই-চান নিশ্চয় একদিন নোবেল পুরস্কার পাবে, আমি ঠিক জানি।

তাই-চান রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের স্নাতক একটি মেয়ে বিয়ে করেছে। এমন মেধাবী একজন মানুষ কোন প্রাথমিক স্কুলে গিয়েছিলো বা যায়নি, তা দিয়ে হয়তো বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। তবু তোমোইর শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চয় তাই-চানের মেধার বিকাশেও সাহায্য করেছিলো। আমার তো ওর কথা ভাবলে কেবল একটা ছবিই মনে পড়ে—তাই-চান ক্লাসরুমের বার্ণারটা জ্বালিয়ে, টেস্ট টিউব নিয়ে কী সব কাজ করে চলেছে, অথবা দুর্বোধ্য সব বিজ্ঞানের বইয়ের ভিতরে ডুবে বসে আছে।

কুনিও ওয়ি

সেই যে ছেলেটা আমার বেণী ধরে টান দিয়েছিলো, সে এখন জাপানের অন্যতম অর্কিড বিশেষজ্ঞ। ওয়ির অর্কিডের বাল্ব এক একটা হাজার হাজার ডলারে বিক্রি হয়। এইসব নিয়ে ও মহাব্যস্ত থাকে এবং ওকে কেবলই জাপানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে ছুটে বেড়াতে হয়। ওকে টেলিফোনে ধরাও বেশ কঠিন কাজ ছিলো।

'তোমোইর পর তুই কোন স্কুলে ভর্তি হলি?'

'আমি আর কোথাও পড়িনি।'

'আর কোথাও না? তার মানে তোমোই-ই তোর একমাত্র স্কুল?'

'ঠিক তাই!'

'কী কাণ্ড! তার মানে তুই কোনো মাধ্যমিক স্কুলে যাসইনি?'

'ও হ্যাঁ, গিয়েছিলাম; ওইতো মাধ্যমিক স্কুলে গিয়েছিলাম কিছুদিন, কিন্তু তারপরই আমাকে কিউশুতে চলে যেতে হলো।'

'কিন্তু আমাদের দেশে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াটা বাধ্যতামূলক না?'

'ঠিকই। কিন্তু আমি তো পড়িনি।'

'কেমন যা খুশি তাই করে বেড়ানো ছেলে রে বাবা!' আমি মনে মনে ভাবলাম।

যুদ্ধের আগে তোকিওর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, তোদোরোকি বলে একটা জায়গা জুড়ে ওয়ির বাবার একটা চারাগাছের মস্ত নার্সারি ছিলো। যুদ্ধের সময় সেই নার্সারিটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেদিন আমাদের বাকি কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ওয়ির নিরুদ্বিগ্ন চরিত্রটি প্রকাশ পেয়েছিলো। ও আলোচনার বিষয়টা পাল্টে ফেললো।

'সবচেয়ে সুগন্ধী ফুল কী বল তো? আমার কিন্তু মনে হয় চাইনিজ স্প্রিং অর্কিডটাই হলো সবচেয়ে সুগন্ধী (Cymbidium Virescens) কোনো পারফিউমই কিন্তু তার ধারে কাছে আসতে পারে না।'

'অনেক দাম?'

'কিছু কিছুর দাম বেশি, কিছু কিছুর কম।'

'কেমন দেখতে?'

'তেমন কোনো বাহার নেই। বেশ সাধারণ। সেটাই ওই গাছটার সৌন্দর্য।'

একটুও পাল্টায়নি ওয়ি, সেই তোমোইতে যেমন ছিলো, তেমনই রয়ে গেছে। ওর কথা বলার সহজ ভঙ্গী শুনে আমি ভাবছিলাম, 'ও যে মাধ্যমিক স্কুলেও যেতে পারেনি, তা নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই। দিব্যি যা ভালো লাগে করতে, তা-ই করছে। আর নিজের ওপর কী দারুণ আস্থা!' আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

কাজুও আমাদেরা

আমাদেরা পশুপাখি এত ভালোবাসতো যে ভেবেছিলো বড় হয়ে পশু-চিকিৎসক হবে আর ওর নিজস্ব একটা খামার হবে। বেচারার বাবা হঠাৎ করে মারা যান, আর ওকে নিহোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ভেটেরানারি মেডিসিন এ্যাণ্ড এ্যানিমাল হাজব্যাণ্ড্রির পড়া ছেড়ে দিয়ে কেইও হাসপাতালে একটা চাকরী নিতে হয়। আমাদেরা এখন সেণ্ট্রাল হসপিটাল অফ দ্য সেল্ফ-ডিফেন্স ফোর্স-এ দায়িত্বপূর্ণ একটি পদে চাকরী করে।

আইকো সাইশো (এখন মিসেস তানাকা)

আইকো সাইশো তোমোইতে এসেছিলো আয়োইয়ামা গাকুইনের প্রাথমিক স্কুল থেকে। ওর দাদুর ভাই-ই ছিলেন নৌ-সেনাপতি তোগো। আমার সব সময় আইকোকে খুব শান্ত মনে হতো, একদম ভদ্রমহিলা সুলভ। হয়তো কিছুদিন আগেই ওর বাবা মারা গিয়েছিলেন বলে ও তখন অত চুপচাপ হয়ে থাকতো। আইকোর বাবা থার্ড গার্ড রেজিমেণ্টের একজন মেজর ছিলেন, তিনি মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন।

কামাকুরা গার্ল্স হাই স্কুল থেকে পাস করার পর আইকো একজন আর্কিটেক্টকে বিয়ে করে। এখন ওর দুই ছেলেই বড় হয়ে গেছে, তারা দুজনেই ব্যবসা করছে, এবং আইকো এখন ওর অবসর সময় কবিতা লিখে কাটায়।

'তোর সেই মাসি, যিনি মেইজি রাজদরবারের কবি ছিলেন, তাঁকে অনুসরণ করেছিস?'

'দূর, কী যে বলিস!' আইকো লাজুকভাবে হাসলো।

'তুই তো তোমোইতে যেমন ছিলি, তেমনি লাজুক রয়ে গেছিস। তেমনি নম্র, ভদ্র।'

এই কথার উত্তরে আইকো বললো, 'জানিস, আমি না এখনো একই রকম শক্ত পোক্ত দেখতে আছি, যেমন ছিলাম বেঙ্কেই সাজার সময়!'

আইকোর উষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম, ওর বাড়ির ভিতরটা নিশ্চয় ওইরকমই উষ্ণ, ভালোবাসায় ভরা!

কেইকো আওকি (এখন মিসেস কুওয়াবারা)

সেই যে কেইকো-চান যার মুর্গিগুলো উড়তে পারতো, সে এখন কেইয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্কুলের একজন শিক্ষকের স্ত্রী। কেইকোর মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে।

ইয়োইচি মিগিতা

মিগিতা, যে কেবল অন্ত্যেষ্টির পিঠের গল্প শোনাতো সকলকে, সে পরে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক হয়। কিন্তু ওর তো সব সময়ই ছবি আঁকতে ভালো লাগতো, তাই ও মুসাশিনো চারুকলা বিদ্যালয়ে গিয়ে নতুন করে পড়াশুনো করে চারুকলায় স্নাতক হয়। এখন ওর নিজস্ব একটা গ্রাফিক ডিজাইনের কোম্পানি আছে।

রিয়ো-চান

রিয়ো-চান, তোমোইর সেই দারোয়ানজি, যাকে যুদ্ধে চলে যেতে হয়েছিলো, সে ভালো মতন, সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরে এসেছিলো। প্রত্যেক বছর নভেম্বর মাসের তিন তারিখে রিয়ো-চান ঠিক এসে হাজির হয় তোমোইর মিলন উৎসবে।

Printed at : Shagun Offset, Mohammadpur, New Delhi-66 Ph. : 6167452